হেমেন্দ্রকুমার রায়

রচনাবলী

الحمدلله

হেমেন্দ্রকুমার রায়

রচনাবলী

২৭

সম্পাদনা

গীতা দত্ত

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি

কলেজ স্ট্রিট মার্কেট ।। কলকাতা সাত

প্রকাশিকা
শ্রীমতী গীতা দত্ত
এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
এ-১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট ✡ কলকাতা-৭০০ ০০৭

লিপি বিন্যাস
এ পি সি লেজার
৬১ মহাত্মা গান্ধী রোড ✡ কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রাকর
শ্রীকার্তিক কুণ্ডু ও শ্রীতরুণ কুণ্ডু
ইউনিক কলার প্রিন্টার্স
২০এ পটুয়াটোলা লেন ✡ কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ
রমেন আচার্য
কলকাতা-৭০০ ০৫৯

অলংকরণ
প্রণব হাজরা

বাঁধাই
বিদ্যুৎ বাইন্ডিং ওয়ার্কাস
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ
কলকাতা পুস্তকমেলা
মাঘ ১২, ১৪১৯ ✡ জানুয়ারি ২৬, ২০১৩

ISBN 81-7942-071-X

গ্রন্থস্বত্ব
শ্রীমতী গীতা দত্ত
অনুমতি ছাড়া বই-এর বিষয়বস্তু ছাপা ও নামানুকরণ আইনের বিধানে দণ্ডনীয়

দাম — ৮০.০০

সম্পাদকের নিবেদন

হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলীর সপ্তবিংশতি খণ্ডটি প্রকাশিত হল ৩৭তম কলকাতা পুস্তকমেলায়।

এই খণ্ডে আটটি গল্প, দুটি ঐতিহাসিক উপাখ্যান এবং একটি উপন্যাস রাখা হল।

অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির থেকে ১৩৫৩-র কালীপূজায় প্রকাশিত হয় 'হত্যা এবং তারপর' গল্পগ্রন্থটি। গ্রন্থটি থেকে বর্তমান সংকলনে তিনটি গল্প রাখা হয়েছে। গ্রন্থের অন্যান্য গল্প ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সময়ে আমাদের হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলীর নানান খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গল্পগ্রন্থের 'হত্যা এবং তারপর' গল্পটি প্রথমে 'জয়ন্তের পুনরাগমন' নামে 'রংমশাল' পত্রিকায় ১৩৫১-র বৈশাখ থেকে ক্রমপর্যায়ে প্রকাশিত হয়। গল্পটির শেষে লেখক পাদটীকায় বলেন—'এই খানেই ভৈরবের কাহিনি সমাপ্ত হল। এবার থেকে মাঝে মাঝে জয়ন্তের নূতন নূতন কীর্তির কথা প্রকাশিত হবে।' গল্পের নাম ও পাদটীকা থেকে বেশ কিছুকাল বিরতির পর হেমেন্দ্রকুমার যে আবার জয়ন্তকে নিয়ে এই গল্পটি রচনা করেন, তা সহজেই অনুমেয়।

এ ছাড়াও নানান গ্রন্থ থেকে পাঁচটি গল্প সংগৃহীত হয়েছে বর্তমান সংকলনে। যার মধ্যে 'গুহাবাসী বিভীষণ' গল্পটি ১৩৪৪-এর 'রংমশাল' আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

ঐতিহাসিক উপাখ্যান দুটির মধ্যে 'তিন সম্রাটের ত্র্যহস্পর্শ-যোগ' প্রকাশিত হয় দেব সাহিত্য কুটীরের শারদ সংকলন 'শ্যামলী'তে। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের শেষ লেখা হিসেবে রচনাটি পাঠকদের বাড়তি গুরুত্ব প্রত্যাশা করতেই পারে। আর অন্য উপাখ্যান 'মহাভারতের মহারথ' প্রকাশিত হয় দেব সাহিত্য কুটীরেরই ১৩৬৭-র শারদ সংকলন 'দেবালয়'-এ।

'পঞ্চশরের কীর্তি' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় শিশির পাবলিশিং হাউস থেকে। কিছুটা পরিণত বয়স্ক রোমান্স থাকলেও উপন্যাসের অ্যাডভেঞ্চার-অংশটুকু আশা করি সমস্ত পাঠককেই আকর্ষণ করবে।

এই খণ্ডের কয়েকটি রচনার সংগ্রহে শ্রীশোভনকুমার রায়, শ্রীসায়ন্তন রায় ও অরুণাভ মজুমদার আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ। রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয়নি এরকম রচনার সংগ্রহে কেউ এগিয়ে এলে আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকব এবং গ্রন্থে তার যথাযোগ্য স্বীকৃতিও রাখব।

বিনীত

জানুয়ারি ২৬, ২০১৩ **গীতা দত্ত**

সূ চি প ত্র

হত্যা এবং তারপর ---------- ৫

হত্যা এবং তারপর ---------- ৭

প্রাইভেট ডিটেকটিভ ---------- ২৪

একদিনের অ্যাডভেঞ্চার ---------- ৩১

গল্প ---------- ৩৭

শয়তান ---------- ৩৯

গঙ্গার বিভীষিকা ---------- ৪৪

গুহাবাসী বিভীষণ ---------- ৫১

নকল শিকারির সংকট ---------- ৫৭

বাদশার সমাধি ---------- ৬৩

ঐতিহাসিক উপাখ্যান ---------- ৬৭

তিন সম্রাটের ত্র্যহস্পর্শ-যোগ ---------- ৬৯

মহাভারতের মহারথ ---------- ৮৫

পঞ্চশরের কীর্তি ---------- ১০১

কুন্ডু ব্যাক্তিগত পাঠাগার

www.Banglaclassicbooks.blogspot.in

হত্যা এবং তারপর

PATHAGAR.NET

হত্যা এবং তারপর

॥ প্রথম ॥

পাঁচ লক্ষ টাকা

তাদের সাধ ছিল গোটা পৃথিবীটার বুকের উপর দিয়ে দৌড়োদৌড়ি করে আসে।

আমরা জয়ন্ত আর মানিকের কথা বলছি। তারা বেরিয়েছিল পৃথিবী-ভ্রমণে। সুমাত্রা, জাভা ও বোর্নিও প্রভৃতি দ্বীপ বেড়িয়ে, গিয়েছিল তারা রহস্য-ভীষণ আফ্রিকায়। সেখানে বৎসর-খানেক কাটিয়ে তারা দক্ষিণ ইউরোপের কয়েকটি দেশ দেখে ইংল্যান্ডে গিয়ে উপস্থিত হল।

চমৎকার লাগছিল। নানা দেশ, নানা ভাষা, নানা আচার-ব্যবহার! কখনো অকূল নীলসাগরের তরঙ্গ-দোলায়, কখনো বিজন গহন বনের ভিতরে চির-সন্ধ্যা-অন্ধকারে, কখনো রৌদ্রতপ্ত রুদ্র মরু-জগতের নির্জল ও নিস্তব্ধ হাহাকারের মধ্যে, কখনো তুষার-ঝটিকায় বিচিত্র বরফেমোড়া তুঙ্গ গিরি-শিখরে মেঘরাজ্যের কাছে! কখনো জাভার বড়ো-বুদ্ধের মন্দির-চাতালে, কখনো মিশরের পিরামিডের চূড়ায়, কখনো গ্রিসের পার্থেননের প্রাচীন মর্মর-স্বপ্নের সামনে এবং কখনো বা চিরন্তন নগর রোমের অতীত কীর্তির ধ্বংসাবশেষের ভিতরে!

কতবার নাগরিক সভ্যতার সদর-মহল ছেড়ে তারা প্রবেশ করেছে অজ্ঞাত অসভ্যতার অন্তঃপুরে! যেখানে বোর্নিও সুমাত্রার স্তব্ধ অরণ্যে প্রভুর মতো বৃক্ষ-রাজ্যে বাস করে ওরাং-ওটানরা; যেখানে আফ্রিকার বন-প্রান্তরে জেব্রা ও জিরাফের পিছনে পিছনে মৃত্যু-বিদ্যুতের মতন ছুটে যায় লাঙ্গুল দুলিয়ে কেশর ফুলিয়ে সিংহের দল; যেখানে জলে ভাসে কুমির ও হিপো এবং স্থলে বেবুন ও উটপাখিদের রঙ্গভূমির চারিপাশে ভূমিকম্প জাগে হাতি ও গন্ডারদের পায়ের তালে; যেখানে গাছের ডালে ঝোলে অজগর এবং পাহাড়ের নীচে-উপরে শোনা যায় গরিলার গর্জন!

ছবির পর ছবি বদলে যায়—দৃশ্যের পর দৃশ্য—ধ্বনির পর ধ্বনি! এ-সবের কাছে কোথায় লাগে সিনেমার সবাক চিত্র! জয়ন্ত ও মানিকের বার বার মনে হয়েছে, এতদিন পরে ধন্য তাদের জীবন, সার্থক তাদের জন্ম, সফল তাদের বাসনা!

কিন্তু এ-যাত্রায় তাদের পৃথিবী-ভ্রমণ সম্পূর্ণ হল না। ইংল্যান্ডে পা দিয়েই

তারা শুনলে, ইউরোপের দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্রের প্রচণ্ড যুদ্ধ-দামামার ধ্বনি! এবং তারপর কিছুদিন যেতে-না-যেতেই বিলাতের সারা আকাশ ছেয়ে দেখা দিলে পঙ্গপালের মতো জার্মানির উড়োজাহাজরা। জল-স্থল-শূন্য—সর্বত্রই মৃত্যুর হুঙ্কার ও মানুষের আর্তনাদ!

জয়ন্ত ও মানিক বুদ্ধিমান। সব পথ বন্ধ হবার আগেই তারা ভারাক্রান্ত মনে ফিরে এল আবার স্বদেশে।

দুই বৎসর পর দেশে এসে তারা দুই দিন বিশ্রাম করলে। তৃতীয় দিনে দুই বন্ধু বেড়াতে বেরুল।

জয়ন্ত বললে, 'মানিক, দু-বছর পরে এখানে এসে মনে হচ্ছে, যেন আমাদের কলকাতার উপরেও আছে খানিকটা নূতনত্বের পালিশ!'

মানিক বললে, 'হ্যাঁ। কিন্তু এ পালিশের চকচকানি দীর্ঘস্থায়ী নয় বলেই তো নতুনের এত আদর।'

মানিক বললে, 'পুরাতনেরও আদর কি কম? মানুষ তো একটানা নূতনত্বের স্রোতে ভেসে যেতে ভালোবাসে না! তারই ভিতরে থেকে থেকে সে ফিরে চায় আবার অতি-পরিচিত বন্ধুর মতো পুরাতনকে!'

—'ঠিক বলেছ। পুরাতনের পর নূতন, আবার নূতনের পর পুরাতন। মানুষ এ-দুটির কোনোটিকেই ত্যাগ করতে পারে না। তাই তো হঠাৎ সুন্দরবাবুর পুরাতন মুখ দেখে আমার মনে জাগছে খুশির ইঙ্গিত!'

—'সুন্দরবাবু? কোথায়?'

—'ওই যে!'

মানিক ফিরে দেখলে, ওধারে ফুটপাথের উপর দিয়ে জন-পাঁচেক পুলিশের লোকের সঙ্গে হন হন করে এগিয়ে চলেছে সুন্দরবাবুর বিপুল বপু।

এইবারে সুন্দরবাবুও তাদের দেখতে পেয়ে চমকে ও থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর মুখ দিয়ে সবিস্ময়ে বেরিয়ে পড়ল সেই বিখ্যাত শব্দটি—'হুম্!'

সুন্দরবাবুকে যারা চেনে তারা জানে যে, অতিরিক্ত ক্রোধে বা বিস্ময়ে বা দুঃখে বা আনন্দে তিনি এক-একরকম সুরে 'হুম্' শব্দটি উচ্চারণ করে ভাবাভিব্যক্তির চূড়ান্ত পরিচয় দেন। তাঁকে যারা চেনে না তারা জানতেই পারবে না যে, একটিমাত্র 'হুম্' শব্দ কতরকম ভাব প্রকাশ করতে পারে!

সুন্দরবাবু ও-ফুটপাথ থেকে ছুটে আসবার উপক্রম করছেন দেখে, জয়ন্ত ও মানিক তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে এগিয়ে গেল।

—'আরে জয়ন্ত, আরে মানিক,—হুম্! সাত সাগর লঙ্ঘন করে আবার তোমরা কলকাতায় এসেছ কবে হে?'

—'পরশু।'

—'তোমরা তো বলে গিয়েছিলে পাঁচ-ছয় বছরের আগে কলকাতায় ফিরবে না!'

—'তাই তো ভেবেছিলুম। কিন্তু হিটলার যে আমাদের তাড়িয়ে দিলে! নিজের দেশের জন্যে যুদ্ধে মরতে রাজি আছি, কিন্তু বিদেশ-বিভুঁয়ে জার্মান বোমা খেয়ে হাত-পা খোঁড়া করে বেঁচে মরে থাকতে চায় কে?'

হ্যাঁচ্চো শব্দে হেঁচে ফেলে সুন্দরবাবু বললেন, 'ঠিক বলেছ ভাই! এই দ্যাখো হাঁচি পড়ল!...তারপর? কোন কোন দেশ বেড়িয়ে এলে?'

জয়ন্ত হেসে বললে, 'এক নিশ্বাসে কি সাতকাণ্ড রামায়ণের কথা বলা যায়? বরং সন্ধের মুখে আমার বাড়িতে যাবেন। নিমন্ত্রণ রইল।'

সুন্দরবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'আ আমার পোড়াকপাল, আমার আবার নিমন্ত্রণ! আমি যে ঢেঁকি, ধান ভানতেই জন্মেছি, স্বর্গে গেলেও ধান ভানতে হবে!'

—'ব্যাপার কী, নতুন কোনো শক্ত 'কেস' হাতে পেয়েছেন নাকি?'

—'কেসটা খুব শক্ত বলে বোধ হচ্ছে না, তবে আগেকার চেয়ে একটু ঘোরালো হয়ে উঠেছে বটে! শুনবে? আচ্ছা চলতে চলতে বলি শোনো।'

সুন্দরবাবুর সঙ্গে অগ্রসর হতে হতে জয়ন্ত এই কথাগুলি শ্রবণ করলে:

—'রামচন্দ্র বসুর বাড়ি হচ্ছে দশ নম্বর ধরণি সেন স্ট্রিটে। তিনতলা বাড়ি—রামবাবুর নিজের বাড়ি। তিনি অবিবাহিত, বয়স পঞ্চাশের ওপারে। ধনী। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে আছে এক ভাইপো, সে দেশে থেকে জমিদারি তদ্বির করে।

'রামবাবু বাড়ির তেতলায় একলা থাকতেন। বাড়ির দোতলার ঘরগুলো ভাড়া নিয়েছে ভৈরবচন্দ্র বিশ্বাস নামে একটি লোক। সে-ও একলা মাস-তিনেক হল কলকাতায় নতুন এসেছে।

'একতলায় দুটি গরিব বাঙালি পরিবার বাস করে। তারা পুরানো ভাড়াটে।

'আজ দু-দিন আগে রামবাবুর শয়নগৃহে রামবাবুর মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। লাশ দেখলেই বোঝা যায়, বিষ পানের ফলে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। স্থির করলুম, আত্মহত্যা।

'কিন্তু তদন্তের ফলে আত্মহত্যার কোনোই কারণ পাওয়া গেল না। রামবাবুর অর্থের অভাব বা অন্য কোনোরকম দুঃখ-দুর্ভাবনাও ছিল না। মৃত্যুর দিন তিনি থিয়েটার দেখে রাত সাড়ে বারোটার সময়ে বাড়িতে ফিরে আসেন।

'কেউ যে তাঁকে বিষ খাইয়ে মেরেছে, এমন প্রমাণও পেলুম না। প্রথমত, সকলেরই মুখে শুনলুম তিনি অজাতশত্রু, সবাই তাঁকে ভালোবাসে। দ্বিতীয়ত, তাঁর ঘর থেকে কিছুই চুরি যায়নি। লোহার সিন্দুকের চাবি তাঁর পকেটেই ছিল। সিন্দুকের ভিতরে পাওয়া গিয়েছে ছয় শত টাকার নোট আর কিছু সোনার গহনা। চুরি করবে বলে নিশ্চয়ই কেউ তাঁকে বিষ খাওয়ায়নি। চোর কখনো এতগুলো টাকা আর গহনা ফেলে যেত না!

'লাশ শব-ব্যবচ্ছেদাগারে পাঠিয়েছিলুম। ডাক্তারের রিপোর্টে প্রকাশ, রামবাবুর মৃত্যু হয়েছে গোখরো সাপের বিষে। অথচ তাঁর গায়ের কোথাও সর্পদংশনের দাগ নেই! তাঁর ডান পায়ে তিনটে ছোটো ছোটো টাটকা ক্ষতচিহ্ন আছে বটে, কিন্তু ডাক্তারের মতে সেগুলো হচ্ছে বিড়ালের মতো কোনো ছোটো জানোয়ারের নখ দিয়ে আঁচড়ানোর দাগ!

'দ্যাখো তো ভাই জয়ন্ত, এ আবার কী ফ্যাসাদ! সর্পদংশনের দাগ নেই, অথচ রামবাবুর মৃত্যু হয়েছে গোখরো সাপের কামড়ে! আর কলকাতা শহরে পাকা বাড়ির তেতলায় গোখরো সাপ! অপরংবা কিং ভবিষ্যতি! তাই চলেছি আবার তদন্তে।

'হুম্! এই যে আমরা ঘটনাস্থলে এসে পড়েছি! এইখানে রামবাবুর বাড়ি। জয়ন্ত, মানিক, তোমাদেরও তো চড়ুকে পিঠ, যদি আগ্রহ থাকে আমার সঙ্গে আসতে পারো।'

দেশে ফিরেই আবার এ-রকম অপ্রীতিকর মামলা নিয়ে মাথা ঘামাবার জন্যে জয়ন্ত ও মানিকের কোনোই আগ্রহ হল না। তারা সুন্দরবাবুর কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করতে যাচ্ছে, এমন সময়ে রামবাবুর বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটি যুবক। তার মাথার চুল এলোমেলো, দুই চক্ষু রক্তবর্ণ, দুই গালে অশ্রুর চিহ্ন—সারা মুখখানি যেন বিষাদে আচ্ছন্ন।

সুন্দরবাবু শুধোলেন, 'তুমি আবার কে বাপু?'

—'আমি রামবাবুর ভাইপো।'

—'নাম কী?'

—'অজিতকুমার বসু।' তারপর একটু থেমেই সে বললে, 'শুনছি, কাকাবাবুর লোহার সিন্দুকে নাকি মোটে ছ-শো টাকা পাওয়া গিয়েছে?'

—'হ্যাঁ।'

অজিত পকেট থেকে একখানা পত্র বার করে বললে, 'কাকাবাবু যে রাত্রে মারা যান সেইদিনই এই চিঠিখানা আমাকে লিখেছিলেন। আর এই চিঠি পেয়েই তাড়াতাড়ি আমি কলকাতায় এসেছি।'

চিঠিখানা পড়তে পড়তে সুন্দরবাবু বার বার 'হুম্' শব্দ উচ্চারণ করছেন শুনে জয়ন্তও কৌতূহলী হয়ে তাঁর কাঁধের উপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলে।

চিঠিখানা এই:

'স্নেহের অজিত,

যুদ্ধ বেধেছে বলে অনেকেই ভয়ে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নিচ্ছে। বন্ধুদের পরামর্শে আমাকেও তাই করতে হল। আমার সমস্ত টাকা—অর্থাৎ পাঁচ লক্ষ আমি আজ ব্যাঙ্ক থেকে তুলে এনেছি। পঞ্চাশখানি দশ হাজার টাকার নোট আমার ঘরের লোহার সিন্দুকে বেশি দিন রাখা নিরাপদ হবে না। এ-সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই—কারণ তুমিই আমার উত্তরাধিকারী। অতএব পত্র পেয়েই কলকাতায় চলে এসো। ইতি, তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরামচন্দ্র বসু'

চিঠি-পড়া শেষ করে সুন্দরবাবু আবার বললেন, 'হুম্।'

জয়ন্ত বললে, 'অজিতবাবু, আপনার বিশ্বাস ওই লোহার সিন্দুকেই রামবাবু পঞ্চাশখানি দশ হাজার টাকার নোট রেখেছিলেন?'

—'কাকাবাবুর একটিমাত্র লোহার সিন্দুকই আছে।'

'সুন্দরবাবু, আপনি কী বলেন?'

—'এ আবার কী হল ভাই জয়ন্ত! ভেবেছিলুম মামলাটা খুব হালকা, কিনারা করতে দেরি লাগবে না! কিন্তু কেঁচো খুঁজতে খুঁজতে ক্রমেই যে সাপের পর সাপ বেরুচ্ছে!'

মানিক বললে, 'যে সে সাপ নয় সুন্দরবাবু, একেবারে জাত-গোখরো!'

—'হুম্, বিষম রহস্য! সাপে কামড়ায়নি, অথচ সাপের বিষে মৃত্যু! লোহার সিন্দুক থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা অদৃশ্য! মানে, এ মামলাটা হচ্ছে খুনের মামলা!'

জয়ন্ত যেন আপন মনেই বললে, 'লাশের পায়ে বিড়ালের মতন ছোটো জানোয়ার নখ দিয়ে আঁচড়েছে! এরই বা মানে কী?'

॥ দ্বিতীয় ॥

কুকুর ও বিড়াল

রামবাবুর শয়নগৃহে ঢুকে জয়ন্ত খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগল। তারপর বললে, 'সুন্দরবাবু, আপনি কি এ মামলায় আমার সাহায্য চান?'

সুন্দরবাবু বললেন, 'সে কথা আর বলতে! আমার মাথার সঙ্গে তোমার মাথা মিললে আমরা দুজনে দিগ্বিজয় করতে পারি।'

জয়ন্ত হেসে বললে, 'আপাতত বোধ হয় দিগ্বিজয় করবার দরকার হবে না। আচ্ছা বলুন দেখি, আপনি যখন প্রথম এ ঘরে ঢোকেন, তখন জানালাগুলো কি খোলা ছিল?

—'না, একটা জানলাও খোলা ছিল না। দরজাটাও ছিল ভিতর থেকে বন্ধ।'

—'তাহলে সাপটা ঘরের ভিতরে ঢুকল কেমন করে?'

মানিক বললে, 'হয়তো ঘরের কোনো কোনো জানলা খোলা ছিল, রামবাবু ঘরে ঢুকে নিজের হাতে বন্ধ করে দিয়েছিলেন।'

—'তাহলে গোখরো সাপটা পালাল কোন পথ দিয়ে?'

—'হয়তো ওই নর্দমা দিয়ে ঢুকে সে আবার বেরিয়ে গিয়েছে।'

—'মানিক, তোমার এ অনুমানটাও সত্য হতে পারে। কিন্তু রামবাবুর দেহের কোথাও সর্পদংশনের চিহ্ন নেই কেন? গোখরো সাপের বিষ পান করলেও কারুর মৃত্যু হয় না, জানো তো? ও বিষ রক্তের সঙ্গে না মিশলে মারাত্মক হয় না।'

মানিক হতভম্বের মতন মাথা চুলকোতে শুরু করলে।

একতলায় যারা ভাড়া থাকত তারা তখন উপরে এসে দাঁড়িয়ে ছিল।

তাদের একজনকে ডেকে জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, 'ঘটনার দিন রামবাবু সাড়ে বারোটার সময়ে বাড়িতে ফিরেছিলেন?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'সেদিন এখানে কোনো সন্দেহজক ঘটনা' ঘটেছিল?'

—'আজ্ঞে না।'

—'কোনো শব্দ-টব্দ শুনেছিলেন?'

—'আপনি জিজ্ঞাসা করছেন বলে এখন একটা কথা আমার মনে হচ্ছে। সে-

রাত্রে রামবাবু হঠাৎ এত জোরে শোবার ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিলেন যে আমরা সবাই চমকে উঠেছিলুম।'

—'অত জোরে তিনি কখনো দরজা বন্ধ করেন না?'

—'না। তিনি অত্যন্ত ধীর স্থির মানুষ।'

—'বেশ। এটা একটা ভালো সূত্র বলে মনে হচ্ছে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আমার মতে এটা উল্লেখযোগ্য সূত্রই নয়!'

জয়ন্ত বললে, 'কেন নয়?'

—'এর দ্বারা কী প্রমাণিত হচ্ছে?'

—'প্রমাণিত হচ্ছে যে, হঠাৎ কোনো কারণে ভয় পেয়ে রামবাবু তাড়াতাড়ি সজোরে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।'

—'হুম্। হতেও পারে, না হতেও পারে।'

জয়ন্ত আবার লোকটির দিকে ফিরে বললে, 'রামবাবুর পায়ে বিড়ালের আঁচড়ানোর দাগ পাওয়া গিয়েছে। তিনি কি বিড়াল পুষতেন?'

—'না মশাই। বিড়ালকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করতেন।'

—'এ বাড়িতে আর কেউ বিড়াল পোষে?'

—'কেউ না। তবে একটা বিষম খেঁকি হুলোবিড়াল খাবারের লোভে প্রায়ই এখানে হানা দেয় বটে।' লোকটি একবার থেমে আবার বললে, 'ঘটনার দিন সন্ধ্যাবেলাতে দোতলায় সেই বিড়ালটার আর্তনাদও শুনেছিলুম।'

—'দোতলায় থাকেন ভৈরববাবু?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'বিড়ালটা আর্তনাদ করছিল কেন?'

—'তা আমি জানি না।'

—'রামবাবু তখন বাড়িতে ছিলেন?'

—'না।'

—'ভৈরববাবু?'

—'তিনিও সন্ধ্যার পর বেরিয়ে গিয়েছিলেন।'

—'তারপর ফিরে এসেছিলেন তো?'

—'হ্যাঁ, প্রায় শেষ-রাতে।'

—'শেষ-রাতে! কেন?'

—'কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে তাঁর নিমন্ত্রণ ছিল।'

—'আচ্ছা, এইবারে ভালো করে মনে করে দেখুন দেখি, সে-রাত্রে আর কোনো ঘটনা ঘটেছিল কি না?'

—'আপনাদের কাজে লাগতে পারে এমন কোনো ঘটনার কথা মনে পড়ছে না।'

—'তবু ভেবে দেখুন। যে-কোনো ঘটনা আমাদের কাজে লাগতে পারে।'

—'কিন্তু এ অতি বাজে ঘটনা। হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। রাত তখন দুটোর কম হবে না। ঘুম ভাঙতেই শুনি, বাড়ির পাশের খানার ভিতর থেকে একটা বিড়াল আর একটা কুকুরের তুমুল ঝগড়ার শব্দ আসছে। খানিক পরেই সব চুপচাপ।'

জয়ন্ত গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর বললে, 'আপনার আর কিছু মনে পড়ে?'

—'আজ্ঞে না।'

উপস্থিত আরও তিনজন লোকের মুখ থেকে নূতন কোনো তথ্যই জানা গেল না।

এমন সময়ে ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল আর একটি নূতন মানুষ।

তারপর বয়স হবে বছর পঁয়ত্রিশ। শ্যামবর্ণ। দাড়ি-গোঁফ কামানো। দোহারা দীর্ঘ চেহারা—দেখলেই তাকে বেশ বলিষ্ঠ বলে মনে হয়। জামাকাপড়ে শৌখিনতার চিহ্ন। লোকটির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তার হাসিখুশিমাখা প্রশান্ত মুখ এবং অতিবিনীত অমায়িক ভাবভঙ্গি।

সেখানে এসেই লোকটি বললে, 'আমার নাম শ্রীভৈরবচন্দ্র বিশ্বাস।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'আপনার চেহারায় ভৈরবত্ব কিছুই নেই। আপনার নাম হওয়া উচিত ছিল সুশান্ত।'

ভৈরব চোখে-মুখে হাসির উচ্ছ্বাস ফুটিয়ে বললে, 'ও-রকম কথা আরও কেউ কেউ বলেছেন। কিন্তু এখন আর পিতার ভ্রম সংশোধন করবার উপায় নেই।'

জয়ন্ত বললে, 'বাড়ির দোতলায় আপনি থাকেন?'

ভৈরব যুক্তহস্তে বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'শুনছি কলকাতায় আপনি নতুন এসেছেন?'

'আজ্ঞে, ঠিক নতুন নই, মাস-তিনেক এসেছি। ছেলেবেলাতেও কলকাতার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল।'

—'আপনি কী করেন?'

—'আজ্ঞে স্যার, এইবারেই আপনি আমাকে বিপদে ফেললেন। কারণ, আমি কিছুই করি না।'

—'কিছুই করেন না!'

—'কিছু না স্যার, কিছু না। খালি ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়াই দেশে দেশে। কখনো ভারতের ভিতরে, কখনো ভারতের বাইরে। এক দেশে বেশিদিন থাকলেই আমার অসুখ হয়। কলকাতাতেও আর আমার মন টিকছে না। স্থির করেছি, শীঘ্রই পিঠটান দেব।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম্! খাসা আছেন দেখছি! আমিও তো মাঝে মাঝে মনে করি, দুনিয়ার দিকে দিকে পথে পথে ছোটাই আমার পদযুগলকে—কিন্তু পারি না কেবল পাথেয়ের অভাবে।'

—'পাথেয় স্যার? ওইখানেই ভগবান আমাকে দয়া করেছেন। বাবা পরলোকে, কিন্তু তাঁর পরিপূর্ণ লোহার সিন্দুকের চাবিটি রেখে গিয়েছেন ইহলোকেই। আমার ভাইবোন কেউ নেই।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'মশাই, আপনার সৌভাগ্যে আমার হিংসা হচ্ছে।'

বিনয়ে ভেঙে পড়ে ভৈরব হাসতে লাগল।

জয়ন্ত বললে, 'ভৈরববাবু, ঘটনার দিন সন্ধেবেলায় আপনার দোতলায় একটা বিড়াল আর্তনাদ করেছিল কেন?'

ভৈরব হাসতে হাসতেই বললে, 'বড়োই চোট্টা বিড়াল স্যার, বড়োই চোট্টা বিড়াল! রোজ চুপিচুপি আমার খাবার খেয়ে চম্পট দেয়। তাই সেদিন তাকে ধরতে পেরে আচ্ছা করে উত্তম-মধ্যম দিয়েছিলুম।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'বেশ করেছিলেন মশাই, আমার বাসাতেও ওইরকম একটা মহাচোর ধুম্বো বিড়াল আসে। আজ পর্যন্ত কত বড়ো বড়ো চোর ধরলুম, কিন্তু সে বেটাকে কিছুতেই আর গ্রেপ্তার করতে পারলুম না!'

জয়ন্ত বললে, 'সন্ধের পর আপনি কোথাও নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলেন?'

ভৈরব বললে, 'হ্যাঁ স্যার, এক বন্ধুর মেয়ের বিয়ে ছিল। ফিরেছি রাত সাড়ে তিনটেয়।'

—'অত রাত হল কেন?'

—'বন্ধুর বাড়ি আগড়পাড়ায়। কাজকর্ম চুকতেই রাত প্রায় একটা বেজে গেল। তারপর ট্যাক্সি চড়ে এসেছি কলকাতায়।'

—'এখানে এসে সন্দেহজনক কিছু লক্ষ করেছিলেন?'

—'কিছু না স্যার, কিছু না! সব চুপচাপ। কোথাও একটি টুঁ শব্দ পর্যন্ত ছিল না!'

—'আচ্ছা, আপাতত আমার আর কিছু জানবার নেই। সুন্দরবাবু, এখন আপনি প্রশ্ন করতে পারেন।'

সুন্দরবাবু বিরক্তি-ভরে বললেন, 'হুম্! প্রশ্ন করব না ছাই করব! এতক্ষণ প্রশ্ন করে তুমি কী জানতে পারলে? জানা গেল খালি তো এই: একটা বিড়াল একজন মানুষকে আঁচড়ে দিয়েছে। একটা চোর-বিড়াল ধরা পড়ে চোরের মার খেয়েছে। এ-সব জেনে আমাদের লাভ? খুনের মামলার সঙ্গে বিড়ালের ইতিহাসের সম্পর্ক কী?'

জয়ন্ত হেসে বললে, 'যা বলেছেন! এ মামলায় বিড়ালের উপদ্রব বড়ো বেশি। আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে!'

—'সন্দেহ? কীসের সন্দেহ?'

—'সন্দেহ হচ্ছে, হয়তো একটা বিড়াল এসেই শেষটা আমাদের আসল পথ বাতলে দেবে!'

—'পথ বাতলে দেবে? কেমন করে? ম্যাও ম্যাও রবে চেঁচিয়ে?'

হা হা করে হেসে উঠে ভৈরব বললে, 'স্যার, আপনি বেশ মজার কথা বলেন!'

সুন্দরবাবু বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, 'মশাই, মজার কথায় আসামি গ্রেপ্তার হয় না! চলো জয়ন্ত, থানায় যাই। কী যে ছাই রিপোর্ট লিখব, তাই এখন ভাবছি!'

মানিক বললে, 'কিছু ভাববেন না সুন্দরবাবু, কিছু ভাববেন না! রিপোর্টে লিখুন, তিন বিড়ালের কাহিনি।'

—'যাও যাও মানিক, বাজে বোকো না—কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ো না!'

সকলে নেমে বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়ালেন। কয়েক পদ অগ্রসর হয়ে এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে জয়ন্ত বললে, 'এইটেই বুঝি খানা?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

—'এর ভিতর থেকেই বিড়াল-কুকুরের ঝগড়ার শব্দ শোনা গিয়েছিল?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

খানাটা হাত-আড়াই চওড়া। লম্বায় অনেকখানি। অন্য প্রান্তটা আধা-অন্ধকারে অস্পষ্ট। তলদেশে আধহাত চওড়া একটি খোলা ড্রেন। এখানে-ওখানে দুর্গন্ধময় জঙ্গল ছড়ানো।

জয়ন্ত খানার ভিতরে প্রবেশ করলে বিনাবাক্যব্যয়ে।

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম্, ও কী হে?'

জয়ন্ত অগ্রসর হতে হতে বললে, 'খানার ভিতরটা একবার বেড়িয়ে আসি।'

—'ওই মেথরের পথ কি বেড়াবার ঠাঁই?'

জয়ন্ত জবাব দিলে না।

ভৈরব বললে, 'স্যার, মাপ করবেন। কিন্তু আপনার বন্ধুটির হাবভাব যেন কেমন কেমন!'

—'হ্যাঁ, জয়ন্তের মাথায় একটু ছিট আছে। নইলে ওর আর সব ভালো।'

—'খানার ভিতরে গিয়ে উনি কী দেখতে চান?'

—'ভগবান জানেন।'

মিনিট কয় পরে জয়ন্ত একটা মৃত বিড়ালকে ও একটা মৃত কুকুরকে লাঙ্গুল ধরে টানতে টানতে খানার বাইরে নিয়ে এল।

সুন্দরবাবু বিস্ফারিত চক্ষে চেয়ে রইলেন, বিপুল বিস্ময়ে তাঁর মুখ দিয়ে কোনো কথাই বেরুল না।

মানিক বললে, 'জয়, আজ কি তুমি ধাঙড়ের কর্তব্য পালন করতে চাও?'

জয়ন্ত উৎফুল্ল স্বরে বললে, 'উঁহু, এই মরা কুকুর আর বিড়ালকে আমার পরীক্ষাগারে নিয়ে গিয়ে ভালো করে পরীক্ষা করতে চাই।'

—'কী আশ্চর্য, কেন?'

—'আমার বিশ্বাস, এরা মারা পড়েছে বিষের চোটে।'

—'বেশ তো, তার জন্যে তোমার মাথাব্যথা কেন?'

—'আমি জানতে চাই, সেটা কী-রকম বিষ। হয়তো একই গোখরো সাপের বিষে মৃত্যু হয়েছে রামবাবুর, আর এই বিড়াল-কুকুরের।'

॥ তৃতীয় ॥

জয়ন্তের গল্প

পরদিন হন্তদন্তের মতন সুন্দরবাবু এসে হাজির জয়ন্তের বাড়িতে! জয়ন্ত ও মানিক বসে বসে কথাবার্তা কইছিল।

সুন্দরবাবু বললেন, 'জয়ন্ত, তুমি ভৈরবের ঘর খানাতল্লাশ করবার জন্যে পরোয়ানা আনতে বলেছ কেন?'

—'আমি নিজের একটা সন্দেহ দূর করতে চাই!'

—'সন্দেহ আবার কীসের?'

জয়ন্ত সোজাসুজি জবাব না দিয়ে বললে, 'সুন্দরবাবু, আমি সেই কুকুর আর বিড়ালের মৃতদেহ পরীক্ষা করেছি।'

—'করে কী লাভ হল?'

—'জানতে পারলুম যে সেই বিড়াল আর কুকুরের মৃত্যু হয়েছে গোখরো সাপের বিষে।'

—'হুম্! কী আশ্চর্য!'

—'আরও আশ্চর্য এই যে, তাদের কাউকেই সাপে কামড়ায়নি।'

সুন্দরবাবু চমকে বললেন, 'অ্যাঁঃ! তাহলে তারাও রামবাবুর মতো সাপের কামড় না খেয়েও সাপের বিষে মারা পড়েছে?'

—'হ্যাঁ।'

—'এ কী রহস্য!'

—'বিড়ালের থাবাগুলোও আমি পরীক্ষা করেছি।'

—'থাবা?'

—'হ্যাঁ, থাবা। তার থাবাগুলোর প্রত্যেক নখেই মাখানো ছিল গোখরো সাপের বিষ।'

—'এ আবার কী ব্যাপার বাবা?'

—'কোনো লোক বিড়ালটাকে ধরে তার নখে বিষ মাখিয়ে দিয়েছে।'

—'মানে?'

—'একটা মানেও আবিষ্কার করেছি।'

—'শুনি, শুনি।'

—'এই বিড়ালটাই হচ্ছে রামবাবুর হত্যাকারী।'

—'ধেৎ!'

—'এই নিয়ে আমি একটা গল্পও রচনা করেছি। শুনবেন?'

—'আরে না, না! আমার এখন বাজে গল্প শোনবার সময় নেই।'

—'তবু শুনুন।'

সুন্দরবাবু নাচারের মতন মুখভঙ্গি করলেন।

জয়ন্ত বললে, 'মনে আছে, রামবাবুর বাড়ির একতলার ভাড়াটিয়া কী কী বলেছে? প্রথমত, রামবাবু থিয়েটার থেকে ফিরে খুব জোরে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, ঘটনার দিন সন্ধ্যার সময় ভৈরবের অধিকৃত দোতলায় একটা বিষম খেঁকিবিড়ালের আর্তনাদ শোনা গিয়েছিল। তৃতীয়ত, রাত প্রায় দুটোর সময়ে বাড়ির পাশে খানায় একটা বিড়াল আর একটা কুকুর ঝগড়া করেছিল। চতুর্থত, রামবাবুর মৃতদেহের পায়ে বিড়ালের আঁচড়ের দাগ ছিল। প্রত্যেক ব্যাপারটাই তুচ্ছ। কিন্তু এরই উপরে দাঁড় করিয়েছি আমার গল্পের কাঠামো।'

—'যত সব বাজে কথা!'

—'আচ্ছা, এখন আমার গল্প শুনুন। ভৈরব হচ্ছে একটি ঝানু লোক। সে কোনোগতিকে টের পেয়েছিল, রামবাবুর লোহার সিন্দুকে আছে পাঁচ লক্ষ টাকা! এই টাকার উপরে তার লোভ হয়। তাই সে এক অদ্ভুত উপায়ে রামবাবুকে হত্যা করবার সংকল্প করে। ঘটনার দিন বৈকালে সে একটা প্রায় বন্য বিড়ালকে বন্দি করে। তার কাছে আগে থাকতেই গোখরো সাপের বিষ সংগ্রহ করা ছিল। সেই বিষ সে জোর করে বন্দি বিড়ালটার চার থাবার নখে মাখিয়ে দেয়। এই কারণেই দোতলায় বিড়ালের আর্তনাদ শোনা গিয়েছিল। তেতলায় ঘর বন্ধ করে রামবাবু থিয়েটার দেখতে বেরিয়ে যান। ভৈরব লুকিয়ে বিড়ালটাকে নিয়ে তেতলায় ওঠে। খড়খড়ির পাখির ফাঁকে হাত গলিয়ে জানলা খোলে। বিড়ালটাকে ঘরের ভিতরে পুরে দিয়ে আবার জানালা বন্ধ করে। তারপর 'নিমন্ত্রণ বাড়ি যাচ্ছি' বলে বাড়ি থেকে সরে পড়ে—সকলের সন্দেহের বাইরে থাকবে বলে। তারপর থিয়েটার দেখে রামবাবু ফিরে আসেন। নিজের ঘরের দরজা খোলেন। সঙ্গে সঙ্গে পালাবার পথ খোলা পেয়ে ভীত আর ক্রুদ্ধ বিড়ালটা ছুটে আসে, আর তাঁর পায়ে আঁচড়ে দিয়ে বাইরে পালিয়ে যায়। রামবাবু ভয় পেয়ে সজোরে দরজা বন্ধ করে দেন। তার খানিকক্ষণ পরে বিড়ালের বিষাক্ত নখের প্রভাবে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। রামবাবুর মৃত্যু হয়। তারপর শেষ রাতে ঘটনাস্থলে ভৈরবের আবির্ভাব। রামবাবু নিশ্চয়ই ঘরের দরজায় খিল দেননি। ভৈরব ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে। মৃতের পকেট থেকে চাবি নিয়ে লোহার সিন্দুক খোলে।'

সুন্দরবাবু দুই চোখ বিস্ফারিত করে বললেন, 'হুম্! এমন খুনের কথা কে কবে শুনেছে? কিন্তু ভৈরবের অপরাধ তুমি প্রমাণ করবে কেমন করে?'

জয়ন্ত বললে, 'হয়তো তার ঘর খানাতল্লাশ করলে কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে। হয়তো সে ভেবেছে পুলিশ এই আশ্চর্য খুনের রহস্য বুঝতে পারবে না, তাই এখনও সাবধান হয়নি।'

সুন্দরবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'না জয়ন্ত, এখনও সব রহস্য পরিষ্কার হল না। ওই একই গোখরো সাপের বিষে কুকুর আর বিড়ালেরও মৃত্যু হল কেন?'

জয়ন্ত বললে, 'এ-কথাও আমি ভেবে দেখেছি। ভুলবেন না, ঘটনার রাত্রে বাড়ির পাশের খানায় কুকুর আর বিড়ালের ঝগড়ার শব্দ শোনা গিয়েছিল। কুকুরটা নিশ্চয়ই বিড়ালটাকে তাড়া করে তার পিছনে পিছনে খানায় গিয়ে ঢোকে। সেখানে তাদের ভিতরে মারামারি হয়। বিড়ালের নখের বিষে কুকুর মারা পড়ে।'

—'আর বিড়ালটা?'

—'সে-ও নাকে-মুখে কুকুরের কামড় খেয়েছিল। তারপর ক্ষতস্থানে যখন নিজের থাবা বুলোচ্ছিল, তখন নখের বিষ গিয়ে মিশেছিল তারও রক্তে।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'তোমার অনুমান হয়তো মিথ্যা নয়, কিন্তু আদালতে এ-সব কথা প্রমাণ করা সহজ হবে না। এ-সব যেন ডিটেকটিভ উপন্যাসের মতন শোনাচ্ছে!'

জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আদালতের কথা পরে হবে। আপাতত এখানে বসে সময় নষ্ট না করে ঘটনাস্থলে যাত্রা করাই উচিত।'

সুন্দরবাবু বললেন, 'ঠিক! তাই চলো।'

কিন্তু ঘটনাস্থলে গিয়ে শোনা গেল, ভৈরব গত রাত্রেই কোথায় বেরিয়ে গিয়েছে, এখনও ফিরে আসেনি।

জয়ন্ত বললে, 'সে বোধহয় আর ফিরবেও না। ভৈরব আমাদের সন্দেহ করেছে। আমি যে বিড়ালের মৃতদেহ আবিষ্কার করব এতটা সে ভাবতে পারেনি।'

॥ চতুর্থ ॥

'স্যারং' ও 'প্যারাং' প্রভৃতি

সুন্দরবাবু বললেন, 'একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না জয়ন্ত! ভৈরব কেমন করে আন্দাজ করলে যে আমরা তাকে সন্দেহ করেছি?'

জয়ন্ত বললে, 'খুব সহজেই। তার চোখের সামনেই আমরা যে মরা বিড়ালটাকে

আবিষ্কার করেছি! যে লোক এমন অদ্ভুত উপায়ে নরহত্যা করতে পারে সে তো নির্বোধ নয় সুন্দরবাবু!'

—'হুম্, তাহলে তোমার বিশ্বাস ভৈরব আর ফিরবে না?'

—'হ্যাঁ, এ-বিষয়ে আর কোনোই সন্দেহ নেই। তার পক্ষে এখন ফিরে আসা মানে আত্মহত্যা করা! তাকে খুঁজে বার করতে হবে আমাদেরই।'

—'কিন্তু কোথায় তাকে খুঁজব?'

—'সে কথা একটু পরে ভাবলেও চলবে। আপাতত তার ঘর খানাতল্লাশ করা দরকার, চলুন।'

দোতলায় ছিল তিনখানা কামরা ও একখানা রান্নাঘর। তার মধ্যে একটি ঘর বাহির থেকে তালাবন্ধ। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, সেখানা হচ্ছে ভৈরবের শোবার ঘর। তালা ভেঙে ঘরের দরজা খুলে ফেলা হল।

সুন্দরবাবু একবার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'ভৈরব দেখছি আসবাবপত্তর কিছুই নিয়ে যায়নি। হয়তো সে ফিরে আসবে।'

জয়ন্ত বললে, 'আসবাব রেখে গেছে সে আমাদের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্যে। যাতে আমরা ভাবি সে পালায়নি। ভৈরবের সঙ্গে আছে পাঁচ লক্ষ টাকা, তার কাছে এই আসবাবগুলো তো তুচ্ছ!'

মানিক বিস্মিত স্বরে বললে, 'জয়ন্ত, আনলায় কী ঝুলছে, দেখছ?'

—'হুঁ, 'স্যারং'!'

—'আরে, টেবিলের উপরে যে একখানা 'ক্রিশ' রয়েছে!'

—'আর এই দ্যাখো, একখানা 'প্যারাং'!'

—'এদিকে রয়েছে 'রাত্যানে'র তৈরি একটা 'বাস্কেট', ঘরের কোণেও দেখছি 'রাত্যানে'র লাঠি!'

সুন্দরবাবু হতভম্বের মতন বললেন, 'স্যারাং, ক্রিশ, প্যারাং, রাত্যান! এ-সব কী কথা বাবা?'

জয়ন্ত বললে, 'স্যারং মানে হচ্ছে একরকম কাপড়। প্যারাং একরকম বড়ো ছুরি! ক্রিশও আর একরকম ছুরির নাম। রাত্যান একজাতের গাছ, তা দিয়ে দড়ি, লাঠি আর ঝুড়ি প্রভৃতি তৈরি করা হয়।'

—'ও-সব কোন দেশের কথা?'

—'মালয় উপদ্বীপের। সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপেও ওই জিনিসগুলির চলন আছে।'

—'থাক গে, ও নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে রাজি নই।'

টেবিলের 'ড্রয়ার' টেনে খান-কয়েক খাম বার করে নিয়ে জয়ন্ত বললে, 'খামগুলোর উপরেও দেখছি সুমাত্রার ডাকঘরের ছাপ। বোধ হচ্ছে ভৈরব ও অঞ্চলে অনেকদিন বাস করেছিল। এখনও তার বন্ধুরা সেখান থেকে তাকে চিঠিপত্র লেখে।—বটে, বটে, বটে!' জয়ন্ত হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল, তার মুখে চিন্তার ছায়া।

সুন্দরবাবু এটা-ওটা-সেটা নাড়তে নাড়তে বললেন; 'যত সব বাজে জিনিস। এখানে ভৈরবের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণই নেই। চলো জয়ন্ত, আর মিছে সময় নষ্ট করে লাভ কী?'

জয়ন্ত হঠাৎ বললে, 'রামবাবুর ঘরে টেলিফোন দেখেছিলুম না?'

—'হ্যাঁ। কিন্তু কেন?'

জয়ন্ত কোনো উত্তর না দিয়ে দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুন্দরবাবু বললেন, 'মানিক, তোমার বন্ধুর মতলব কী বলো তো? ও কখন যে কী বলে আর কী করে, কিচ্ছু বোঝা যায় না! হুম্!'

মানিক সহাস্যে বললে, 'অতএব জয়ন্তকে বোঝবার চেষ্টা ছেড়ে দিন। কী জানি, যদি শেষটা আপনার মূল্যবান মস্তিষ্ক গুলিয়ে যায়?'

সুন্দরবাবু ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, 'ঠাট্টা ভালো লাগে না। আমি কি তোমার ঠাট্টার পাত্র?'

খানিক পরেই জয়ন্ত ফিরে এসে বললে, 'টেলিফোনে খবর নিয়ে জানলুম, আজ বেলা সাড়ে-বারোটার সময় ডায়মন্ড হারবার থেকে একখানা জাহাজ ছাড়বে—রেঙ্গুন হয়ে সে যাবে সিঙ্গাপুরের দিকে!'

সুন্দরবাবু বললেন, 'তাতে তোমারই বা কী, আর আমারই বা কী?'

—'ইচ্ছা করলে এখনও আপনি সেই জাহাজখানা ধরতে পারেন।'

—'কেন শুনি?'

—'ভৈরব হয়তো সেই জাহাজে আছে।'

—'হয়তো?'

—'হ্যাঁ, এটা আমার আন্দাজ।'

—'আন্দাজের একটা কারণ আছে তো?'

—'ভৈরবের কথা মনে আছে? সে ভবঘুরে। ভারতের বাইরেও তার গতিবিধি

আছে। আমার দৃঢ়বিশ্বাস ভৈরব মালয়, সুমাত্রা, জাভা প্রভৃতি দেশে বহুকাল বাস করেছে। এই ঘরে তার ব্যবহার করা জিনিসগুলো এ-বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে। এখনও ও-অঞ্চল থেকে তার নামে চিঠিপত্র আসে। আমার মনে হয়, যে উপায়েই হোক অর্থাভাব দূর করবার জন্যেই সে কলকাতায় এসেছিল। আর সেই উদ্দেশ্যেই সে নরহত্যা করেছে। এখন জানতে পেরেছে যে, আমরা তার গুপ্তকথা ধরে ফেলেছি। এমন অবস্থায় ফাঁসিকাঠকে ফাঁকি দিতে হলে প্রথম সুযোগেই ভারতবর্ষ ত্যাগ করা উচিত। কিন্তু তার পক্ষে কোন দেশে যাওয়া স্বাভাবিক? নিশ্চয় মালয় বা সুমাত্রার দিকে! সে এখান থেকে অদৃশ্য হবার পর এই প্রথম জাহাজ যাচ্ছে ওই অঞ্চলে। এমন সুযোগ সে ছাড়বে বলে মনে হয় না।'

সুন্দরবাবু ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন, 'তোমার আন্দাজটা সত্য হলেও হতে পারে। তুমিও আমার সঙ্গে চলো না কেন?'

জয়ন্ত বললে, 'আমার অন্য কাজ আছে।'

—'তোমার আবার কাজ কী?'

—'দেশে এসে পর্যন্ত বাঁশি বাজাইনি। আজ বাঁশি বাজাব। চলো মানিক!' জয়ন্ত ও মানিক চলে গেল।

সুন্দরবাবু নিজের মনেই বললেন, 'এমন পাগল কি দুনিয়ার দুটি আছে?'

সন্ধ্যার সময়ে জয়ন্ত নিজের ঘরে চুপ করে বসে আছে, হঠাৎ টেলিফোন-যন্ত্র বেজে উঠল। রিসিভারটা তুলে নিয়ে জয়ন্ত বললে, 'হ্যালো!—'

—'কে, জয়ন্ত?'

—'হ্যাঁ।—'

'আমি সুন্দরবাবু,—কেল্লা ফতে! বাহাদুর ভায়া! তোমার আন্দাজই সত্য। ভৈরবকে গ্রেপ্তার করেছি!'

—'সাধু, সাধু!'

—'কিন্তু বেটা ভারী বেগ দিয়েছে। দেখা হলে সব বলব। পাঁচ লক্ষ টাকার নোট সে গঙ্গায় ফেলে দেবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু পারেনি। তবে সে আর একটা কী জিনিস জলে ফেলে দিয়েছে। সেটাকে দেখতে ছোটো শিশির মতো।'

জয়ন্ত বললে, 'তার ভিতরে কী ছিল, আমি বলতে পারি।'

—'বলো দেখি?'

—'গোখরো সাপের বিষ।'

—'হুম্, হুম্, হুম্!'

প্রাইভেট ডিটেকটিভ

॥ ক ॥

বিধু বলত, 'ম্যাট্রিক পাস করেই লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে আমি প্রাইভেট ডিটেকটিভ হব।'

বিধু যে ম্যাট্রিকের ফটক পেরুতে পারবে, এত বড়ো দুরাশার জন্ম অসম্ভব। বিড়ালের কাছে কুকুর যেমন, তার কাছে ইস্কুলের বইগুলোও ছিল তেমনি চক্ষুশূল। দিন-রাত পড়ত খালি গোয়েন্দা-কাহিনি!

অসংখ্য গোয়েন্দা-কাহিনি পড়ে পড়ে বিধুর এখন দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে, ডিটেকটিভ হতে গেলে যা যা জানা দরকার সে-সবের কিছুই তার আর জানতে বাকি নেই!

বিধু যখন-তখন নাক মুখ সিঁটকে বলত, 'যত হাঁদারাম গিয়ে বাংলা দেশের পুলিশের দলে ভরতি হয়েছে। চোর-ডাকাত ধরবার আসল ফন্দিই তারা জানে না। শার্লক হোমসের মতো পাকা ডিটেকটিভ এখানে নেই। আমিই হব বাংলা দেশের প্রথম শার্লক হোমস।'

বিধুর মুখে রোজ এমনি সব কথা শুনে শুনে ক্রমে আমারও তার বুদ্ধি আর শক্তির উপরে শ্রদ্ধা বাড়তে লাগল।

যখন শোনা যেত অমুক জায়গায় খুব বড়ো চুরি হয়ে গেছে, কিন্তু পুলিশ চোর ধরতে পারছে না, বিধু তখন আপশোশ করে বলত, 'ওঃ, বাংলা দেশের পুলিশ কেবল 'ফুলিস' নয়, বদ্ধ অন্ধও! আমি হলপ করে বলতে পারি, ঘটনাস্থলে চোর নিশ্চয় কোনো চিহ্ন রেখে গেছে! একটা বোতাম, আঙুলের দাগ, কি একটা পায়ের ছাপ! তাই দেখেই আমি চোর ধরে দিতে পারি! এ-সব মামলার কিনারা করবার জন্যে পুলিশ আমার কাছে আসে না কেন? বিলাতের পুলিশ তো শার্লক হোমস-এর কাছে আনাগোনা করত!'

আমি চমৎকৃত হয়ে বলতুম, 'ভাই বিধু, এদেশে কেউ তোমাকে চিনতে পারলে না, গেঁয়ো যোগী ভিক্ষা পায় না কিনা! কিন্তু তোমাকে বন্ধুরূপে পেয়ে আমি গর্বিত!'

বিধু মুরুব্বিআনা-চালে বার-দুয়েক আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলত, 'শার্লক হোমসের সঙ্গে ছায়ার মতন থাকতেন তাঁর বন্ধু ওয়াটসন। তুমিই হবে আমার ওয়াটসন! আমরা দুজনে বাংলা দেশের চোর-ডাকাতের বংশ নির্মূল করে ছাড়ব!'

আমি বলতুম, 'এ আমার সৌভাগ্য!'

সেইদিন থেকেই বিধু আমাকে ওয়াটসন বলে ডাকতে শুরু করলে।

॥ খ ॥

আমার সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য জানি না, হঠাৎ একদিন আমাদের বাড়িতে হল এক দুষ্ট চোরের আবির্ভাব।

রাত্রে চোর এসে লোহার সিন্দুক খোলবার চেষ্টা করছিল। পাশের ঘরে ছিলেন বাবা। হঠাৎ কী শব্দ শুনে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। তিনি উঠে গোলমাল করতেই চোর দেয় চম্পট! কিচ্ছু চুরি করতে পারেনি।

বিধু সেই খবর শুনেই উত্তেজিত হয়ে বললে, 'ওয়াটসন, এই ব্যাপার থেকেই আমাদের ডিটেকটিভ জীবনের পত্তন করা যাক! যে চুরি করতে এসেছিল আমি তাকে ধরে দেব!'

সবিস্ময়ে বললুম, 'কেমন করে?'

বিধু মুখে বিপুল গাম্ভীর্যের বোঝা চাপিয়ে বললে, 'ডিটেকটিভের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে, সূত্র আবিষ্কার করা। ঘটনাস্থলে চোর কিছু চিহ্ন রেখে গেছে?'

—'গেছে। একটা কোট।'

—'কোট? কোট তো থাকে গায়ে, চোর সেটা ফেলে গেছে কেন?'

—'কাল রাতে কী-রকম গুমোট গরম গেছে জানো তো? সিন্দুক খোলবার আগে কাজের সুবিধা হবে বলে চোর বেটা বোধ হয় কোটটা গা থেকে খুলে রেখেছিল। তারপর তাড়া খেয়ে তাড়াতাড়িতে কোটটা নিয়ে লম্বা দিতে পারেনি।'

আমার পিঠ চাপড়ে বিধু বললে, 'ওয়াটসন, তোমার আন্দাজ করবার শক্তি দেখে খুশি হলুম! বহুৎ আচ্ছা, নিয়ে এসো সেই কোটটা!'

এক দৌড়ে বাড়িতে গিয়ে কোটটা নিয়ে এলুম। ছোটো ছোটো চৌকো ঘর-কাটা ছিটের কোট।

কোটের পকেট থেকে বেরুল এক প্যাকেট 'পাসিং সো' সিগারেট আর কাগজে মোড়া খানিকটা দোক্তা। এবং একটা আধলা।

বিধু একটা ফিতে নিয়ে কোটটা খানিকক্ষণ ধরে মাপলে। তারপর গম্ভীর স্বরে বললে, 'ওয়াটসন, যে এই কোটের মালিক, সে পান খেতে ভালোবাসে, সে বড়োলোক নয়, সে দেহে খুব লম্বা-চওড়া!'

বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বললুম, 'কী করে এমন অদ্ভুত আবিষ্কার করলে?'

—'সে চিনের বাদামও খায়!'

—'কী আশ্চর্য, কী করে জানলে?'

—'পকেটে যে দোক্তা নিয়ে বেরোয় সে পানের ভক্ত না হয়ে যায় না। যার সম্বল খালি একটা আধলা আর যে 'পাসিং সো'র মতো কম দামের সিগারেট

ব্যবহার করে নিশ্চয়ই সে বড়োলোক নয়। কোটের গলা, ছাতি আর ঝুলের মাপ দেখেই বোঝা যাচ্ছে লোকটার দেহ খুব লম্বা-চওড়া। পকেটের ভেতরে কতকগুলো চিনের বাদামের খোসা পেয়েছি, সুতরাং চোর চিনের বাদামও খায়।'

আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে বললুম, 'ধন্য বিধু, ধন্য তোমার বুদ্ধি!'

বিধু গর্বিত কণ্ঠে বললে, 'চোরের চেহারা আর স্বভাব জানা গেল। এখন তাকে গ্রেপ্তার করতে আর বেশি দেরি লাগবে না। বলতে কী, সে তো আমার এই হাতের মুঠোয়'—বলেই সে হাত মুষ্টিবদ্ধ করে তুলে ধরলে।

আমি বিস্ফারিত চোখে রোমাঞ্চিত দেহে বিধুর হাতের মুঠোর দিকে তাকিয়ে রইলুম—যদিও বুঝতে পারলুম না যে, তার অতটুকু মুঠোর ভিতরে অত বড়ো একটা চোর বন্দি হবে কেমন করে।

বিধু আবার বললে, 'ধিক এই বাংলা দেশের পুলিশ! এইবারে দেখুক তারা, বুদ্ধি থাকলে কত সহজে টপ করে চোর ধরা যায়!'

॥ গ ॥

বিধু মুখে আবার বিপুল গাম্ভীর্যের ভাব এনে বললে, 'ডিটেকটিভের দ্বিতীয় কর্তব্য হচ্ছে, সর্বদা সতর্ক চোখ খুলে রাখা।'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ, সর্বদা চোখ খুলে রাখলে চোখে কিছু পড়বেই—অন্তত পোকামাকড়টাও।'

তারপর কিছুকাল বিধু পথে পথেই দিন কাটায়। আমাকেও দায়ে পড়ে তার সঙ্গে সঙ্গেই থাকতে হয়—কারণ আদি শার্লক হোমসের সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মতো থাকতেন তাঁর বন্ধু ওয়াটসন, আর আমি হচ্ছি সেই ওয়াটসনেরই মূর্তিমান দ্বিতীয় সংস্করণ! না বলবার জো নেই।

ঘুরে ঘুরে পায়ে পড়েছে যখন ফোসকা এবং রোদে পুড়ে পুড়ে গায়ের রং হয়েছে যখন তামাটে, তখন হঠাৎ একদিন আমাদের খুলে-রাখা সতর্ক চোখে পড়ল একটি অতিশয় সন্দেহজনক মূর্তি!

বিধু উত্তেজিত আনন্দে একটি লম্ফত্যাগ করে বললে, 'ওয়াটসন, দেখছ লোকটার চেহারা কী-রকম লম্বা-চওড়া?'

—'হুঁ।'

—'ওর গায়ের কোটটা দ্যাখো!'

—'ছোটো ছোটো চৌকো ঘরকাটা ছিটের কোট। চোর আমাদের বাড়িতে যে কোটটা ফেলে গেছে ঠিক যেন তারই জোড়া।'

—'লোকটা একটা সিগারেটও টানছে। কিন্তু ওটা কী সিগারেট?'

'পাসিং সো হতে পারে। কাছে গিয়ে উঁকি মেরে দেখে আসব নাকি?'

—'ওয়াটসন, তুমি একটি আস্ত এবং মস্ত ass! তাহলে ও সন্দেহ করবে যে! ...আরে দ্যাখো দ্যাখো, লোকটা কাকে ডাকলে!'

—'চিনেবাদামওয়ালাকে।'

—'সব হুবহু মিলে যাচ্ছে! চলো, আমরা ওর পিছু নি!'

পিছু নিলুম। আধ ঘণ্টা এ-পথে সে-পথে ঘুরে ঘুরে লোকটা একটা পানওয়ালার দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

বিধু তফাত থেকে উঁকি মেরে দেখে বললে, 'ওয়াটসন, এ কী হল! ও যে 'গোল্ডফ্লেক' সিগারেটের প্যাকেট কিনলে!'

—'বেটা বোধহয় অন্য কোথাও চুরি করে হঠাৎ বড়োলোক হয়ে পড়েছে!'

—'ওয়াটসন, তুমি একটি জিনিয়াস! ঠিক ধরেছ! এখন একবার যদি ওর কোটটা হাতে পাই!'

—'তাহলে কী হবে?'

—'চোরের কোটের সঙ্গে ওর কোটের মাপ মিললেই তো কেল্লা ফতে!'

—'কিন্তু ও তোমার হাতে কোটটা দেবে কেন?'

—'সেইটেই তো সমস্যা! লোকটা গুন্ডার মতো দেখতে। জোর করে কোট দেখতে চাইলে হয়তো ধাঁ করে মেরেই বসবে।'

লোকটা আবার চলতে সুরু করল। আমরাও তার সঙ্গ ছাড়লুম না।

তারপর সে হঠাৎ একখানা বাড়ির ভিতরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বাড়িখানার উপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বিধু বললে, 'আজ রাত বারোটার সময়ে এইখানে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে।'

॥ ঘ ॥

বিধু মুখে বিপুল গাম্ভীর্যের জাহাজ নামিয়ে এনে বললে, 'ডিটেকটিভের তৃতীয় কর্তব্য হচ্ছে, অসীম সাহসে বিপদ-আপদকে তুচ্ছ করা। ওয়াটসন, নিশ্চয়ই তুমি ভিতু নও!'

রাত বারোটা। আবছা চাঁদের আলোয় আমরা দুজনে সেই বাড়িখানার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। চারিদিক কী স্তব্ধ! পথে নেই জনপ্রাণী।

আমি বললুম, 'আমার বিশ্বাস আমি ভিতু নই। আমাকে কী করতে হবে বলো।'

—'বাড়ির গা বেয়ে ওই যে দেখছ নলটা, ওইটে অবলম্বন করে দোতলায় উঠতে হবে। অবশ্য আমিও উঠব।'

প্রস্তাব শুনেই হৃৎকম্প উপস্থিত হল। কিন্তু মুখে বললুম, 'তারপর?'

—'সেই লোকটা নিশ্চয়ই এখন কোনো ঘরে শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। ঘুমোবার আগে কোটটা সে খুলে রেখেছে। আমাদের সেই কোটটা আবিষ্কার করতে হবে।'

—'যদি ধরা পড়ি?'

—'এটা দেখলে কেউ আর আমাদের ধরতে আসবে না! দেখছ, এটা কী?'

আমি আঁতকে উঠে বললুম, কী সর্বনাশ! তুমি কি মানুষ খুন করতে চাও? ওটা যে রিভলভার!'

বিধু হেসে বললে, 'হ্যাঁ, নকল-রিভলভার! বিলাতি খেলনার দোকানে পাওয়া যায়। এখন এসো, আমরা উপরে উঠি।'

নল বেয়ে দোতলায় ওঠার হাঙ্গামাটা আমার মোটেই ভালো লাগল না। একবার হাত ফসকালেই হয় হাসপাতাল, নয় নিমতলা-ঘাটে যাত্রা করতে হবে সজ্ঞানে না অজ্ঞানে। ওয়াটসন হওয়ার এত বিপদ তা জানতুম না। মনে মনে ভগবানকে ডাকতে লাগলুম। কিন্তু তবু ছাড়ান নেই, শেষপর্যন্ত উঠতে হল।

ফাঁড়ার প্রথম ধাক্কাটা কেটে গেল। জ্যান্ত অবস্থাতেই ছাদের উপরে গিয়ে দাঁড়ালুম বটে, কিন্তু বুকের ঢিপ ঢিপ শব্দ শুনতে পেলুম স্পষ্ট।

একহাতে টর্চ, আর একহাতে নকল-রিভলভার নিয়ে বিধু চুপিচুপি বললে, 'ওইদিকে সিঁড়ি রয়েছে। পা টিপে টিপে আমার সঙ্গে নেমে এসো।'

পা টিপে টিপেই অগ্রসর হলুম বটে, কিন্তু মনে হতে লাগল আমার বুকের দুপদুপনির শব্দে সারা পাড়া এখনই জেগে উঠবে। মনে মনে বললুম, 'হে মা কালী, হে মা দুর্গা! এ-যাত্রা যদি মানে মানে আমাকে রক্ষা করো, তাহলে আমি আর কখনো ওয়াটসন হবার চেষ্টা করব না।'

কিন্তু আমার কাতর প্রার্থনা মা-কালী বা মা-দুর্গার কাছে পৌঁছবার আগেই বারান্দার ওধারের অন্ধকারের ভিতর থেকে গর্জন করে কে বলে উঠল,—'কে রে! কে রে! কে রে!' তারপরেই অতি দ্রুত পায়ের শব্দ।

বারান্দার এপাশ হাতড়ে বিধু তৎক্ষণাৎ একটা দরজা আবিষ্কার করে ফেললে এবং চোখের পলক পড়বার আগেই আমাকে টেনে নিয়ে একটা অন্ধকার ঘরে ঢুকে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলে।

॥ ৬ ॥

বিধু বললে, 'ডিটেকটিভের চতুর্থ কর্তব্য হচ্ছে, উপস্থিত বুদ্ধি খাটাতে পারা। ভাগ্যিস আমি উপস্থিত বুদ্ধি হারাইনি, নইলে এতক্ষণে ওরা আমাদের ধরে ফেলত!'

হঠাৎ 'সুইচ-টেপার শব্দ,'—সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতরে যেন তীব্র আলোর ঝড় খেলে গেল!

এক মুহূর্ত অন্ধের মতো থেকে যখন আবার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে পেলুম তখন স্তম্ভিত নেত্রে দেখলুম যে, খাটের উপরে অবাক বিস্ময়ে বসে আছেন আমাদেরই ইস্কুলের হেডপণ্ডিতমশাই!

নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারলুম না,—এও কি সম্ভব? আমাদের ইস্কুলের সদাই-খাপ্পা হেডপণ্ডিতমশাই, ভয়ংকর খোট্টাই গাঁট্টার আবিষ্কারক রূপে ছেলেমহলে যিনি অত্যন্ত বিখ্যাত, আমরা কি আজ অজান্তে তাঁরই বাড়িতে, তাঁরই শয়নগৃহে এসে পড়েছি? একেবারে বাঘের মুখে! ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে ভয়ে আমার মূর্ছার উপক্রম হল!

ওদিকে বাহির থেকে ঘরের দরজার ধাক্কা পড়তে লাগল এবং সেই সঙ্গে চিৎকার শোনা গেল—'চোর, চোর! দাদা তোমার ঘরে চোর ঢুকেছে!'

এ আবার কী হল,—চোরের খোঁজে এসে নিজেরাই চোর বলে ধরা পড়ব নাকি?

হেডপণ্ডিত শুধোলেন—কে রে? প্রেমলাল না? আরে, বিধুভূষণও যে! ব্যাপার কী হে, তোমার হাতে রিভলভারের মতন ওটা আবার কী? তোমরা স্বদেশি ডাকাত হয়েছ নাকি?'

ধন্য বিধু, তখনই সে উপস্থিত বুদ্ধি হারাতে রাজি হল না, সে মুখে হাসি আনবার মিথ্যা চেষ্টা করে বললে, 'আজ্ঞে না স্যার, আমরা স্বদেশি ডাকাত নই—আমরা হচ্ছি প্রাইভেট ডিটেকটিভ!'

—'প্রাইভেট ডিটেকটিভ? বটে, বটে! তাই রাত বারোটার সময়ে চোরের মতো ঢুকেছ আমার বাড়িতে? ওদিকে তাড়া খেয়ে পালিয়ে এসেছ আমার ঘরে? আমাকে ন্যাকা পেয়েছ, না? আচ্ছা দাঁড়াও!'—পণ্ডিতমশাই খাট থেকে লাফিয়ে পড়ে বেগে তেড়ে এসে বিধু ডিটেকটিভের মাথায় 'ধঠাৎ' করে বসিয়ে দিলেন তাঁর প্রসিদ্ধ খোট্টাই গাঁট্টা!

ইতিমধ্যে আমার ভীত ও ব্যস্ত চোখে পড়ল, ঘরের একটা জানলায় একটা গরাদে নেই! পণ্ডিতমশাইয়ের দ্বিতীয় গাঁট্টা বিধুর মাথায় অবতীর্ণ হবার আগেই

সেই ভাঙা জানলা দিয়ে আমি রাস্তায় ঝাঁপ খেলুম। হাতে-পায়ে যথেষ্ট চোট লাগল বটে, কিন্তু সুবিখ্যাত খোট্টাই-গাঁট্টার তুলনায় সে-সব আঘাত কিছুই নয়।

॥ চ ॥

পরদিন সকালে বিধু ম্লানমুখে এসে দেখালে, গাঁট্টার চোটে তার মাথার এগারো জায়গা ফুলে ঢিবি হয়ে উঠেছে।

খোট্টাই-গাঁট্টার কীর্তি-দর্শন যখন শেষ হল, বিধু অভিমান ভরে বললে, 'ওয়াটসন, তুমি যে এমন কাপুরুষ আমি তা জানতুম না! আমাকে যমের মুখে ফেলে অনায়াসে চম্পট দিলে?'

দুঃখিত স্বরে বললুম, 'পালিয়ে আর এলুম কোথায় ভাই, যমের মুখ থেকে কি পালিয়ে আসা যায়? ইস্কুলে গেলেই টের পাবে, খোট্টাই-গাঁট্টা আমারও জন্যে বিপুল বিক্রমে অপেক্ষা করছে!'

বিধু মাথা নেড়ে বললে, 'না, তোমার আর ভয় নেই! তুমি হচ্ছ মাত্র ওয়াটসন আর আমি হচ্ছি বাংলার শার্লক হোমস—তোমার চেয়ে ঢের বড়ো, আর বড়ো গাছই ঝড়ে পড়ে!'

বিধুর জাঁক আজ আর ভালো লাগল না। বিরক্ত ভাবে বললুম, 'তার মানে?'

বিধু বললে, 'সমস্ত ঝড় আমার মাথার উপর দিয়েই বয়ে গেছে, তোমার আর কোনো ভয় নেই।'

—'তাই নাকি, গাঁট্টা-বৃষ্টি যখন থামল তুমি তখন কী করলে?'

—'আমি পণ্ডিতমশাইকে সব কথা খুলে বললুম। শুনে তিনি পাঁচ মিনিট ধরে হো হো করে হেসে বললেন—'এ সব কথা জানলে আমি তোমাকে এত জোরে অতগুলো গাঁট্টা মারতুম না!' তাঁর ঘরে রসগোল্লা ছিল, আমাকে মিষ্টিমুখ করিয়ে তবে ছেড়ে দিলেন।'

—'আমরা যার পিছু নিয়েছিলুম, সে লোকটা কে?'

—'পণ্ডিতমশায়ের ভাই। আমাদের বড়োই ভুল হয়ে গেছে, আবার দেখছি গোড়া থেকে তদন্ত আরম্ভ করতে হবে! ডিটেকটিভের পঞ্চম কর্তব্য হচ্ছে—'

বাধা দিয়ে বললুম, 'তোমার ও ডিটেকটিভের কর্তব্যের তালিকা রেখে দাও! মানুষের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য হচ্ছে, নিজের প্রাণ বাঁচানো। আমি আর তোমার দলে নেই।'

—'সে কী ওয়াটসন?'

—'কে ওয়াটসন? আমার নাম প্রেমলাল মিত্র। নিজের নাম আর কখনো আমি ভুলব না!'

একদিনের অ্যাডভেঞ্চার

(সত্য ঘটনা)

অনেকদিন আগেকার কথা। আমি তখন কুচবিহারে, মেসোমশাইয়ের কাছে। আমার বয়স তখন অল্প, কিন্তু তখন থেকেই দেখতে শুরু করেছি অ্যাডভেঞ্চারের স্বপ্ন।

আমার মেসোমশাই ছিলেন স্বর্গীয় ধর্ম-সংস্কারক মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের ভাগিনেয়। তিনি কুচবিহারের রাজকর্মচারী ছিলেন। ভালো শিকারি বলে তাঁর নামডাক ছিল যথেষ্ট। প্রায় প্রতি বৎসরেই কুচবিহারের মহারাজার সঙ্গে তিনি শিকারে যাত্রা করতেন।

এখনকার কুচবিহার শহরের কথা বলতে পারি না, কিন্তু তখনকার শহরের আশেপাশে চিতাবাঘের অত্যাচারের কথা শোনা যেত প্রায়ই। সাধারণত তারা গৃহপালিত জীবজন্তুদের উপরেই হানা দিত বটে, কিন্তু সময়ে সময়ে বাগে পেলে নরহত্যা করতেও ছাড়ত না।

মেসোমশাই মাঝে মাঝে বন্দুক কাঁধে করে বেরিয়ে যেতেন এবং প্রতি বারেই ফিরে আসতেন একটা মরা চিতাবাঘ নিয়ে। দেখে-শুনে আমার ধারণা হল, বাঘ শিকার করা হচ্ছে একটা ভারী সহজ ব্যাপার। বন্দুক ছোড়ার অভ্যাস থাকলে যে কোনো লোক বাঘ মারতে পারে।

মাঝে মাঝে আমিও মেসোমশাইয়ের পাখি-মারা বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়তুম এবং শহরের বাইরে গিয়ে পক্ষী-রাজ্যের মধ্যে করতুম দারুণ বিভীষিকার সৃষ্টি। প্রথম শিকারির মতন নিষ্ঠুর জীব বোধ হয় আর নেই—কারণ জীবহত্যার আনন্দ তাকে যেন একেবারে পেয়ে বসে। নতুন বন্দুক ছুড়তে শিখে আমিও কোনো পাখিকেই রেহাই দিতুম না। তা সে শকুনিই হোক আর কাক-বক-চিলই হোক!

পক্ষী শিকারে আমার সঙ্গে থাকত কুচবিহারের বাসিন্দা একটি ছেলে। এতদিন পরে নামটি আমার মনে পড়ছে না, সুতরাং তাকে প্রশান্ত বলেই ডাকব।

প্রশান্ত ছিল অতি-ওস্তাদ ছেলে। কোনো কাকই সবচেয়ে উঁচু ডালে বাসা বেঁধেও তার হাত থেকে রেহাই পেত না, প্রশান্ত গাছে চড়ে ঘুড়ির সুতোয় মাঞ্জা দেবে বলে কাকের ডিম চুরি করবেই। কোনো গৃহস্থই দুরারোহ পাঁচিল দিয়েও

তার কবল থেকে বাগানের পাকা ফল রক্ষা করতে পারত না। প্রতিমাসে অন্তত দিন-পনেরো সে ইস্কুল থেকে পালিয়ে পথে-বিপথে টো টো করে ঘুরে বেড়াত, অথচ বাৎসরিক পরীক্ষায় সে নাকি নম্বর পেত সবচেয়ে বেশি!

প্রশান্তের শিকারের শখ ষোলোআনা, কিন্তু বন্দুক ছিল না। এ অভাব সে কতকটা পূরণ করে নিলে ধনুকধারী হয়ে। বাঁখারি ও কঞ্চি দিয়ে স্বহস্তে তৈরি করে নিলে ধনুক ও বাণ।

তার অস্ত্র দেখে আমি হেসে ফেললুম।

প্রশান্ত বললে, 'হেসো না হে ভায়া, হেসো না! তির-ধনুক বড়ো ফ্যালনা নয়! ত্রেতায় রামচন্দ্র আর দ্বাপরে অর্জুন এই তির-ধনুকের জোরেই মহাবীর হতে পেরেছিলেন, বুঝেছ?'

আমি বললুম, 'কিন্তু রাম আর অর্জুন কলিকালে জন্মালে তাঁদের বীরত্বকে লুপ্ত করবার জন্যে দরকার হত মাত্র একটি দোনলা বন্দুক!'

প্রশান্ত মাথা নেড়ে বললে, 'না হে, না! আমি কেতাবে পড়েছি, সেকালেও বন্দুক ছিল, নাম তার নালিকাস্ত্র। কিন্তু রাম আর অর্জুন তারও চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন ধনুক-বাণকে।'

আমি বললুম, 'বেশ, তাহলে পরীক্ষা করে দেখা যাক শ্রেষ্ঠ কে? তোমার ধনুক, না আমার বন্দুক?'

পরীক্ষা প্রায়ই হত। সব সময়ে আমার বন্দুক যে জিতত এমন কথা বলতে পারি না, কারণ লক্ষ্যভেদ করবার ক্ষমতা আমার চেয়ে প্রশান্তেরই ছিল বেশি।

তার সঙ্গে একদিন পাখি-শিকারে বেরিয়েছি। ঠান্ডা শীতে তপ্ত রোদের ছোঁয়া পেয়ে চারিদিকের শ্যামলতার ভিতর দিয়ে লীলায়িত হয়ে যাচ্ছে যেন পুলকের হিল্লোল। এ-গাছ ও-গাছ থেকে কাকের দল আমাদের দুই মূর্তিকে দেখেই কা কা রবে নিরাপদ ব্যবধানে উড়ে পালাতে লাগল। কাকদের সমাজে আমরা বোধ হয় 'হত্যাকারী' বলে মার্কামারা হয়ে গিয়েছিলুম।

কুচবিহার শহরের উপকণ্ঠে একটি বদ্ধ নদী আছে। আমরা প্রায়ই তার তীরে তীরে পাখির খোঁজে ঘুরে ঘুরে বেড়াতুম। সেদিনও সেখানে গিয়ে দেখি স্রোতহীন নদীর জলে সাঁতার কাটছে একটি ধবধবে রাজহাঁস।

প্রশান্ত বললে, 'ভাই, তুমি বন্দুক ছুড়ো না। আমি আজ রাজহংস শিকার করব।'

আমি বললুম, 'হাঁসটা যদি কারুর পোষা হয়?'

প্রশান্ত বললে, 'সেইজন্যেই তোমাকে বন্দুক ছুড়ে শব্দ করতে মানা করছি। আমার ধনুক কেমন নীরবে কার্যোদ্ধার করে দ্যাখো।' বলেই সে বাগিয়ে ধরলে ধনুক।

ধনুক নীরবেই বাণ ত্যাগ করলে বটে, কিন্তু পরমুহূর্তেই নদীর ওপার থেকে বিষম চিৎকার করে কেঁদে উঠল একটা দিগম্বর ছেলে!

ধনুকের বাণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে বিদ্ধ করেছে সেই ছেলেটার একখানা হাতকে।

আমি বললুম, 'সর্বনাশ, করলে কী প্রশান্ত?'

প্রশান্ত বললে, 'যা হবার হয়ে গেছে, আর কোনো উপায় নেই। এখন তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে সরে পড়ি এসো!'

আমি দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বললুম, 'কিন্তু আমাদের কি এখন ওই ছেলেটারই কাছে যাওয়া উচিত নয়?'

আমার হাত ধরে টানতে টানতে প্রশান্ত বললে, 'পাগল? মানুষ-শিকারের অপরাধে জেলে যেতে চাও নাকি?'

আমরা দ্রুতপদে মাঠের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হতে লাগলুম। খানিক দূর এগিয়ে গিয়েই পিছনে শুনলুম মহা কোলাহল।

ফিরে দেখি, বিশ-পঁচিশ জন লোক বেগে ছুটে আসছে আমাদের দিকে। তাদের অনেকের হাতে রয়েছে বড়ো বড়ো লাঠি।

প্রশান্ত দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, 'ওদের মাথার ওপর দিয়ে একবার কি দু-বার বন্দুক ছোড়ো তো! বন্দুকের ধমক শুনলে ওরা আর পালাবার পথ পাবে না!'

আমি বললুম, 'মাপ করতে হল! শেষটা টিপ ফসকে যদি কারুর গায়ে গুলি লাগে? তুমি কি আমাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাতে চাও?'

—'কিন্তু ওরা আমাদের ধরতে পারলে কী-রকম আদর করবে জানো?'

—'জানি। কিন্তু ওরা আমাদের ধরতে পারবে কেন? মারো দৌড়!'

মারলুম দৌড়। যে সে দৌড় নয়, যাকে বলে রীতিমতো ভোঁ দৌড়! অত জোরে যে দৌড়তে পারি আমি নিজেই তা জানতুম না! হোঁচট খাই, বেদম হই, চোখে অন্ধকার দেখি, তবু দৌড়, দৌড় আর দৌড়!

মাঠ পেরিয়ে পেলুম বন। বেপরোয়ার মতো ঢুকে পড়লুম বনের ভিতরে। বন ক্রমেই নিবিড়, পদে পদে বাধা, বড়ো বড়ো গাছের পর গাছ, কাঁটাজঙ্গল,

ঝোপঝাপ, আগাছায় ঢাকা টিপিঢাপা, পথের রেখা অদৃশ্য!

আর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব! দেহের শক্তিও গেল ফুরিয়ে! একটা মস্ত গাছের গুঁড়িতে ধাক্কা খেয়ে প্রশান্ত ধপাস করে বসে পড়ল, আমিও আসন নিলুম তার পাশে।

প্রশান্ত হাপরের মতো হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'এখন স্বয়ং যম এলেও আমাকে এখান থেকে এক পা নড়াতে পারবে না।'

আমি বললুম, 'আপাতত যম বা মানুষ কেউ এখানে আসবে বলে মনে হচ্ছে না। এসো, আগে প্রাণ ভরে হাঁপ ছেড়ে নি।'

হাঁপ ছাড়তে ছাড়তে করুণ চোখে দেখলুম, দেহের অবস্থা হয়েছে শোচনীয়। বারংবার ছোবল মেরে কাঁটা-ঝোপগুলো কেবল সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত করেই দেয়নি, জামা-কাপড়েরও অনেক অংশ টেনে ছিঁড়ে কেড়ে নিয়েছে এবং গাছে গাছে ধাক্কা ও উঁচু-নিচু জমিতে আছাড় খেয়ে দেহের সর্বত্র পড়েছে বড়ো বড়ো কালশিরা। প্রশান্তেরও অবস্থা আমারই মতো; উলটে তার নাকটা এমনভাবে ফুলে উঠেছে যে তাকে আর নাক বলে চেনবার কোনো উপায় নেই! আমার বন্দুকটা এখনও হাতছাড়া হয়নি, কিন্তু প্রশান্তের ধনুক-বাণ আর তার কাছে নেই।

সেই দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই সে ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠল, 'চুলোয় যাক ধনুক-বাণ! ওই অলক্ষুনে ধনুক-বাণের জন্যেই তো আজ আমাদের এই দুর্দশা! আর কখনো ধনুক ধরব না!'

ঠিক সেই সময়েই আর এক কাণ্ড। খানিক তফাতে জঙ্গল হঠাৎ নড়ে উঠল এবং তার পরেই একটা ঝোপ সরিয়ে বেরিয়ে এল এক চিতাবাঘ!

আমরা একেবারে আড়ষ্ট!

বাঘটাও আমাদের দেখে দস্তুরমতো চমকে উঠল এবং পরমুহূর্তেই বিদ্যুৎ বেগে লম্বা এক লাফ মেরে পাশের একটা বড়ো ঝোপের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল!

আমি কম্পিত স্বরে বললুম, বন্ধু!'

—'উঁ!'

—'এখানে যম আসেনি বটে, কিন্তু যমদূত এসেছে!'

—'হুঁ।'

—'এখন কী করি?'

—'বন্দুক ধরো।'

—'পাখি মারা বন্দুক?'

—'তাও মন্দের ভালো। বন্দুকটা ছোড়ো, বাঘের পিলে ভয়ে চমকে যেতেও পারে।'

কিন্তু তারপরেই পিলে চমকে গেল আমাদেরই! আচম্বিতে আকাশ, বাতাস, জঙ্গল ও আমাদের বুকের ভিতরটা পর্যন্ত কাঁপিয়ে জেগে উঠল বাঘের গর্জনের পর গর্জন! সামনের বড়ো ঝোপটার এধার থেকে ওধার পর্যন্ত যেন বিষম যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল!

আমরা একেবারে স্তম্ভিত ও হতভম্ব! প্রশান্তের কথায় বন্দুকটা বাগিয়ে ধরেছিলুম, কিন্তু অবশ হাত থেকে খসে বন্দুক পড়ে গেল মাটির ওপরে!

তারপরেই সভয়ে দেখলুম, বাঘটা আবার ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল এবং একটা হলদে রঙের মূর্তিমান ঝড়ের মতো ছুটে আসতে লাগল আমাদেরই দিকে!

দারুণ আতঙ্কে দাঁড়িয়ে উঠে লাফ মেরে মাথার উপরকার গাছের ডাল ধরে ঝুলে পড়লুম এবং তারপর কোনো-গতিকে দুই হাত ও দুই পায়ের সাহায্যে উঠে বসলুম ডালের উপরে।

বিস্ফারিত চক্ষে চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখলুম। বাঘটা আবার অদৃশ্য হয়েছে এবং পাশের একটা ডাল ধরে ঝুলতে ঝুলতে বারংবার দুই পা ছুড়ছে প্রশান্ত।

শুকনো গলায় বললুম, 'শান্ত হও প্রশান্ত, বাঘ আর নেই।'

প্রশান্ত আমারই মতো হাত ও পায়ের সাহায্যে তার ডালের উপরে উঠে বসল। তার মুখ তখন রক্তহীন।

বললুম,—'ব্যাপারটা কিছুই বোঝা গেল না। বাঘটা—'

প্রশান্তের চোখদুটো আবার চমকে হয়ে উঠল ছানাবড়ার মতো। তার দৃষ্টির অনুসরণ করে আমার চোখও দেখলে আবার এক দৃশ্য!

বাঘটা এইমাত্র যে ঝোপ ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল, তার ভিতর থেকে আত্মপ্রকাশ করেছে একটা মস্ত বড়ো মোটাসোটা বন্য বরাহ, তার মুখ ও গা রক্তাক্ত এবং পড়ন্ত রোদে চকচক করছে তার দুটো বড়ো বড়ো নিষ্ঠুর দাঁত!

বরাহটা একবার সগর্বে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করলে। তারপর পিছনের পা দুটো মাটির উপর বার কয়েক ঠুকে ধুলো উড়িয়ে ছুটে চলে গেল একদিকে।

প্রশান্ত বললে, 'এতক্ষণে ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে। বাঘটা আমাদের দেখে

বিরক্ত হয়ে ওই ঝোপটার ভিতরে গিয়ে ঢুকেছিল। ওখানে গিয়ে দেখে তার জন্যে অপেক্ষা করছে বরাহ অবতার। তারপরেই শুরু ঝটাপটি। বরাহের দাঁতের খোঁচা খেয়ে ব্যাঘ্রের পলায়ন। বিজয়ী বরাহের আবির্ভাব আর অন্তর্ধান!'

—'সবই তো বুঝলুম। কিন্তু দেখতে পাচ্ছ বেলা আর বেশি নেই?'

—'দেখতে পাচ্ছি।'

—'এইবারে কি আমাদের ডাল ছেড়ে আবার ভূমিষ্ঠ হওয়া উচিত নয়?'

—'পাগল?'

—'মানে?'

—'এইবারে আমি আরও উঁচু ডালে গিয়ে উঠব।'

—'তারপর?'

—'তারপর আসুক সন্ধ্যা, আসুক রাত্রি, আসুক অন্ধকার, আমি আজ আর ভূতলে অবতীর্ণ হচ্ছি না।'

—'কী খাবে?'

—'বাতাস।'

প্রশান্তের পরামর্শই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হল।

সারারাত কেমন করে কাটল এবং পরের দিন বাসায় ফিরে এসে মেসোমশাই ও মাসিমার কাছে যে অভ্যর্থনা লাভ করলুম সে সব কথা আর কাগজে কলমে প্রচার করে লাভ নেই।

মেসোমশাই আমার হাত থেকে বন্দুকটি কেড়ে নিয়ে লুকিয়ে রাখলেন এবং প্রশান্তও আর কোনোদিন ধনুক ধারণ করেছে বলে সন্দেহ হয় না।

গল্প

শয়তান

॥ ১ ॥

পৃথিবীতে আশ্চর্য ঘটনা ঘটে অনেক, কিন্তু সে-সব ঘটনায় বিশ্বাস করে এমন লোক অনেক পাওয়া যায় না।

আমার জীবনেও একবার একটা ঘটনা ঘটেছিল, তা শুধু আশ্চর্য নয় অত্যাশ্চর্যও বটে। তোমাদের কাছে সেই কথাই আজ বলব, বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়, বিশ্বাস করো! বিশ্বাস না করলেও দুঃখিত হব না।

সরকারি কাজে আমি তখন হাজারিবাগ অঞ্চলের এক জায়গায় থাকি। একটা মানুষখেকো বাঘের অত্যাচারে সেখানকার লোকেরা পরিত্রাহি ডাক ছাড়ছিল। বারে বারে দেশি-বিলাতি বহু শিকারির গুলি হজম করে সে বেঁচে আছে। লোকে বলে, সে বাঘটা নাকি সাধারণ বাঘ নয়—বাঘের আকারে হিংস্র অপদেবতা! কেউ কেউ নাকি চোখের সামনে তাকে হাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে যেতে দেখেছে! তাকে মানুষের ভাষায় কথা কইতে শুনেছে, এমন লোকেরও অভাব নেই! বনের ভিতরে বসে সে নাকি মেয়েমানুষের মতন আর্তনাদ করত। তার সেই কান্নাকে মানুষের কান্না ভেবে যে বনের ভিতর ঢুকত, সে আর ফিরে আসত না! লোকে তাই তাকে 'শয়তান' বলে ডাকত! 'শয়তান'কে দেখলেই চেনা যেত, কারণ তার ল্যাজ ছিল না! হয়তো বনের ভিতরে অন্য কোনো জন্তুর সঙ্গে লড়াই করতে গিয়েই ল্যাজের গৌরব থেকে সে বঞ্চিত হয়েছিল। কিন্তু লোকের বিশ্বাস, 'শয়তানে'র এই লাঙ্গুলহীনতাই তার অলৌকিকতার মস্ত প্রমাণ। বাঘের ল্যাজ নেই, তাও কখনো সম্ভব?

এ-সব গল্প যে মিথ্যে তাতে আর ভুল নেই। মানুষখেকো বাঘেরা প্রায়ই ভারী চালাক হয়। বড়ো বড়ো শিকারিও তাদের বধ করতে পারে না। তাই তাদের নামে এমনই সব গল্প শোনা যায়। বৃক্ষ-বিশেষের আশ্চর্য শিকড়ের গুণে মানুষ বাঘের রূপ ধরতে পারে, এমন গল্পও শুনেছি। কিন্তু আধুনিক যুগে নিতান্ত মূর্খ ভিন্ন আর কেউ এ-সব গল্প বিশ্বাস করবে না।

'শয়তান' যে সাধারণ বাঘ একদিন তার প্রমাণ পেলুম।

বন্ধু হরিশের সঙ্গে একদিন সন্ধ্যার আগে হরিণ মেরে ফিরে আসছি। আমাদের পিছনে পিছনে আসছিল মরা হরিণটাকে কাঁধে করে দুজন কুলি, আর বাঘের মতোই বড়ো আমার শখের কুকুর 'টাইগার'। বনের একটা মোড় ফিরতেই সামনে দেখি, পথের উপরে বিড়ালের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে আছে, মস্ত বড়ো একটা বাঘ! তার ল্যাজ নেই!

পিছনের কুলিরা রুদ্ধশ্বাসে, অস্ফুট স্বরে এক সঙ্গে বলে উঠল—'শয়তান!'

পরমুহূর্তেই আমরা দুজনেই এক সঙ্গে বন্দুক ছুড়লুম।

'শয়তান' লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেই আবার পড়ে গেল,—আর নড়ল না!

এত সহজে 'শয়তান'কে ঘায়েল করে আমাদের আনন্দের আর সীমা রইল না—কুলি দুজনও মনের খুশিতে ধেই ধেই নাচ শুরু করে দিলে! আশপাশের গাঁয়ে সে খবর তখনই ছড়িয়ে পড়ল—দলে দলে লোক 'শয়তান'কে দেখতে এল। অনেকে তার মৃতদেহের উপরে কিল-চড় লাথি বৃষ্টি করে মনের ঝাল ঝেড়ে নিলে। অনেক কষ্টে তাদের থামিয়ে জনকয়েক কুলির সাহায্যে 'শয়তানে'র দেহ তুলে আবার নিজেদের বাসার দিকে রওনা হলুম।

॥ ২ ॥

খানিক দূর যেতেই, বিরাট এক ক্রুদ্ধ দৈত্যের মতো সারা আকাশ জুড়ে একখানা মিশেমিশে কালো মেঘ ছুটে এল—ভীষণ ঝোড়ো নিশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে! শহরে বসে তোমরা এই মেঠো বুনো ঝড়ের কল্পনাও করতে পারবে না।

দেখতে দেখতে পরেশনাথ পর্বতের আকাশভেদী চূড়া ধুলো-মেঘের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল, বনের গাছগুলো পাগলের মতো মাটির উপরে বারবার মাথা কোটবার চেষ্টা করতে লাগল, আর যেন কার বিপুল ফুৎকারে সারা-পৃথিবীর আলো কাঁপতে কাঁপতে নিবে গেল! খানিক তফাতেই একখানা পুরানো বাংলো ছিল, আমরা তাড়াতাড়ি তার ভিতরে গিয়ে আশ্রয় নিলুম। ঝড়ের পর এল বৃষ্টি সন্ধ্যার অন্ধকারকে সঙ্গে করে।

বুঝলুম, আজ আর বাসায় ফেরা হবে না। কারণ এখান থেকে আমার বাসা অন্তত পাঁচ মাইল তফাতে। মাঝে আবার নদী আছে। সেই পাহাড়ে-নদী বৃষ্টিধারায় পুষ্ট হয়ে এতক্ষণে দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে নিশ্চয়!

কুলিরাও চলে যেতে চাইলে—বকশিশের লোভও গ্রাহ্য করলে না।

তারা দুটো কারণ দেখালে। প্রথমত, 'শয়তানে'র মৃতদেহের সঙ্গে তারা রাত্রিবাস করতে নারাজ। দ্বিতীয়ত, এই বাংলোয় আগে এক সাহেব থাকত। কারা নাকি তাকে খুন করেছিল। সেই থেকেই এই বাংলোয় কোনো মানুষ বাস করতে পারে না। সেই বৃষ্টিতেই কুলিরা বাংলো ছেড়ে পালাল।

শিকারি মানুষ, সব রকম বিপদের জন্যেই সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হয়—সঙ্গে লণ্ঠন এনেছিলুম, তাই জ্বালালুম। ব্যাগের ভিতরে তখনও কয়েক টুকরো পাউরুটি আর খানিকটা 'গোয়াভা জেলি' ছিল, তার দ্বারাই আমার, হরিশের আর 'টাইগারে'র

নৈশ-আহার শেষ করতে হবে। উপায় কী? আমরা যে খোলা মাঠে নেই, এখন এইটুকুই পরম সান্ত্বনার কথা।

মাঝের হলঘরে আমরা আশ্রয় নিয়েছিলুম। ঘরখানা প্রকাণ্ড—দেয়ালে দেয়ালে উইদের রাজত্ব, সমস্ত দরজা-জানলাই ভাঙা, মেঝেতে পুরু ধুলোর প্রলেপ—তার উপরে নানা জীবজন্তুর পায়ের দাগ—বাঘের, ভাল্লুকের, শেয়াল-কুকুরের! এখানে-ওখানে হাড় পড়ে আছে—কোনো কোনো হাড় মানুষের বলেও সন্দেহ হল। বুঝলুম, মানুষের বাড়ি আজ বাঘ-ভাল্লুকের আস্তানায় পরিণত হয়েছে! বললুম, 'হরিশ, এখানে আমরা নিরাপদ নই! বাঘ-ভাল্লুকের সঙ্গে আবার দেখা হতে পারে, বন্দুকে টোটা ভরে তৈরি হয়ে থাকো।'

হরিশ আমার কথামতো কাজ করতে করতে বললে, 'আজ রাত্রে দেখছি ঘুমের দফা রফা!'

'শয়তান' আর হরিণের দেহ দুটো ঘরের কোণে টেনে এনে রাখলুম।

॥ ৩ ॥

আকাশের অন্ধকারকে ছ্যাঁদা করে জলধারা অশ্রান্তভাবে গড়িয়ে পড়ছে পৃথিবীর বুকের উপর। বিদ্যুৎ-সাপগুলো কিলবিল করে ক্রমাগত চলে যাচ্ছে শূন্যতার এধার থেকে ওধারে। বৃষ্টি-বাণে আহত অরণ্যের কান্নায় চারিদিক পরিপূর্ণ।

'টাইগার' এই পোড়োবাড়ির ভাঙা ঘর মোটেই পছন্দ করলে না। ঘরময় ছড়ানো হাড়গুলো সে আগে শুঁকে শুঁকে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলে। তারপর উপরদিকে মুখ তুলে কীসের ঘ্রাণ নিতে লাগল—যেন সে কোনো অদৃশ্য বিভীষিকার সন্ধান পেয়েছে! 'টাইগার' সাহসী কুকুর, বাঘ দেখলেও ডরায় না। কিন্তু সে আজ অত্যন্ত ভয়ে অস্থির হয়ে উঠল,—পেটের তলায় ল্যাজ ঢুকিয়ে একবার এখানে, একবার ওখানে গিয়ে বসে পড়ে, আবার উঠে কান খাড়া করে যেন কার পদশব্দ শোনে! আমি তাকে ডাকলুম, সে কিছুতেই কাছে এল না। থেকে থেকে চমকে ওঠে আর হা হা করে হাঁপায়। হরিশ আশ্চর্য হয়ে বললে, 'টাইগার এমন করছে কেন? সে কী দেখেছে?'

আমারও মনে ওই একই প্রশ্ন! ...চারিদিকে তাকিয়েও সন্দেহজনক কিছুই দেখতে পেলুম না। বলেছি—মস্ত ঘর। আমার এই ছোটো লণ্ঠনের আলোতে সে ঘরের অন্ধকার দূর হয়নি। হঠাৎ মনে হল, দেয়ালের উপর দিয়ে যেন একটা

লম্বা ছায়া দুলতে দুলতে সরে যাচ্ছে...হরিশের একখানা হাত চেপে ধরে বললুম, 'দ্যাখো, দ্যাখো!'

টাইগার ঊর্ধ্বমুখে অস্বাভাবিক, তীক্ষ্ণ, শিয়ালের মতো স্বরে কাঁদতে লাগল।

হরিশ বললে, 'কী? কী দেখব?'

—'ওই ছায়াটা?'

—'কোথায়?'

—'ওই যে! দেয়ালের উপর দুলছে!'

—'তুমিও পাগল হলে নাকি? ওখানে তো কিছুই নেই!'

চোখ রগড়ে চেয়ে আমিও আর কিছু দেখতে পেলুম না। নিজের ভ্রম বুঝে লজ্জায় চুপ করে রইলুম।

বাইরের বনের ভিতর থেকে একটা বাঘ ক্রমাগত গর্জন করতে লাগল। হয়তো 'শয়তানে'র বউ! বনে বনে স্বামীকে খুঁজে খুঁজে ডেকে ডেকে বেড়াচ্ছে!...গর্জনটা ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে গেল! হঠাৎ মনে হল আমার কানে কানে কে যেন কথা কইলে! রোমাঞ্চিত দেহে আমি হরিশের কাছ ঘেঁষে সরে বসলুম! আমার মুখের ভাব দেখে হরিশ বললে, 'আবার কী হল?'

—'কে আমার কানে কানে কথা কইলে!'

—'সুরেন, তোমার মাথা বোধহয় খারাপ হয়ে গেছে! তুমি যে এমন ভিতু তা জানতুম না!'

তার ধিক্কার শুনে মনটাকে আবার শক্ত আর চাঙ্গা করে তোলবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু কেন জানি না, বুকের ছমছমানি কিছুতেই আজ থামতে চাইলে না। খালি মনে হয়, আমার চারিপাশ দিয়ে আজ সেই সব পা চলে বেড়াচ্ছে, যে সব পা চললে কোনো শব্দ হয় না! আমার চারিপাশে সব অদৃশ্য চোখ! আমরা তাদের দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু তারা আমাদের দেখতে পাচ্ছে! কী অসোয়াস্তি! ওদের চোখ এড়াই কেমন করে? বললুম, 'হরিশ, এ বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি চলো! এখানে আর কিছুক্ষণ থাকলেই আমি সত্যি সত্যি পাগল হয়ে যাব!'

হরিশ বললে, 'কুলিদের বাজে কথা তোমার মনের উপরে কাজ করছে! তুমি শান্ত হও। এ রকম পোড়োবাড়িতে এলে অকারণেই গা একটু ছমছম করে বটে, কিন্তু ও কিছু নয়।'

—'কিন্তু টাইগারও অমন কাতরাচ্ছে কেন? সে তো কুলিদের কথা বোঝেনি!'

—'টাইগার হচ্ছে অবোধ জন্তু, মিছামিছি ভয় পেয়েছে। সে ভয় পেয়েছে বলে তুমিও ভয় পাবে? তুমি যে মানুষ!'

॥ ৪ ॥

এবারে সত্যি সত্যিই ঘরের বাইরেকার দালানে দ্রুত পদশব্দ হল! শব্দটা একটা দরজার কাছে এসে, আবার দূরে চলে গেল। হরিশ বললে, কোনো জন্তুর পায়ের শব্দ। আমার মনে হল, কোনো জন্তুর পায়ের শব্দ নয়! জীবনে আমার মনের ভিতরে এমন অলৌকিক ভাবের উদয় হয়নি। ভাগ্যে সঙ্গে হরিশ আছে, নইলে আমার অবস্থা কী হত কে তা বলতে পারে? হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলুম, রাত বারোটা। হরিশ খাবারের 'বাস্কেট' বার করে বললে, 'অনেক রাত হয়েছে। এসো, এইবারে আমরা খেয়ে নি।'

আমি বললুম, 'তুমি একলা খাও। আজ আমার খিদে নেই।'

ঠিক সেই সময়ে, খুব কাছেই আবার বাঘের ঘন ঘন চিৎকার শুরু হল। 'শয়তানে'র সঙ্গিনী কি খোঁজ পেয়েই এখানে এসে হাজির হয়েছে?

হরিশ বললে, 'বন্দুক নাও! বাঘটা ভেতরে আসতে পারে!'

খুব দীর্ঘ, করুণ ও অস্বাভাবিক এক চিৎকার করে বাঘের ডাক থামল—সঙ্গে সঙ্গে ভাঙা জানলা দিয়ে ঝটপট করে ঘরের ভিতরে কালো কুচকুচে কী একটা ঢুকে পড়ল! হরিশ বললে, 'বাদুড়!'

তারপরেই দরজার চৌকাঠের উপরে এসে দাঁড়াল, মস্ত বড়ো একটা কালো কুৎসিত বিড়াল! বাদুড়টা ঘরের চারিদিকে চক্রাকারে উড়তে লাগল আর কালো বিড়ালটা ল্যাজ তুলে ডাকতে লাগল, ম্যাও! ম্যাও! ম্যাও! ম্যাও! ম্যাও!

বাদুড়টা হঠাৎ গোঁত্তা খেয়ে 'শয়তানে'র মৃতদেহের উপরে গিয়ে পড়ল, তারপর দুই ডানা বিস্তার করে সেইখানেই স্থির হয়ে রইল—একটা মূর্তিমান অভিশাপের মতো!

টাইগার আবার দাঁড়িয়ে উঠল এবং ভয়ানক এক আর্তনাদ করে আমার পায়ের কাছে ছুটে এসে পড়ে গেল। কাঁপতে কাঁপতে তার গায়ে হাত দিয়ে দেখি, সে মরে গেছে!

হরিশ সবিস্ময়ে বললে, 'সুরেন! দ্যাখো, দ্যাখো!'

ওঃ! কী সে দৃশ্য! যাকে আমরা স্বহস্তে গুলি করে মেরেছি,—যার মৃতদেহ এতগুলো কুলি কাঁধে করে এনেছে,—যে মরে এতক্ষণে একেবারে কাঠ হয়ে গিয়েছিল, সেই 'শয়তান' এখন আমাদের চোখের সামনেই চার পায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—আর, তার দুটো চক্ষু আগুনের দুটো গোলার মতন দাউ দাউ করে জ্বলছে আর জ্বলছে! সে চোখটা যেন আমাদের ভস্মসাৎ করে দিতে চায়! বাইরে আবার বাঘ ডাকতে লাগল। 'শয়তান' ধীরে ধীরে ঘরের

ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল। সেই বাদুড় আর কালো বিড়ালকেও আর দেখতে পেলুম না!

চিৎকার করে আমি মাটির উপরে পড়ে গেলুম।

॥ ৫ ॥

সেই সপ্তাহেই দরখাস্ত করে অন্য দেশে বদলি হয়েছি—পাছে 'শয়তানে'র সঙ্গে আবার দেখা হয়!

হরিশের মতে, আমাদের বন্দুকের গুলিতে 'শয়তান' মরেনি, মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিল মাত্র। হতেও পারে। না হতেও পারে!

গঙ্গার বিভীষিকা

॥ ১ ॥

গঙ্গা! এ নামে ভারতের কোটি কোটি হিন্দুর মনে যে-ভাবের উদয় হয়, পৃথিবীর আর কোনো দেশের আর কোনো নদীর নাম শুনে আর কোনো জাতির মনে সে-ভাব জাগে না। ক্রিশ্চানদের জর্ডন নদীর মহিমাও গঙ্গা-মাহাত্ম্যের কাছে ম্লান হয়ে যায়।

মিসিসিপি, অ্যামাজন, সেন্ট-লরেন্স, ম্যাকেঞ্জি, লা প্লাটা, নাইল, কঙ্গো, অ্যামুর, ভোলগা প্রভৃতি পৃথিবীর আরও অনেক নদ-নদী গঙ্গার চেয়ে আকারে বড়ো হলেও সম্মানে বড়ো নয়। আদি-গঙ্গা তো সামান্য একটুখানি গঙ্গার খাল, কিন্তু নামের গুণে তারও আদর কত! অথচ আসলে গঙ্গা হয়েও বিভিন্ন নামে ডাকা হয় বলে অত বড়ো পদ্মানদীও এত বেশি পূজার ফুল আর ফলমূলের নৈবেদ্য পায় না। সত্যি, নামের গুণে অধমও তরে যায়!

গঙ্গাতীরে যারা বাস করবার সৌভাগ্য পায়, ভারতে অ-গঙ্গা দেশের লোকেরা তাদের ভাগ্যবান বলে মনে করে। গঙ্গাকে দেখলেই হিন্দুর প্রাণ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। কিন্তু সময়ে সময়ে এই গঙ্গার ধারে গেলেও মনে যে আনন্দের ভাব জাগে না, আপনারা কি তা বিশ্বাস করতে পারবেন?

আমি প্রায়ই ডায়মন্ড হারবারে যাই—গঙ্গার বিশাল রূপ দেখতে। হরিদ্বার, এলাহাবাদ, বিন্ধ্যাচল, বেনারস, চন্দননগর ও কলিকাতা প্রভৃতি আরও অনেক

জায়গা থেকে আমি গঙ্গার ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখেছি, কিন্তু ডায়মন্ড হারবারের গঙ্গার ভিতরে অন্য সব রূপ তলিয়ে যায়।

অপূর্ব তার বিশালতা—ভীষণ বললেও চলে! এ গঙ্গার তুলনা খুঁজলে সমুদ্রের কথাই মনে পড়ে! ডায়মন্ড হারবারকে পিছনে রেখে তীরে গিয়ে বসলে চোখে পড়ে কেবল আকাশের অ-সীমার তলায় ওপারের লুপ্তপ্রায় সামান্য তটরেখা এবং বিরাট এক উচ্ছ্বসিত ও তরঙ্গিত জলের জগৎ,—আর-একদিকে মুখ ফেরালে অনন্ত জলরাশির ভিতরে এতটুকু তটরেখাও আর দেখা যায় না।

অতুল, অপূর্ব, আশ্চর্য! কে বলবে এই গঙ্গাই হিমালয়ে হয়ে যায় এতটুকু নালার মতো!

এইখানে একদিন শেষ-রাতে আমি গঙ্গাকে দেখতে গিয়েছিলুম। ঠিক দেখতে গিয়েছিলুম বললেও ভুল বলা হয়, কারণ সে রাতে কালো আকাশে চাঁদের চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না। থমথম করছে নিশুত কালো রাত, তার অন্ধকার গর্ভে পৃথিবীর সমস্ত দৃশ্য যেন ফতুর হয়ে হারিয়ে গিয়েছে। দেখব আর কী,—কিছুই দেখা যায় না! পিছন ফিরলে শুধু নজরে আসে দূরে ডাকবাংলোর দ্বিতল থেকে ম্লান আলোকের একটুখানি শিখা মাত্র। এবং কানে আসে অনেক কিছুই। একটানা ঝিঁঝির কান্না, বাদুড়ের ডানার ঝটপট, প্যাঁচার কর্কশ ধমক, অন্ধকারে নিষ্পেষিত বনস্পতির দীর্ঘশ্বাস, শৃগালের দ্রুত পদধ্বনি, সুদূর থেকে কুকুরদের ভীত চিৎকার—এবং আরও অনেক স্পষ্ট-অস্পষ্ট অজানা শব্দের সঙ্গে বিশাল গঙ্গার বিরাট কোলাহল! মহাসাগরের কাছ থেকে গঙ্গা যেন তার বুকচাপা গর্ভযন্ত্রণার দিগ্বিদিকব্যাপী গম্ভীর চিৎকারকে এখানে চুরি করে এনেছে!

সে কোলাহল নিবিড় অন্ধতার ভিতর দিয়ে আমার প্রাণে অজ্ঞাত এক আতঙ্কের বার্তা বহন করে আনলে! আমার মনে হল পৃথিবী যেন আসন্ন মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে ক্রন্দন করছে! প্রলয়ের পূর্বমূহূর্তে নিখিল জীবের সৃষ্টিব্যাপী যে হাহাকার জেগে উঠবে, এ যেন তারই ধ্বনিময় ইঙ্গিত! বিশ্বের যত অবিচার, ব্যভিচার, দুর্ভিক্ষ, মড়ক, রোগ, শোক আর দারিদ্র্যের যন্ত্রণা যেন এখানে আর্তধ্বনির তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে বয়ে যাচ্ছে আর বয়ে যাচ্ছে!

চর্মচক্ষে শব্দের রূপ দেখা যায় না, কিন্তু মন দিয়ে তার প্রত্যেকটি রেখা অনুভব করা যায়। অদৃশ্য আকাশের আঁধারপটে অন্ধ শব্দের তিমির-তুলি কালোর উপরে কালো ছবি এঁকে চলেছে—বীভৎস সব শব্দময় দানব-মূর্তি ফুটে উঠছে! প্রত্যেক মূর্তিই কালবৈশাখীর আঁধির মতো, নিষ্ঠুর নিয়তির দুঃস্বপনের মতো পাকসাট খেয়ে হু-হু-হু-হু হাওয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে ইহলোক থেকে পরলোকে, পরলোক থেকে ইহলোকে আনাগোনা করছে,—প্রত্যেকেরই চক্ষে হিংসার হত্যা-

উল্লাস, প্রত্যেকেরই মুখে ক্ষুধিত বিকৃত ভঙ্গি, প্রত্যেকেরই হাবেভাবে জীবন্ত ধরণীর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড অভিযোগ!

বেশিক্ষণ সেদিন গঙ্গার কাছে বসে থাকতে পারিনি।

॥ ২ ॥

কলকাতায় রোজ সন্ধ্যার সময়ে গঙ্গার জলস্রোতের পাশে জনস্রোত বইতে থাকে।

পথে দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। এখানে-ওখানে দলে দলে লোক জটলা ও হল্লা করছে, দলে দলে চানাচুরওলা চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে কান কালা করে দিয়ে যাচ্ছে এবং ঘাটে ঘাটে 'কণ্ঠ'হীন নরগর্দভরা প্রাণপণে গান গাইবার মিথ্যে চেষ্টা করছে! এই শেষোক্ত শ্রেণির জীবরা হচ্ছে সবচেয়ে ভয়ংকর। বাগবাজার থেকে হাওড়ার পোল পর্যন্ত—কলকাতার গঙ্গাতীরের সর্বত্রই এদের ভয়াবহ অস্তিত্বের ধাক্কা সামলাতে সামলাতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। সারা শহরে গান গাইতে জানে না এমন যত বেসুরো বেতাল লোক আছে এবং বাড়িতে বসে গান গাইবার উপক্রম করলেই পাড়ার লোকেরা লাঠি নিয়ে যাদের কণ্ঠরোধ করবার চেষ্টা করে, তারা প্রত্যেকেই গঙ্গার ধারে পালিয়ে এসে তান ধরে লোকের সান্ধ্য-ভ্রমণকে বিষাক্ত করে তোলে। এদের জন্যে আলাদা আইন হওয়া উচিত।

এমনি সব নানান উপদ্রব থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে, আমি গঙ্গার ধারে বেড়াতে যাই রাত বারোটার পর। তখন গঙ্গাতীরের গাইয়েরা পর্যন্ত ঘুমোতে যায়—যদিও মাঝে মাঝে এক-একজন নাছোড়বান্দা গাইয়েকে আমি রাত বারোটার পরেও গঙ্গার ঘাটে আবিষ্কার করেছি!

চারিদিকে তখন জনতার সাড়া থাকে না। ওপারে দেখা যায় সার-বাঁধা, রাত-জাগা কল-কারখানার সুদীর্ঘ বৈদ্যুতিক আলোর মালা। মাঝে মাঝে যেখানে সে-মালা ছিঁড়ে গেছে সেখানে জেগে রয়েছে খানিকটা করে অন্ধকার। পূর্ণিমার চাঁদও সে-অন্ধকারকে মুছে দিতে পারে না। দিনের আলো ফুটলে বোঝা যায়, সে খণ্ড খণ্ড অন্ধকারগুলো নীল বন ছাড়া আর কিছু নয়।

এখানেও গভীর নিশীথে বসে বসে শুনি, গঙ্গা যা বলতে চায় তা আনন্দের রূপকথাও নয়, শান্তির বাণীও নয়। ও কলবেদনার গানে ছন্দে ছন্দে জাগে যেন সংখ্যাহীন অশান্ত আত্মার আর্ত কলরব! আমি ভূতের ভয় করি না, ভূতও মানি না, তবু আমার মনে হয়,—রাত্রে গঙ্গার অশ্রান্ত তরঙ্গ-দোলায় দুলে দুলে অশরীরীরা যেন শরীরী মানুষের সঙ্গে কানাকানি করতে চায়! আজ পর্যন্ত হাজার

হাজার যত অভাগা ভ্রান্ত ব্যর্থ শান্তির খোঁজে ওই ঠান্ডা জলের স্রোতে শেষ-ডুব দিয়েছে, তারা যেন আবার নতুন করে পৃথিবীর বাসিন্দার কাছে অভিশপ্ত আত্মার চিরন্তন অশ্রুজলের কাহিনি বলতে চায়!

আকাশে সেদিন একটুখানি চাঁদের ফালি জ্বালা ছিল। গঙ্গাজলে তারই সামান্য ছায়া চিকচিক করছে। কুৎসিত নারীর অলঙ্কারের মতন এটুকু চন্দ্রলেখা সমান ব্যর্থ,—কারণ কালো রাতের ঘোমটাকে তা স্বচ্ছ করে না।

যে-জায়গায় বসে আছি তার নাম বিচালিঘাট। একতলা কি তার চেয়েও উঁচু বড়ো বড়ো খড়বোঝাই নৌকোগুলো গায়ে-গা-দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—আশেপাশে আবছায়ার সৃষ্টি করে। সামান্য আলোর আভায় তাদের নৌকো বলে চেনাই যাচ্ছে না, মনে হচ্ছে গঙ্গাতীরে যেন অগুনতি কুঁড়েঘর নিয়ে একখানা ঘুমন্ত গ্রাম রাত-আঁধারে আড়ষ্ট হয়ে আছে!

ওই ভাসমান গ্রামের তলায় অলিগলির ভিতরে গঙ্গাজল ঢুকে কত রকম রহস্যময়, ভীতিকর শব্দ তুলছে! দিনের বেলায় তো ওখানে ও-রকম শব্দ শোনা যায় না! রাত্রে যারা ঘুমোয় না, অন্ধকারে যাদের অদৃশ্য চোখে দৃষ্টি জাগে, তারাই কি এখন ওখানে সাঁতার-খেলা খেলতে এসেছে? এক-একটা অলিগলিতে জল ঢুকে অমন গোঁ গোঁ আওয়াজ করছে কেন? ওদের ভয়াবহ হাত-পায়ের তাড়নায় গঙ্গাও কি ভয়ে-ব্যথায় কাতরে উঠছে?...রাত যত বাড়ে, পৃথিবীর ঘুম যত গাঢ় হয়ে ওঠে, মানুষের সাড়া যখন আর কখনো শুনতে পাব না বলে সন্দেহ হয়, কষ্টিপাথরের মতো কালো অন্ধকারের গর্ভে বন্দি জলকল্লোলের অপার্থিবতা মনকে তখন একেবারে পঙ্গু ও আতুর করে তোলে!

চাঁদের ফালি অত্যন্ত অসহায়ের মতো টিপটিপ করছে! সে জানে, তাকে চাঁদের ফালি বললেও চাঁদকে অপমান করা হয়। সে যেন স্বর্গ থেকে বিতাড়িত চাঁদের হীন, হাস্যকর, অক্ষম অনুকরণ, কিংবা চাঁদের শত্রু রাহুর দন্তবিকাশ! ওই তুচ্ছ আলোর আভাস গঙ্গাজলের আবর্তকে ভয়মাখা করে তুলেছে। মনে হচ্ছে, গঙ্গাস্রোতের সঙ্গে সঙ্গে যেন সন্দেহজনক ছায়াময় কী সব ভেসে যাচ্ছে—যেন তারা জ্যান্ত না হলেও মৃত নয়! যেন তারা আমাকেও তাদের কাছে যাবার জন্যে ইশারা করছে!

ওইরকম কী একটা অস্পষ্ট বস্তু আমার দিকে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে আসছে। এক-একটা ঢেউয়ের ধাক্কায় বস্তুটা যেন কোনো জীবন্ত দেহের মতো উপরে ভেসে উঠেই আবার ডুবে যাচ্ছে।

একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলুম। বস্তুটা একেবারে তীরের কাছে এসে থামল। ভালো করে দেখবার চেষ্টা করেও কিছুই বুঝতে পারলুম না।

আমার চোখের ভ্রম কি না জানবার জন্যে নীচে নেমে গেলুম! দেশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বাললুম এবং এক-মুহূর্তেই তার সমস্তটা দেখতে পেলুম।

একটা মৃতদেহ তার দুটো মরা চোখ খুলে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ঢেউ এর ধাক্কায় জীবন্ত এক মড়া! ভয়ানক!

দ্রুতপদে ঘাটের উপরে উঠে এলুম।

॥ ৩ ॥

আর এক রাতে গঙ্গার এক ঘাটে চুপ করে বসে আছি। সেদিনও গঙ্গা ছাড়া আর কেউ নিশীথিনীর নিদ্রাভঙ্গ করছে না।

আকাশে প্রতিপদের চাঁদ আছে, কিন্তু ভাদ্রমাসের খণ্ড খণ্ড মেঘের গুণ্ঠনে আকাশের চাঁদ-মুখ ঘন ঘন ঢেকে যাচ্ছে—গঙ্গাজলের উপরে বারে বারে আলো-আঁধারের অভিনয়!

ঘাটের ধারে অনেকগুলো নানা আকারের নৌকা বাঁধা রয়েছে, কিন্তু দাঁড়ি-মাঝিরা এখন নৌকার ভিতরে, হয়তো কেউ আর জেগে নেই।

নিস্তব্ধতার সঙ্গে গঙ্গা কী কথা কইছে, অনেকক্ষণ ধরে তা বুঝবার চেষ্টা করলুম।

এর-মধ্যে কখন একখানা বড়ো মেঘ এসে আকাশকে প্রায় গ্রাস করে ফেলেছে, কিছুই টের পাইনি।

হঠাৎ একেবারে মুষলধারে বৃষ্টি নামল। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালুম,—কিন্তু কাছে কোথাও মাথা গোঁজবার ঠাঁই দেখলুম না। ঘাটের পাশেই বাঁধা ছিল একখানা পানসি, তার উপরেই গিয়ে উঠলুম।

পানসির ভিতরে অন্ধকার, দাঁড়ি-মাঝিরা সেখানে নিশ্চয়ই ঘুমোচ্ছে, নিরুপায় হয়ে তারই ভিতরে ঢুকে পড়লুম। তাদের ঘুম তবু ভাঙল না, কারণ কারুরই সাড়া নেই। সারাদিনের পরিশ্রমের পর বেচারিরা গভীর নিদ্রায় অচেতন, তাই আমিও তাদের ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করলুম না। এককোণে বসে বৃষ্টি থামার প্রতীক্ষায় রইলুম।

কিন্তু সেদিনকার এই একগুঁয়ে বৃষ্টি কিছুতেই থামবার নাম করল না। গঙ্গাজলের উপরে ক্রমাগত ঝরঝর জল ঝরার একঘেয়ে শব্দ শুনতে শুনতে আমার চোখে কেমন তন্দ্রার ঘোর এল। সে ভাবটাকে তাড়াবার জন্যে একটা সিগারেট

মুখে দিয়ে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললুম। এবং সেই আলোতে দেখলুম, পানসির ভিতরে জনপ্রাণীও নেই।

আশ্চর্য হলুম না। নৌকোর লোকেরা হয়তো কোনো কাজে কাছেই কোথাও গিয়েছে, বৃষ্টি ধরলেই ফিরে আসবে।

সিগারেট ফুরিয়ে গেল, কিন্তু আকাশে জলের ভাণ্ডার তবু ফুরল না। আবার তন্দ্রা এল। এবারে আর জাগবার চেষ্টা না করে, পানসির ভিতরে দুই পা ছড়িয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়লুম।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম জানি না, কিন্তু ঘুম যখন ভাঙল বৃষ্টি তখন থেমে গিয়েছে, আকাশে আবার চাঁদ উঠেছে।

তারপরেই মনে হল, নৌকো যেন চলছে!

পানসির বাইরে চাঁদের আলো, ভিতরেও জানলা দিয়ে আলো এসে পড়েছে,—কিন্তু ভিতরে-বাইরে কোথাও দাঁড়ি-মাঝিরা কেউ নেই, অথচ নৌকোসুদ্ধ আমি একেবারে মাঝ-গঙ্গায় এসে পড়েছি!

প্রথমে ভাবলুম, ঝোড়ো-হাওয়ায় বা অন্য কোনোগতিকে বাঁধন খুলে গিয়ে নৌকোখানা স্রোতের মুখে আপনি ভেসে চলেছে!

কিন্তু তারপরেই ভালো করে দেখে বুঝলুম, নৌকো স্রোতের মুখে ভেসে যাচ্ছে না—যাচ্ছে স্রোতের টান এড়িয়ে সোজা গঙ্গার এপার থেকে ওপারের দিকে! ঠিক যেন অদৃশ্য হাতের হাল আর দাঁড় ধনুক-থেকে-নিক্ষিপ্ত বাণের মতো নৌকোখানাকে সিধে একদিকে বইয়ে নিয়ে চলেছে!

এও কি সম্ভব? আমি কি দুঃস্বপ্ন দেখছি? তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলুম। কোথায় দাঁড়ি, কোথায় মাঝি? দাঁড়ের কোনোই শব্দ নেই, কিন্তু নৌকোর গতি ওপারের দিকে!

ভূত মানি না, চোখের সামনে কোনো ছায়াদেহও দেখছি না, কিন্তু এ কী ব্যাপার?

কেমন একটা অজানা ভয়ে সর্বশরীর আচ্ছন্ন হয়ে গেল,—কী করি? পানসির ভিতরে গিয়ে বসব? না—না, যদি ঢুকে দেখি, ভিতরটা এখন আর নির্জন নয়, যদি আমার পাশে অন্য কেউ এসে ধুপ করে বসে পড়ে?

পানসি তখন মাঝ-গঙ্গা পেরিয়ে এসেছে! নৌকোর হাল শূন্যে উঁচু হয়ে আছে, দাঁড়গুলো পাটাতনের উপরে পড়ে আছে—কিন্তু নৌকোর তীব্র গতির মুখে দু-ধারে কল কল করে জল কাটার শব্দ হচ্ছে! মানুষের বদলে নৌকোর উপরে আমি যদি কতগুলো অমানুষী, স্বচ্ছ ছায়ামূর্তিও দেখতুম, তাহলেও আমার মনে বোধহয় এতটা অস্বাভাবিক আতঙ্কের সঞ্চার হত না! তাহলে হয়তো একটা কোনো হদিস পেতুম—মানুষ হোক অমানুষ হোক নৌকো কেউ চালাচ্ছে বলে

অনেকটা আশ্বস্ত হতে পারতুম! কিন্তু এই যে অদৃশ্য নীরব আত্মার অস্তিত্ব আমার চারিদিকে অনুভব করছি, যারা আমার খুব কাছে থেকেও চোখের আড়াল হয়ে আমাকে নিঃশব্দে নিরীক্ষণ করছে, তাদের সহ্য করা অসম্ভব! আমি আর অগ্র-পশ্চাৎ ভাবলুম না—একলাফে ঝাঁপিয়ে পড়লুম গঙ্গার বুকে!

ভালো সাঁতার জানি। খানিকক্ষণ পরে কলকাতার এক ঘাটে এসে উঠলুম। যতক্ষণ সাঁতার দিয়েছি খালি ভয় হয়েছে, পানসিখানা যদি আবার আমাকে তুলে নিতে আসে!

পরদিন বেলা থাকতে আবার গঙ্গার ঘাটে গিয়ে হাজির হলুম।

কালকের মতো ঘাটের পাশেই একখানা পানসি বাঁধা আছে। একজন দাঁড়ি কি মাঝি পানসির ধারে পা ঝুলিয়ে বসে জাল বুনছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'বাপু, বলতে পারো, কাল রাতে এখানে কার পানসি বাঁধা ছিল?'

—'আমারই পানসি, হুজুর!'

—'কিন্তু পানসিতে তোমরা কেউ ছিলে না!'

—'না হুজুর, ছিলুম না। শনিবার রাতের বেলায় এ পানসিতে আমরা কেউ থাকি না।'

—'থাকো না কেন?'

লোকটা চুপ করে রইল।

আমি বললুম, 'আমার কাছে লুকিয়ো না। কাল হঠাৎ বৃষ্টি এসে পড়াতে আমি ওই পানসির ভিতরে গিয়ে বসেছিলুম। তোমরা কেউ ছিলে না, তবু পানসিখানা আমাকে নিয়ে ওপারে ভেসে যাচ্ছিল। এর মানে কী?'

লোকটা খানিক ইতস্তত করে বললে, 'আজ্ঞে, হুজুর যখন জেনেছেন তখন বলতে আর দোষ কী? শনিবারে এ পানসির ওপরে ভর হয়।'

—'ভর হয়?'

—'হ্যাঁ হুজুর, আমরা বেঁধে রাখলেও সকালে উঠে দেখি পানসিখানা ওপারে গিয়ে পৌঁছেছে!'

—'বরাবরই এই রকম হয়?'

—'না হুজুর, মাস-চারেক আগে এক শনিবারে গঙ্গা পার হবার সময়ে কালবোশেখিতে আমাদের নৌকো উলটে যায়। তিনজন লোক জলে ডুবে মারা পড়ে। তারপর থেকেই ফি শনিবারে এই ব্যাপার হচ্ছে!'

গুহাবাসী বিভীষণ

॥ এক ॥

বিমল ও কুমার আমেরিকান ও ইংরেজি পদ্ধতিতে 'বক্সিং' অভ্যাস করছিল।

আজ সকালেই ওই দুই দেশের বিশেষ পদ্ধতি নিয়ে তাদের মধ্যে তর্ক হয়ে গেছে। এখন খুব-খানিকটা ঘুসোঘুসি করেও তর্কের কোনো শেষ-মীমাংসা হল না।

বিমল মুষ্টিযুদ্ধের দস্তানা খুলে ফেলতে ফেলতে বললে, 'ঘুসির জোরেও যে তর্কের মীমাংসা হয় না, আপাতত সে-তর্ককে বাতিল করে দেওয়া যাক।'

কুমার বললে, 'তোমার 'সোলার প্লেক্সাসে' একটি মাত্র ঘুসি মারবার ফাঁক পেলেই এখনই একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যেত।'

বিমল বললে, 'কিন্তু আমেরিকান কায়দা সে ফাঁক দেয় না! মনে রেখো, 'সোলার প্লেক্সাসে' ঘুসি মেরে যোদ্ধাকে অজ্ঞান করবার কৌশল প্রথমে আমেরিকাতেই আবিষ্কৃত হয়েছিল।'

বাইরে থেকে ডাকপিয়ন হাঁকলে—'চিঠি আছে!'

বিমল বললে, 'দ্যাখো গে বিনয়বাবুর চিঠি এল কি না! বাহাদুরগঞ্জে গিয়ে পর্যন্ত তিনি কোনো চিঠি লেখেননি!'

কুমার বেরিয়ে গেল। তারপর একখানা খাম হাতে করে ফিরে এসে বললে, 'হ্যাঁ, বিনয়বাবুর চিঠিই বটে!'

—'কী লিখেছেন পড়ে শোনাও।'

কুমার খাম ছিঁড়ে চিঠি বার করে চেঁচিয়ে পড়তে লাগল,

'প্রিয় বিমল ও কুমার,

বায়ু-পরিবর্তনের জন্যে এখানে এসে পর্যন্ত তোমাদের যে কোনো পত্র লিখিনি তার কারণ হচ্ছে, এতদিন দেবার মতো কোনো খবর ছিল না। এখানকার প্রধান ঐশ্বর্য ব্রহ্মপুত্র নদ। সে আগেও যেমন বইত, এখনও তেমনি বইছে। সকালে সন্ধ্যায় তার তীরে বসে সূর্য-কিরণের জন্ম ও মৃত্যু দেখতে আমার খুব ভালো লাগে বটে, কিন্তু পত্রে সে-খবরের মধ্যে তোমরা কোনোই নূতনত্ব আবিষ্কার করতে পারতে না। কবির কলম পেলে এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যের উজ্জ্বল বর্ণনা করতে পারতুম। কিন্তু তোমরা জানো, আমি কবি নই,—শুষ্কপ্রাণ বৈজ্ঞানিক মাত্র।

কিন্তু সম্প্রতি এখানে একটি দেবার মতো খবর পাওয়া গেছে।

তোমরা ভূত মানো না, আমিও মানি না। ভূতের গল্প শুনে ও পড়ে আমি

কেবল শখ করে ভয় পেতে ভালোবাসি। হয়তো তোমাদেরও সেই অভ্যাস আছে, তাই আমি আজ তোমাদের একটি নতুন ভূতের গল্প শোনাব।

এখানকার বাসিন্দাদের মতে, একটি অজানা ভূত নাকি আমারই মতো বায়ু পরিবর্তনের জন্যে এ-অঞ্চলে এসে উপস্থিত হয়েছে।

কিন্তু সে ভূতটি আমার মতো শান্তিপ্রিয় নয়। সে রীতিমতো উপদ্রব শুরু করেছে।

রোজ রাত্রে সে ব্রহ্মপুত্রের জলে নেমে সাঁতার কাটে। তাকে চোখে কেউ দেখেনি বটে, কিন্তু সে নাকি রোজ রাত্রেই ভয়ানক হেঁড়ে গলায় কান্নাকাটি করে আর একটা গুহার কাছে জলের ভিতর থেকে তার বিষম ঝাঁপাই-ঝোড়ার শব্দও শোনা যায়!

সে অনায়াসেই খুব চেঁচিয়ে হাসতে পারত। কিন্তু সে হাসে না, কাঁদে—খালি কাঁদে!

লোকের কথায় প্রথমটায় বিশ্বাস করিনি। কিন্তু দিন-পাঁচ আগে আমিও স্বকর্ণে তার কান্না শুনেছি!

ব্রহ্মপুত্রের তীরেই একখানা বাংলোয় আমি আছি। সেদিন রাত্রে হঠাৎ বৃষ্টি আসায় আমার ঘুম গেল ভেঙে। তাড়াতাড়ি উঠে মাথার দিককার জানলাটা বন্ধ করে দিতে গেলুম।

হু হু ঝোড়ো-হাওয়ার সঙ্গে এক আশ্চর্য ও অমানুষিক কণ্ঠের উচ্চ ও তীব্র চিৎকার ঘরের ভিতরে ভেসে এল!

তেমন কান্নাভরা বিকট চিৎকার আমি আর কখনো শুনিনি। সে চিৎকার মানুষেরও বটে, মানুষের নয়ও বটে! অর্থাৎ মানুষ ইচ্ছা করলেও তেমন ভাবে চিৎকার করে কাঁদতে পারে না!

তিনবার সেই চিৎকার শুনলুম। তারপর ঝড় ও বৃষ্টির রোখ এমন বেড়ে উঠল যে, জানলা বন্ধ করে দিতে হল।

নদীর জলের ভিতরেই ডাঙা থেকে প্রায় দু-শো গজ তফাতে আছে এক শিশু-পাহাড়। লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে তার চূড়া হয়তো একদিন মেঘ রাজ্যে গিয়ে পৌঁছবে, কিন্তু এখন তার মাথা জল ছাড়িয়ে ত্রিশ ফুটের বেশি উপরে উঠতে পারেনি। এই ছোট্ট পাহাড়ের নীচের দিকে একটা গুহা আছে। জোয়ারের সময়ে সেই গুহাটা জলের তলায় অদৃশ্য হয়ে যায় এবং ভাটার সময়েও তার আধাআধি জলে ভরতি হয়ে থাকে।

আমার মনে হল, সেই ভয়াবহ আর্তনাদ আসছে ওই পাহাড়ের কাছ থেকেই।

পরশুদিন রাত্রে আবার এক কাণ্ড হয়ে গেছে।

একটা কুলি সন্ধ্যার পর জল আনতে গিয়েছিল নদীর ঘাটে।

কিন্তু হঠাৎ সে মহা ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল। তার দুজন সঙ্গী ব্যাপার কী দেখবার জন্যে ঘাটের দিকে ছুটে গেল। অন্ধকারে তারা কিছুই দেখতে পেলে না বটে, কিন্তু সভয়ে শুনলে যে ঘাটের খুব কাছ থেকেই অমানুষিক কণ্ঠে কে ঘন ঘন গর্জন করছে! তারা আর না এগিয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে এল!

কাল সকালে গোলমাল শুনে আমি নদীর ঘাটে গিয়ে দেখি, সেই হতভাগ্য কুলি মৃতদেহ জলের ভিতরে অর্ধমগ্ন অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

ভালো করে লক্ষ করে বুঝলুম, কেউ তাকে গলা টিপে হত্যা করেছে। গলার উপরে তখনও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, মোটা মোটা আঙ্গুলের দাগ! সেগুলো যে মানুষের আঙ্গুলের দাগ, তাতে আর কোনোই সন্দেহ নেই!

কে তাকে হত্যা করলে? কেন হত্যা করলে? রাত্রে নদীর জলে কে কাঁদে বা গর্জন করে? পুলিশের পাহারা বসেছে, কিন্তু এসব প্রশ্নের কোনোই জবাব নেই।

এখানকার লোকেরা ভয়ে, বিস্ময়ে ও দুর্ভাবনায় কাতর হয়ে পড়েছে। সূর্য অস্ত গেলে পর কেউ আর নদীর ধার মাড়ায় না। সত্যি কথা বলতে কী, আমিও হতভম্ব হয়ে গেছি।

এরকম অসাধারণ ঘটনা নিয়ে তোমরা মাথা ঘামাতে খুব ভালোবাসো, তাই তোমাদের খবরটা জানিয়ে দিলুম। যদি নূতন উত্তেজনার প্রতি তোমাদের লোভ থাকে, তাহলে আমার বাংলোয় তোমাদের স্থানাভাব হবে না।

অতএব আশা করছি, অবিলম্বেই তোমরা সশরীরে এসেই আমার পত্রের উত্তর দেবে। ইতি—

তোমাদের—
'বিনয়বাবু'

কুমার বললে, 'বিমল, তোমার মত কী?'

বিমল সহাস্যে বললে, 'তাও আবার জিজ্ঞাসা করছ? এক্ষেত্রে তোমাতে আমাতে মতের অমিল হবার সম্ভাবনা নেই।'

কুমার বললে, 'তাহলে তল্পিতল্পা বাঁধবার চেষ্টা করি?'

—'নিশ্চয়ই।'

॥ দুই ॥

জায়গাটি চমৎকার। যেখানে পাহাড়, নদী আর অরণ্যের মিলন হয় সেখানে প্রকৃতির রূপে কেউ খুঁত ধরতে পারে না।

আকাশের নীলিমা আছে পৃথিবীর সর্বত্রই, কিন্তু আসলে তার সৃষ্টি হয়েছে পাহাড়, নদী আর অরণ্যের উপরে চাঁদোয়া হবার জন্যেই।

বিনয়বাবু বললেন, 'দ্যাখো বিমল ওই সেই শিশু-পাহাড়!'

বিমল ও কুমার দেখলে, ব্রহ্মপুত্রের স্বচ্ছ জলে ছায়া ফেলে ছোট্ট একটি পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে।

বিমল বললে, 'ওরই তলায় গুহা আছে?'

—'হ্যাঁ। এখন ভাটা পড়েছে, তাই গুহার উপরদিকটা দেখা যাচ্ছে।'

কুমার বললে, 'বিনয়বাবু, আপনি কোনোদিন ওই গুহার কাছে যাননি?'

—'না। এতদিন যাবার দরকার হয়নি। আমার বিশ্বাস ওই গুহার ভিতরটা একবার পরীক্ষা করা উচিত।'

বিমল বললে, 'বেশ তো, এখনই সে চেষ্টা করা যাক না! ঘাটে অনেকগুলো নৌকো বাঁধা রয়েছে, একখানা ভাড়া করে গুহার কাছে গেলেই চলবে।'

সকলে ঘাটের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু কোনো মাঝিই তাদের গুহার কাছে নিয়ে যেতে রাজি হল না।

বিমল বললে, 'আচ্ছা, তোমরা নৌকো ছেড়ে নেমে দাঁড়াও, আমরাই দাঁড় বেয়ে গুহার কাছে যাব। তোমরা পুরো ভাড়াই পাবে।'

এ বন্দোবস্তে তাদের আপত্তি হল না। বিনয়বাবু ধরলেন হাল এবং দাঁড় নিয়ে বসল বিমল ও কুমার।

নৌকো ভেসে চলল ছোটো পাহাড়ের দিকে।

প্রথমে তারা পাহাড়টাকে একবার প্রদক্ষিণ করলে, তার চারিদিকেই রোদে উজ্জ্বল নদীর জল নেচে নেচে খেলা করছে। পাহাড়টা একেবারে ন্যাড়া, তার রুক্ষ কালো গায়ে সবুজের আঁচটুকু পর্যন্ত নেই। তারই টঙের উপর স্থির হয়ে বসে আছে একটা শকুন।

একদিকে রয়েছে সেই গুহাটা। এখন জোয়ার নয় বলে গুহার উপর দিকটা খিলানের মতো জলের উপরে জেগে রয়েছে। গুহার মুখ চওড়ায় দশ-বারো ফুটের বেশি নয়।

নৌকো গুহামুখে গিয়ে উপস্থিত হল। তার ভিতরটা ঘন ছায়ায় ভরা, সর্বদাই সেখানে সন্ধ্যার আলো-আঁধার বিরাজ করে। সকলে নৌকার উপরে হেঁট হয়ে পড়ে গুহার ভিতর দিকটা দেখবার চেষ্টা করলে, কিন্তু ভিতরে শুধু জল থই থই করছে! ভালো করে কিছু দেখাও গেল না, সন্দেহজনক কিছু আছে বলেও মনে হল না।

কুমার বললে, 'কিন্তু বিমল, এখানে কেমন একটা আঁশটে গন্ধ পাচ্ছ না কি? কাছে কুমির থাকলে এমনি গন্ধ পাওয়া যায়।'

বিমল বললে 'হুঁ।' তারপর দাঁড়টা যথাসম্ভব বাড়িয়ে দিয়ে গুহার ভিতরকার দেয়ালে ঠুকে পরীক্ষা করতে লাগল।

আচম্বিতে তাদের নৌকোখানা তীব্রবেগে পিছু হটে গুহার মুখ থেকে খানিক তফাতে গিয়ে পড়ল! সকলে মহাবিস্ময়ে হুমড়ি খেয়ে জলের ভিতর তাকিয়ে দেখলে, কিন্তু কিছুই দেখা গেল না!

কুমার বললে, 'জলের ভিতর থেকে বিষম ধাক্কা মেরে কে যেন নৌকোখানাকে দূরে ঠেলে দিলে!'

বিমল বললে, 'কিন্তু কে সে? কুমির যে এমন করে নৌকো ঠেলে দিতে পারে, এ-কথা তো কখনো শুনিনি!'

—'কিন্তু সে যেইই হোক, আমরা যে ওখানে থাকি, এটা সে চায় না!'

বিনয়বাবু বললেন, 'আমরা কি আবার নৌকো নিয়ে গুহার কাছে যাব?'

বিমল বললে, 'না, আমরা এইবারে ওই পাহাড়ে গিয়ে উঠব।'

॥ তিন ॥

পাহাড়ের নীচের দিকটা নদীর জল লেগে লেগে এমন পিছল হয়ে আছে যে, তার উপরে উঠতে তাদের বিশেষ বেগ পেতে হল।

পাহাড়ের উপরে মানুষের আবির্ভাব দেখে শকুনটা বিরক্ত হয়ে উড়ে গেল।

বিনয়বাবু বললেন, 'এই ন্যাড়া পাহাড়ের টুকরোর উপরে একটা মাছিও লুকিয়ে থাকতে পারে না। এখানে এসে লাভ কী?'

বিমল বললে, 'আমরা ওই গুহার পাশে গিয়ে দাঁড়ালে ভালো করে দেখবার সুযোগ পাব।'

গুহার পাশেই রয়েছে মস্ত একখানা পাথর—জল থেকে হাত-চারেক উঁচু। কুমার তার উপরে গিয়ে জলের ধারে পা ঝুলিয়ে বসে পড়ল। বিমল ও বিনয়বাবুও তার পাশে গিয়ে বসলেন।

বিমল স্থির চক্ষে গুহার দিকে তাকিয়ে বললে, 'ওই গুহার ভিতরে অনায়াসেই কোনো জলচর জীব লুকিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু বিনয়বাবু, আপনি যে চিৎকার শুনেছিলেন, কোনো জলচর জন্তুর পক্ষে কি সে-রকম চিৎকার করা সম্ভব?'

বিনয়বাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, 'না, না, সে হচ্ছে মানুষের কণ্ঠে অমানুষিক চিৎকার!'

—'বেশ বুঝতে পারছি, এই ভাটার সময়েও গুহার ভিতরে ডুবজল রয়েছে। কোনো মানুষ নিশ্চয়ই ওখানে বাস করতে পারে না।'

—'কোনো মানুষ ওখানে বাস করুক বা না-করুক, কিন্তু চিৎকারটা এইখানেই উঠেছিল বলে আমার সন্দেহ হয়।'

—'সেদিনের সেই চিৎকার, তারপর ঘাটের উপরে সেই নরহত্যা, তারপর আজকের এই নৌকোয় ধাক্কা মারার ব্যাপার! এই তিনটের মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে কি না, আমাদের এখন সেই বিচারই করতে—'

হঠাৎ কুমার চমকে পাথরের একটা কোণ দুই হাতে চেপে ধরে আর্তস্বরে বলে উঠল—'কে আমার পা ধরে টানছে—বিমল—'

বিমল জলের দিকে একবার উঁকি মেরেই চোখের পলক না ফেলতে পকেট থেকে রিভলভার বার করে উপর-উপরি দু-বার গুলি ছুড়লে!

তারপরেই এক বুক-কাঁপানো গগনভেদী ভয়ংকর চিৎকার!

বিনয়বাবু জলের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন, কিন্তু তিনি দেখলেন কেবল মস্ত একটা ছায়া জলের ভিতরে সাঁ করে মিলিয়ে গেল এবং জলের উপরে ভেসে উঠল খানিকটা রক্ত।

কুমার তাড়াতাড়ি পা গুটিয়ে নিয়ে হতভম্বের মতো বিমলের দিকে তাকিয়ে দেখলে, তার মুখের ভাব উদ্ভ্রান্তের মতো!

তারপর সে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, 'বিমল, বিমল, জলের ভিতর থেকে কে আমার পা ধরে টানছিল?'

—'তুমি কি কিছুই দ্যাখোনি?'

—'না দেখবার সময় পেলুম কই? খালি এইটুকু বুঝতে পারছি, আমার পা ধরেছিল মানুষের দু-খানা হাত!'

বিমল অভিভূত কণ্ঠে বললে, 'আমিও যা দেখেছি হয়তো সেটা মানুষেরই মুখ! কিন্তু মানুষের মুখের চেয়ে অন্তত আড়াই গুণ বড়ো! তার চোখ, নাক, ঠোঁট, গলা, হাত আছে, অথচ তার কিছুই সত্যিকার মানুষের মতো নয়! সে এক ভয়ানক অসম্ভব দুঃস্বপ্ন, আমার গায়ে এখনও কাঁটা দিচ্ছে!'

॥ চার ॥

নৌকা আবার পাহাড় ছেড়ে তীরের দিকে ফিরল।

বিনয়বাবু বললেন, 'পৃথিবীতে চিরদিনই এক বিচিত্র জীবের কথা শোনা যায়, সাহেবরা যাবে বলে mermaid, আর আমরা বলি মৎস্যনারী। ভারতের নানা স্থানে সেকেলে মন্দিরের গায়ে এই রকম জলবাসী আর এক জীবের—অর্থাৎ নাগকন্যাদের মূর্তি দেখা যায়। মৎস্যনারীদের দেহের উপর দিকটা হয় মানুষের

মতো আর নীচের দিকটা মাছের মতো। নাগকন্যাদেরও উপর দিক মানুষের মতো দেখতে হলেও তাদের নীচের দিকটা হয় সাপের মতো।'

কুমার বললে, 'কিন্তু তারা তো কল্পনা-জগতের জীব!'

—'আগে শোনো। অনেক নাবিক অজানা সমুদ্র থেকে ফিরে এসে অনেকবারই মৎস্যনারীর কথা বলেছে। পণ্ডিতরা সে সব কথা ঠাট্টা করেই উড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সেদিন 'স্টেটসম্যান' কাগজে দেখলুম, এইবারে অবিশ্বাসী পণ্ডিতদের মুখ বন্ধ হয়েছে।'

—'কী রকম?'

'সিয়েরা লিওনের ডা. গ্রাহাম মৎস্যনারীর একটি 'মমি' অর্থাৎ রক্ষিত দেহ নিয়ে ইংল্যান্ডে এসেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে এক দোকানদার ওই দেহটি কিনেছে। বড়ো বড়ো বৈজ্ঞানিক আর জীবতত্ত্ববিদ পণ্ডিত পরীক্ষা করে বলেছেন, ওটি যে একদা-জীবন্ত কোনো জীবের মৃতদেহ, সে-বিষয়ে সন্দেহ করবার উপায় নেই। এটিও অর্ধ-মৎস্য আর অর্ধ-মানবীর দেহ। এর পরেও মৎস্যনারীকে আর কল্পনা বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে কি?'

বিমল বললে, 'কিন্তু আমি আজ যে জীবটাকে দেখলুম, তার নীচের দিকটা জলের তলায় ঢাকা ছিল। আর তার মুখে ছিল একরাশ দাড়ি গোঁফ। সে নারী নয়।'

কুমার বললে, 'মৎস্যনারী যদি থাকে তবে মৎস্যনরও আছে!'

বিনয়বাবু বললেন, 'হয়তো ও-জীবটা বানের টানে বা অন্য কোনো কারণে হঠাৎ ব্রহ্মপুত্রের জলে এসে পড়েছে। দিনের বেলায় গুহার ভিতরে লুকিয়ে থাকে, আর রাত্রে বেরিয়ে স্বদেশে ফিরতে না পেরে কেঁদে কেঁদে বেড়ায়!'

কিন্তু এর পরেও তার কান্না আর কেউ শুনতে পায়নি। তার কারণ কি বিমলের রিভলভার?

নকল-শিকারির সংকট

আমি পেশাদার বা শৌখিন, কোনো শ্রেণিরই শিকারি নই—গোড়াতেই এই 'নোটিশ' দিয়ে রেখে পাক্কা শিকারিদের বিদ্রোহী রসনাকে শান্ত করতে চাই। তবে নিজেকে নকল-শিকারি বলে বিজ্ঞাপিত করলে বোধকরি বিশেষ বিড়ম্বিত হতে হবে না।

আজ কলম ধরলেও হাত কাঁপে, কিন্তু যখন বয়স ছিল বন্দুক ধরতে পারতুম নিষ্কম্প হস্তে। আর তখন বন্দুক ধরবার বেশি সুযোগ পেতুম কুচবিহারের জঙ্গলেই। কিন্তু বাঘ-গন্ডার মারবার স্বপ্ন দেখিনি কখনো, আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা দৌড় মারত পক্ষীরাজ্য পর্যন্ত। প্রথম প্রথম পক্ষীদের সম্বন্ধেও বাছবিচার ছিল না, কাক-বক কেউ পেত না আমার হাত থেকে রেহাই, কারণ নতুন শিকারির মতো নিষ্করুণ জীব দুনিয়ায় দুর্লভ। মনে আছে, কাকরাও আমাকে 'শত্রু নম্বর এক' বলে দস্তুরমতো চিনে রেখেছিল। আমি বন্দুক কাঁধে নিয়ে পথে বেরুলেই তারা ঝাঁকে ঝাঁকে তারস্বরে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে অরণ্যরাজ্য মুখরিত করে তুলে দিগ্‌বিদিকে নিরাপদ ব্যবধানে সরে পড়ত। কিছুদিন পরেই এই নির্বিচারে পক্ষীহত্যার ঝোঁক কমে গেল আপনা-আপনি।

একটা পাখি-মারা বন্দুক (স্মুদ্‌-বোর গান) নিয়ে টো টো করে ঘুরে বেড়াতুম বনে বনে। মাঝে মাঝে শিকারের পাখি পেতুম বটে, কিন্তু অধিকাংশ দিনই ফিরে আসতুম খালি হাতে। তবে ব্যর্থ হলেও কোনোদিন স্যাঁতসেঁতে হয়ে পড়েনি আমার উৎসাহ। কারণ পাখি না পেলেও অফুরন্ত মাত্রায় পল্লিপ্রকৃতির সান্নিধ্য লাভ করে মজুরি পুষিয়ে যেত যথেষ্টরও বেশি।

মাছ ধরবার নাম করে ছিপ হাতে নিয়ে আমি পুকুরপাড়ে বসে থাকতেও খুব ভালোবাসি। নিতান্ত যাদের পরমায়ু ফুরিয়েছে এমন কোনো কোনো অভাগা মাছ আমার ছিপের সুতোয় সংলগ্ন হয়ে মাঝে মাঝে আত্মহত্যা করেছে বটে, কিন্তু তারা এমন বোকামি না করলেও আমার দুঃখ হয় না। আমি মাছ ধরতে যেতে চাই কিছুক্ষণের মতো শহুরে ইষ্টক-কারাগার থেকে মুক্তি পাবার জন্যে। আমি চাই সবুজ ঘাসের ফ্রেমে আঁটা সরোবরের রোদ-ঝলমলে 'কাকচক্ষু জল'— যেখানে জলকেলি করতে আসে আকাশনীলিমার স্নিগ্ধ স্বপন; যেখানে তটে তটে জলসা বসায় মর্মরমুখরিত নৃত্যশীল তরুবৃন্দ এবং তাদের পল্লবিত ও পুষ্পিত শাখায় শাখায় হয় জানা আর নাম-না-জানা বিহঙ্গদের সংগীতসভার অধিবেশন; যেখানে সুরেলা বাতাসও এসে গান গেয়ে ছড়িয়ে দেয় ভুরভুরে ফুলের আতর। আমার মাছধরা অনেকটা অজুহাত মাত্র—প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে ভুরি পরিমাণে উপভোগ করার অজুহাত।

আমার মৎস্যশিকারের মতো আমার পক্ষীশিকারেরও শখ ছিল ওই শ্রেণির। পাখিরা আমাকে ফাঁকি দিলেও আমার আক্ষেপ হত না বেশি। বাঘ-ভাল্লুকের মতো শিকারের পাখিরাও বনবাসী জীব। তাদের সঙ্গেও শহরের ড্রয়িংরুমে বসে মুলাকাত করা চলে না, উপবনে তাদের বিহারভূমি নয়, তাদের সঙ্গে দেখা করতে গেলে যেতে হয় এমন নির্জন বনভূমির মধ্যে, যেখানে দিকে দিকে

সাজানো থাকে প্রকৃতির নিজস্ব ভাণ্ডার। সেখানে পাখিরা বিমুখ হলেও প্রকৃতি কারুর প্রতি বিমুখতা প্রকাশ করেন না—মহাজন বা অভাজন সকলের কাছেই অকৃপণভাবে বিলিয়ে দেন তিনি অজস্র সৌন্দর্যের ঐশ্বর্য। সেখানে পদার্পণ করলে আমার প্রাণে জেগে ওঠে রক্ততৃষার বদলে রূপের নেশা এবং তখন আমি তাইতেই খুশি হয়ে মনে মনে রচনা করি পল্লিগাথা বা পল্লিদৃশ্যবিষয়ক এমন কোনোকিছু, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'আইডিল (Idyll)'। তালেবর শিকারিদের ব্যাঘ্রহত্যার রোমাঞ্চকর কাহিনি পাঠ করবার পর আমার এই 'আইডিল'টুকু মিঠে চাটনির মতো লাগতে পারে। মৃগয়ায় বেরিয়ে আমার কাছে শিকারের পশুপক্ষীই সবচেয়ে দ্রষ্টব্য হয়ে ওঠে না, আমার মানসপটে প্রাধান্য বিস্তার করে রূপেরসে জীবন্ত, বর্ণবিচিত্র পল্লিচিত্র।

কিছু কম অর্ধ শতাব্দী আগেকার কথা।

বোধহয় তার নাম ফ্রান্সিস। তবে হলপ করতে পারব না, কারণ কেউ যদি বলেন—না, তার নাম টম কি হ্যারি, তাহলে আমার প্রতিবাদ করবার ক্ষমতা নেই। এতকাল পরে স্মৃতিবিচ্যুতি হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। কিন্তু যখনই তার কথা স্মরণে আসে, মনে হয় তার নাম ফ্রান্সিস, তাই তাকে ওই নামেই ডাকা বিধেয়।

বিলাতে কুচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের পরলোকগমনের পর সে এদেশে এসে রাজসরকারে চাকরি গ্রহণ করেছিল। কুচবিহারের গদির অধিকারী তখন মহারাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ।

ফ্রান্সিস বয়সে যুবক, আমার চেয়ে কিছু বড়ো। সুজনবাবুর মধ্যস্থতায় তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়, তিনি ছিলেন সেখানকার ফোটোগ্রাফার। আমি থাকতুম আমার মেসোমহাশয় স্বর্গীয় সূর্যনাথ গুপ্তের কাছে, তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের ভাগিনেয়, সুতরাং সম্পর্কে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের শ্যালক।

শীতের এক দুপুরে সুজনবাবু ও ফ্রান্সিসের সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিলুম, উদ্দেশ্য পাখিশিকার। সুজনবাবু ও আমার হাতে ছিল বন্দুক, কিন্তু ফ্রান্সিসের আবদারে আমার বন্দুকটি তার হাতে সমর্পণ করতে বাধ্য হলুম অনিচ্ছাসত্ত্বেও।

শহরের সীমানা ছাড়িয়ে একটি ঝিল কি বদ্ধ নদীর ধারে গিয়ে পড়লুম, স্থানীয় লোকেরা তার নাম রেখেছে 'ছোটো তোর্সা'। এতদিনে সেটি একেবারে মজে গিয়েছে কি না জানি না, কিন্তু তখন সেই জলাশয়ের ধারটি ছিল নিরিবিলি মনোরম ঠাঁই। দুই পাড়ে ঘাস-বিছানার উপরে দাঁড়িয়ে পুলকে কম্পমান পাদপরা কালো জলের ভিতরে দেখত নিজেদের সবুজ ছায়ার ছবি। ঝিলে কুতূহলে সাঁতার দিয়ে ভেসে যেত অমলধবল রাজহংসযূথ; জলে রঙিন বিদ্যুৎপ্রভার মতো ঝাঁপ

খেয়ে চকিতে আবার উড়ে গাছের ডালে গিয়ে বসত মাছরাঙারা; এখানে ওখানে তীরে তীরে এক ঠ্যাং তুলে যেন কৃচ্ছ্রসাধন করত ধ্যানী বকের দল; এবং মাথার উপরে শ্যামল শামিয়ানার আড়ালে থেকে থেকে সুরে ডেকে উঠত গীতকারী কত পাখি! শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ ভরা সে বড়ো চমৎকার জায়গা, আজও তার মোহ আমাকে ছাড়েনি—দিবাস্বপ্নে কত দিন চলে যাই আবার সেইখানে।

ছায়াঢাকা, মায়ামাখা, পাখিডাকা 'ছোটো তোর্সা'র নিরালা তটভূমি পিছনে ফেলে এগিয়ে চললুম খোলা মাঠের উপর দিয়ে। দূরে দেখা যাচ্ছিল দিকচক্রবালরেখার উপরে আঁকা কৃষ্ণাভ নীল অরণ্যলেখা—আমাদের গন্তব্য স্থল। ডাইনে বামে শস্যখেত, পায়ে-হাঁটা মেঠো পথ। মাথার উপরে নীলোৎপল নিংড়ানো রং মাখা আকাশের অসীমতা নিয়ে পথিক সূর্য জেগে আছে শূন্যমার্গের মাঝামাঝি—প্রখর রৌদ্রে ঝলমল করছে পরিদৃশ্যমান পৃথিবী, ধু ধু মাঠের হু হু হাওয়া তপ্ততা ভরা, মাঠের প্রান্ত পর্যন্ত এসেই সেই শীতের দুপুরেও দেহ হয়ে উঠল ঘর্মাক্ত, কণ্ঠ হয়ে উঠল তৃষ্ণার্ত।

সেইখানে ছোটো একটি গ্রাম। আমাদের দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে জনকয় কোমরে কাপড় বাঁধা আদুল-গা চাষা, গুটিকয় পূর্ণ-দিগম্বর বালক ও শিশু এবং খোড়ো কুটিরগুলোর আশপাশেও উৎসুক চোখে উঁকিঝুঁকি মারছে পাঁচ-সাতটি কিশোরী ও বুড়ি কালোকোলো কৃষাণী। একপাল দেশি কুকুরও কোথা থেকে বেগে ছুটে এল এবং আমাদের মূর্তিমান উপদ্রবের মতো মনে করে ক্রুদ্ধ ঘেউঘেউ রবে সম্মিলিত কণ্ঠে তাদের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করতে লাগল।

পুরোভাগে চলেছেন মেদবহুল বপুর উপরে প্যান্ট-কোট-টুপি চাপিয়ে কালো সাহেব সুজনবাবু, তারপর দীর্ঘদেহ খাঁটি গোরা ফ্রান্সিস এবং সর্বশেষে ধুতি ও ফানেলের শার্ট পরে কৃশতনু কালা আদমি আমি—বোঝা গেল, এই অভাবিত ত্রয়ীকে দেখে সেই বৈচিত্র্যহীন গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে বেশ কিঞ্চিৎ উত্তেজনা সঞ্চারিত হয়েছে।

অরণ্যের সামনে এসে সুজনবাবু প্রস্তাব করলেন, শিকারের সুবিধার জন্যে তিনি যাবেন একদিকে এবং ফ্রান্সিসের সঙ্গে আমি যাত্রা করব অন্যদিকে। তাই সই।

আমার বন্দুক পরহস্তগত। সুতরাং আমার আর করণীয় ছিল না বিশেষ কিছু। সুড়সুড় করে চললুম ফ্রান্সিসের পিছু পিছু।

অরণ্যের মধ্যে পদার্পণ করে ফ্রান্সিস বললে, 'দ্যাখো বয়, ইংল্যান্ড থেকে উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে এদেশে এসেছি, অন্তত একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগার বধ করব।'

আমি বললুম, 'শুনেছি এ বনে বাঘ আছে। কিন্তু আপাতত তার কথা ভুলে যাও, কারণ আমাদের কাছে আছে একটিমাত্র পাখিমারা বন্দুক।'

সে বললে, 'হুঁ, টাইগার এলে মোটেই জুত করে উঠতে পারব না। তবে আজ যদি দু-একটা হিমালয়ের পায়রা কি ময়ূর পাই, তাহলেও আমি সুখী হব।'

অরণ্য বলতে একটিমাত্র বন বুঝায় না। তার বিরাট অন্দরমহলে থাকে ছোটো-বড়ো-মাঝারি অনেক বন। বিশেষ করে তাদের বর্ণনা দেবার জায়গা এখানে নেই। এইটুকুই খালি বলে রাখি যে, প্রায় ঘণ্টা তিনেক ধরে আমরা দুজনে এ-বন সে-বন ঘুরে বেড়ালুম। কোথাও কোথাও বন ঘনসন্নিবিষ্ট লতাপাতায় ও ঝোপেঝাপে এমন দুর্ভেদ্য ও দুরধিগম্য যে পদচালনা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। মাথার উপরেও পত্রাবরণে শূন্যকে ঢেকে দলে দলে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে মহা মহা মহীরুহ, এমনকি সেখান থেকে মুখ তুলে দেখা যায় না আকাশ এবং সূর্যালোককেও।

হিমালয়ের পায়রা বা ময়ূর তো দূরের কথা, শিকারের উপযোগী কোনো পাখিরও দেখা বা সাড়া পাওয়া গেল না।

অবশেষে একটা ফর্দা জায়গায় গিয়ে আমরা হতাশ ভাবে দাঁড়িয়ে পড়লুম।

একটি ছোট্ট মাঠ। আমাদের কাছ থেকে হাত ত্রিশ তফাতে সামনেই রয়েছে কতগুলো ঝোপঝাপ এবং তার দুই দিকে উচ্চভূমির উপরে সারিবাঁধা নিবিড় জঙ্গল।

আকাশের দিকে চোখ তুলে দেখা গেল, সূর্য তখন পশ্চিম পথের যাত্রী।

আমি বললুম, 'ওহে, খানিক পরেই চারিদিক অন্ধকার হয়ে আসবে।'

ফ্রান্সিস রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বললে, 'চলো, এইবার ফেরা যাক।'

আচম্বিতে দুলে দুলে উঠল সামনের ঝোপটা। এবং সঙ্গে সঙ্গে সচকিতে জাগ্রত হয়ে উঠল আমাদের সর্বাঙ্গ।

ঝোপের দুলুনি দেখেই বেশ বোঝা গেল, তার মধ্যে প্রবেশ করেছে কোনো বড়ো জাতের জানোয়ার।

তৎক্ষণাৎ বন্দুক বাগিয়ে ধরে ফ্রান্সিস বললে, 'আমি ওকে দেখেছি। টাইগার!'

চমৎকার কথা,—আমি নিরস্ত্র এবং ফ্রান্সিসের হাতে একটা পাখিমারা বন্দুক! তখনকার মনের ভাব ভাষায় বর্ণনা না করাই ভালো!

আড়ষ্ট চক্ষে সেইদিকে তাকিয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, ঝোপটা আবার খুব নড়ে উঠল এবং পরমুহূর্তেই ঠিক যেন একটা হলদে রঙের বিদ্যুৎ শূন্যে লাঙ্গুল আস্ফালন করে ঝোপ থেকে লাফ মেরে পাশের উচ্চভূমির উপরে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দেখতে ভুল হল না—সেটা একটা চিতাবাঘ! বোধ করি সে আমাদেরও চেয়ে বেশি ভয় পেয়েছে।

কাহিনি এইখানেই শেষ করলে চলত, কিন্তু আমাদের বিপদের পাত্র পূর্ণ হয়নি তখনও কানায় কানায়!

বাঘটা পিঠটান দিলে, আমরাও সে স্থান ত্যাগ করলুম—ধীরে-সুস্থে নয়, রীতিমতো জোরকদমে!

কোথায় যাচ্ছি তা জানি না, কিন্তু পথ যে ভুলেছি সে বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি। মনের মধ্যে কেবল এক চিন্তা জেগে রইল—এই বিপজ্জনক স্থান থেকে যত দূরে যাওয়া যায় ততই ভালো!

বনের আলো ক্রমেই ম্লান হয়ে আসতে লাগল ধীরে, ধীরে, ধীরে।

মিনিট পঁচিশ দিশেহারার মতো পদচালনা করবার পর এমন এক অদ্ভুত জায়গায় এসে পড়লুম যেটাকে প্রায় শুঁড়িপথ বলা যেতে পারে। বেশ লম্বা পথ,—ঠিক বীথির মতো। দুই ধারে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বড়ো বড়ো গাছের পর গাছ এবং দেখতে যেন নিরেট জঙ্গলের প্রাচীর। উপরদিকটাও লতায় পাতায় ঢাকা, আকাশ দেখা যায় না। সেখানে দিনের বেলাতেও বাস করে সন্ধ্যার সান্দ্র অন্ধকার। অনেক দূরে পথের শেষে দেখা যাচ্ছে আলোকোজ্জ্বল বনভূমির খানিকটা।

কিন্তু সেই বাইরের দিক থেকে আমাদের দিকে দঙ্গল বেঁধে এগিয়ে আসছে কালো কালো কী জানোয়ার ওগুলো? মোষ নয়, গোরু নয়, কিন্তু ছোটো জানোয়ারও নয়।

দাঁতাল শূকর—অর্থাৎ বন্য বরাহ! ওদের খপ্পরে পড়লে আর রক্ষা নেই!

মরিয়ার মতো পাশের দিকে মারলুম এক লম্বা লাফ—কাপড়, জামা ও গায়ের চামড়া কাঁটাগাছের আলিঙ্গনে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল বটে, কিন্তু সশরীরে অবতীর্ণ হলুম জঙ্গলের ওপারে।

তারপরেই ফ্রান্সিসের আর্তনাদ শুনলুম—'কাঁটায় আমায় ধরেছে—জলদি এসো, জলদি!'

ফিরে দেখি ফ্রান্সিসও কাঁটাঝোপের নিবিড় আলিঙ্গনে বন্দি হয়ে ঠিক ক্রুশবিদ্ধ যিশুখ্রিস্টের মতো দুই হাত দুই দিকে ছড়িয়ে দিয়ে নিশ্চেষ্ট ভাবে দাঁড়িয়ে আছে!

বরাহের দল কাছাকাছি আসবার আগে তাড়াতাড়ি তাকে সেই অসহায় অবস্থা থেকে উদ্ধার করে আর-একদিকে পা চালিয়ে দিলুম।

অরণ্যের গর্ভে অন্ধকার যখন আরও ঘন হয়ে উঠেছে, সেই সময়ে কানে এল কোনো নদীর 'জলদলকলরব'। তারপরেই এসে দাঁড়ালুম একেবারে মুক্ত আকাশের তলায়।

অস্তগামী সূর্যের স্বর্ণকিরণ নিয়ে খেলা ও ছন্দে ছন্দে সংগীত সৃষ্টি করতে করতে বয়ে যাচ্ছে আনন্দময়ী স্রোতস্বতী।

তোর্সা নদী।

আহা, চোখ যেন জুড়িয়ে গেল। সেদিন তাকে দেখে কল্পনাও করতে পারিনি, এই তোর্সাই কোনোকালে প্রলয়ংকারী মূর্তি ধরে কুচবিহারের রাজধানী পর্যন্ত আক্রমণ করতে পারে।

বাদশার সমাধি

অনেক অনেককাল আগেকার কথা।

আমরা তিন বন্ধু গেছিলাম দিল্লিতে বেড়াতে। প্রতি বছর পূজার ছুটিতে আমরা তিন বন্ধু বাইরে কোথাও না কোথাও বেড়াতে যেতাম।

তখন এদেশে ব্রিটিশ রাজত্ব। বাংলা দেশ তখনও দু-ভাগ হয়নি।

সারা ভারতের লোক তখন পরম সুখে দিন কাটাচ্ছে। দেশে এত দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছিল না। এত খুন জখম ছিল না। এত গুণ্ডামি, রাহাজানিও ছিল না।

সাধারণ মানুষ নির্ভয়ে পথে বের হতে পারত।

তিনজনে আমরা টিকিট কেটে সেদিন সকালে তুফান মেলে উঠে বসলাম।

ওল্ড দিল্লিটা ছিল অনেকটা আমাদের চিৎপুর রোডের মতো। সরু সরু রাস্তা, সরু সরু গলি, পুরোনো আমলের সব ঘরবাড়ি। আর আমরা যেখানে উঠেছিলাম সেই 'ফতেপুরী' ছিল ওল্ড দিল্লি স্টেশনের খুব কাছে। ওল্ড দিল্লিতে দর্শনীয় ছিল লাল কেল্লা, জুম্মা মসজিদ, লৌহোরি গেট, আজমিরি গেট, কাশ্মীরি গেট প্রভৃতি।

ওল্ড দিল্লি থেকে বাসে উঠে আমরা নিউ দিল্লিতে গিয়ে সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট, ভাইসরয়ের বাড়ি এবং আরও নানা দ্রষ্টব্য স্থান দেখলাম। একদিন বাসে উঠে তিনজন গেলাম কুতুবমিনার দেখতে। এই ঐতিহাসিক কীর্তি দেখে খুব ভালো লাগল।

আমরা হোটেলে ফিরে এলাম। এবার হাওড়ার দিকে ফিরব বলে কথাবার্তা বলছি। ওই হোটেলের ম্যানেজার আমাদের প্রশ্ন করলেন—আমরা কী কী দর্শনীয় স্থান দেখলাম।

আমরা আগ্রা মথুরা থেকে দিল্লি পর্যন্ত যা যা দেখেছি সব তাঁকে বললাম। এমনকি সেকেন্দ্রার আকবরের সমাধি পর্যন্ত দেখেছি, বললাম।

তিনি তখন বললেন—আপনারা কুতুবপুর যাননি?

আমরা বললাম—না।

তিনি বললেন—পূর্ণিমার রাতে কুতুবপুরের বাদশার সমাধি একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তু।

আমরা প্রশ্ন করলাম—সেটা এখান থেকে কতদূর?

—বেশি দূর নয়—মাইল পনেরো-ষোলো। বাসে যেতে হয় কুতুবপুরে। স্টেশন থেকে বাস ছাড়ে। তারপর হেঁটে মাইল খানেক গেলেই বাদশার সমাধি।

আমরা প্রশ্ন করলাম—এ কোন বাদশা?

ম্যানেজার বললেন—মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর অনেক বাদশা দিল্লির সিংহাসনে আসীন হন—কিছুদিন পরেই তাঁরা আবার একে একে চক্রান্তের শিকার হয়ে নিহত হন। ইনি তাঁদের মধ্যে একজন। এই বাদশা ও তাঁর বেগমকে চক্রান্তকারীরা ওই কুতুবপুরেই হঠাৎ আক্রমণ করে হত্যা করে। তাঁদের সমাধিই ওখানে আছে।

একটু ভেবে ম্যানেজার বললেন—আগামি পরশু তো পূর্ণিমা আছে। ওই দিন সকালে খেয়ে-দেয়ে রওনা হবেন। সব দেখে পরদিন ফিরবেন।

আমরা রাজি হলাম।

* * *

গাইড ধরলাম আমরা কুতুবপুরে গিয়ে। সে আমাদের সঙ্গে চলল বাদশার সমাধিতে।

তখন সন্ধ্যা সাতটা। আমরা সমাধি থেকে কিছু দূরে একটা গাছের কুঞ্জের আড়ালে বসে রইলাম। মাঝে মাঝেই এখানে এমনি সব ঝোপ আছে। এদের বলে কুঞ্জ।

আমরা গাইডকে প্রশ্ন করলাম—এই সব কুঞ্জে সাপ-খোপ নেই তো?

—না, সব নিয়মিত পরিষ্কার করা হয়।

আমরা প্রশ্ন করলাম তাহলে এই সমাধি দেখতে কি তারই লোক আসে?

—হ্যাঁ আসে বটে, তবে শুধু পূর্ণিমায়। সবাই তো এ সমাধির কথা জানে না। তাই ভিড়ও হয় না।

আমরা চুপ করে বসে রইলাম।

আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে দেখি আজব কাণ্ড।

একটি সমাধি থেকে বাদশা এবং অন্য সমাধি থেকে বেগম বের হলেন।

বাদশা হাততালি দিলেন দু-বার।

সঙ্গে সঙ্গে কোত্থেকে একটা সুন্দর সিংহাসন বার করে আনল দুজন লোক

ধরাধরি করে। তারপর তারা একটা আলবোলা আনল। তাতে সুগন্ধি তামাক সেজে দিল।

বাদশা ও বেগম সিংহাসনে বসলেন।

বাদশা বুড়ুক বুড়ুক করে আলবোলা টানতে শুরু করলেন।

অপূর্ব সুমধুর গন্ধে চারদিক যেন আমোদিত হয়ে উঠল। তামাকের যে এত সুমধুর গন্ধ হয়, তা আমরা কল্পনাও করতে পারিনি।

তামাক খাওয়া শেষ হল।

তারপর বাদশা আবার দু-বার হাততালি দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হল বিশাল একটা সাদা ঘোড়া।

বাদশার পরনে ছিল দামি কুর্তা, পাজামা, মাথায় দামি উষ্ণীষ। তাতে অনেক হিরা, মণি, মুক্তা বসানো। কুর্তাতেও মাঝে মাঝে হিরা, চুনি, পান্না প্রভৃতি বসানো।

চাঁদের আলো সেগুলির উপরে পড়ে ঝকঝক করছিল যেন। বাদশার কোমরে খাপে মোড়া তলোয়ার।

বাদশা তারপর ঘোড়ার পিঠে উঠলেন।

বেগমকে ইশারায় সিংহাসনে বসে থাকতে বললেন।

বাদশা ঘোড়ায় চড়ে ভ্রমণে বের হলেন।

খটাখট খটাখট করে শব্দ তুলে ঘোড়া ছুটে চলল বাদশাহকে পিঠে নিয়ে।

একটু পরে তারা অদৃশ্য হল।

দুজন বাঁদী এসে বেগমের হাত পা টিপতে লাগল।

আমাদের চোখের সামনে একের পর এক এই সব দৃশ্য দেখতে লাগলাম। এ যেন কোনো যাত্রা-নাটকের অভিনয় দেখছি।

* * *

মিনিট কুড়ি-পঁচিশ কেটে গেল।

তারপর আবার দূর থেকে শোনা গেল খটাখট শব্দ।

দেখা গেল বাদশা ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে আসছেন।

এই সময় আমার কেমন যেন মনে হল, এই সব কিছু সাজানো নয় তো? কতকগুলি লোক হয়তো এসব অভিনয় করছে।

আমি লাফ দিয়ে উঠে গিয়ে বাদশার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে কুর্নিশ করলাম।

বাদশা তাকালেন আমার দিকে।

কেমন যেন নিষ্প্রভ দৃষ্টি। মরা কোনও জন্তু-জানোয়ারের চোখের মতো। সেই চোখের দৃষ্টি স্থির, চোখের পাতা নড়ছে না।

বাদশা বললেন—কোন হো তুম?

আমি বললাম—ম্যায় হুঁ এক গরিব ভিখারি বান্দা। বাদশাকো পাশ কুছ ভিখ মাঙতা হুঁ।

সঙ্গে সঙ্গে বাদশা পকেটে হাত দিয়ে কতকগুলি সোনার আমলকী বের করে আমার দিকে ছুড়ে দিলেন।

সেগুলি ছিটিয়ে পড়ল।

আমি আমলকীগুলো কুড়িয়ে পকেটে রেখে দিলাম। মনে মনে ভাবলাম এতগুলি সোনার আমলকীর দাম কয়েক হাজার টাকা হবে।

কিন্তু এদিকে কবরের কাছের সেই বাদশা ও বেগমের মূর্তি এবং তাঁদের সব সঙ্গীসাথিদের মূর্তি যেন হঠাৎ কোথায় মিলিয়ে গেল।

* * *

গাইড ছোকরা আমার কাছে এসে বললে—এ আপনি কী করলেন?

—কেন? কী হল?

আপনার জন্যে ওরা অদৃশ্য হল। তা না হলে আপনারা কত কী দৃশ্য দেখতে পেতেন।

আমি বললাম—মৃত আত্মাদের এই সব দৃশ্য দেখে লাভ কী?

গাইড বললে—এই সব দেখতেই তো লোকে আসে এখানে।

আমি বললাম—তার চেয়ে আমি যে আমলকী পেয়েছি, তা অনেক মূল্যবান।

গাইড ছোকরা কিছু বললে না—শুধু মৃদু হেসে উঠল।

আমরা ফিরে চললাম।

পরদিন ভোর পর্যন্ত একটা ছোট্ট চায়ের দোকানে বসে গল্প করে কাটালাম। শুনলাম, প্রতি পূর্ণিমার রাতে চায়ের দোকানটা সারা রাত খোলা থাকে।

অবশেষে ভোরের বাসে ফিরে এলাম দিল্লি।

হোটেলের ম্যানেজার আমাদের বললেন—কেমন দেখলে সব কিছু?

আমরা তখন সব ঘটনা বর্ণনা করলাম।

তিনি তখন বললেন—কই দেখি আমলকীগুলো।

আমি পকেট থেকে সেগুলো বের করতে গেলাম।

কিন্তু এ কী?

পকেটে আমলকী একটাও নেই—তার বদলে সব মাটির খোলার টুকরো। যেন কোনো ভাঙা মাটির হাঁড়ি বা কলসির টুকরো টুকরো চাকতি।

বিস্ময়ে আমরা সকলেই হতবাক হয়ে গেলাম।

ঐতিহাসিক উপাখ্যান

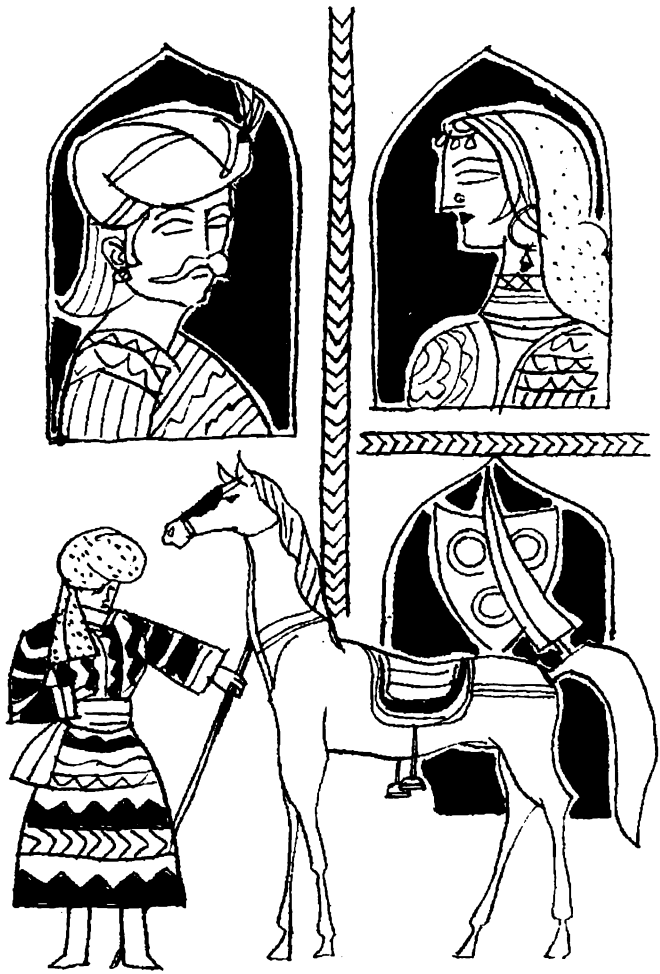

তিন সম্রাটের ত্র্যহস্পর্শ-যোগ

বিষবৃক্ষের বীজ

দিগ্বিজয়ী তৈমুর লং এদিকে-ওদিকে-সেদিকে লুব্ধ দৃষ্টি সঞ্চালন করলেন, কিন্তু পৃথিবীর কোথাও একজন মাত্রও প্রতিদ্বন্দ্বী দেখতে পেলেন না।

—গর্বিত শ্বেতাঙ্গদের দেশ ইউরোপেও নয়। তাঁর হাতে রুশিয়ার ভয়াবহ দুরবস্থা দেখে শ্বেতাঙ্গদের প্রাণ ভীষণ ভয়ে থরহরি কম্পমান।

তখনকার ইউরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী নরপতি ছিলেন স্পেনের অধিপতি। তিনি তো ভেট পাঠিয়ে মোসাহেবি করতে চান।

তৈমুর লং স্পেনকে আশ্বাস দিয়ে বলেন,—আচ্ছা, আচ্ছা, তুমি নির্ভয় হও। সমুদ্রে বড়ো মাছের সঙ্গে ছোটো মাছরাও বাস করতে পারে।

আচম্বিতে তাঁর দৃষ্টি আবিষ্কার করলে টিকিধারী চিনাদের মুল্লুক। কেবল ওকেই জয় করতে বাকি আছে। তৎক্ষণাৎ ঘোর রবে হতে লাগল ঘন ঘন তূর্যধ্বনি—বাজতে লাগল ডিমিডিমি রণডঙ্কা—ধেয়ে এল মেদিনী থরথরিয়ে পঙ্গপালের মতো সৈন্যদলের পর সৈন্যদল।

তৈমুর লং খাপ থেকে তরোয়াল খুলে পদভারে মাটি কাঁপিয়ে সদম্ভে অগ্রসর হলেন। বার্ধক্যে তিনি তখন প্রায় অন্ধ।

তারপর—

তারপর বেশ খানিকদূর এগিয়ে গিয়ে সর্বজয়ী মৃত্যুর আলিঙ্গনে আবদ্ধ হলেন—পথের উপরে তাঁর অসাড় হাত থেকে খসে পড়ল দিগ্বিজয়ীর রক্তস্নাত তরবারি। ধনেপ্রাণে বেঁচে গেল চিনদেশ। সেখানে আর হাজার হাজার নরমুণ্ড সাজিয়ে পিরামিড গড়া হল না। কিন্তু এ-সব কথা সবিস্তারে বলা হয়েছে মৎলিখিত 'ভগবানের চাবুক' গ্রন্থে।*

দেশের পর দেশ রক্তপ্লাবনে ডুবিয়ে, নরমুণ্ডের পিরামিডের পর পিরামিড সাজিয়ে তৈমুর লং যে বিষবৃক্ষের বীজ বপন করেছিলেন এইবার ক্রমে ক্রমে তার ফলফসল ফলতে আরম্ভ করলে।

তাঁর বংশধররা সিংহাসন নিয়ে সাংঘাতিক বিবাদ করতে লাগল—সহোদর আর সহোদরকে মানলে না। পৃথিবীর নানা দেশের রাজপরিবারে বিভিন্ন সময়ে এমন ব্যাপার দেখা গেছে বটে, কিন্তু আর কোনো বংশেই ব্যাপারটা এমন ধারাবাহিকভাবে অবশ্যপালনীয় ঐতিহ্যের মতো হয়ে ওঠেনি।

---

*হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলীর দ্বাদশ খণ্ড দেখুন—সম্পাদক।

তৈমুরের বংশে পুরুষানুক্রমে বারংবার দেখা গিয়েছে ভাইয়ে ভাইয়ে হানাহানি—এমনকি সে বংশে পিতাপুত্রের সম্পর্কও প্রায়ই অহি-নকুল সম্পর্কের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ফলে তৈমুরের মৃত্যুর পরেই তাঁর বিপুল সাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড ও ছারখার হয়ে যায়।

তাঁর এক উত্তরপুরুষ রাজপুত্র বাবর স্বদেশ ছেড়ে আফগানিস্তানে গিয়ে রাজ্য স্থাপন করলেন এবং পরে তিনিই হলেন ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।

তাঁর পুত্র হুমায়ুনের কোনো ভাই ছিল না। তাই বোধ করি সিংহাসন নিয়ে কোনো মারামারি কাটাকাটি হয়নি।

তাঁর পুত্র আকবরও পিতার একমাত্র সন্তান। সুতরাং ভ্রাতৃবিরোধের প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু তিনি সন্তান-সৌভাগ্য লাভ করতে পারেননি। তাঁর পুত্র সেলিম (পরে জাহাঙ্গির নামে সিংহাসনে আরোহণ করেন) বিদ্রোহী হয়েছিলেন।

তারপর থেকেই কাকে রেখে কাকে বাদ দেব? পিতৃদ্রোহ ও ভ্রাতৃবিরোধ মোগল রাজবংশে যেন একটা বাঁধাধরা রীতি হয়ে ওঠে—প্রজাদের সঙ্গে বেমালুম মিশে যায় রাজরক্ত এবং এসব কথা এতবার অসংখ্য ঐতিহাসিক-গ্রন্থে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে যে, এখানে তা নিয়ে বাক্যব্যয় করা বাহুল্যমাত্র।

যে সাজাহানের শেষ জীবনের ট্রাজেডি আমাদের চক্ষু অশ্রুজলে পূর্ণ করে তোলে, তিনিও যৌবনে পিতার আজ্ঞাবহ পুত্রের মতো জীবনযাপন করেননি। বিদ্রোহী হয়ে পিতা জাহাঙ্গিরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন, পরে যুদ্ধে হেরে ভালোমানুষ সাজতে বাধ্য হয়েছিলেন। এবং তিনি ভ্রাতৃহত্যাতেও হস্ত কলঙ্কিত করতে ছাড়েননি।

তাঁরই যোগ্য পুত্র ঔরঙ্গজিব। বৃদ্ধ ও অক্ষম পিতাকে শেষজীবনের কয়েকটা বৎসরের জন্যে কারাগারে নিক্ষেপ করে তিনি রক্তের মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন। দুই সহোদরকে হত্যা ও আর এক সহোদরকে চিরদিনের মতো ভারত থেকে বিতাড়িত করে তবে ক্ষান্ত হয়েছিলেন।

যথার্থপক্ষে ধরতে গেলে মোগল রাজবংশের শেষ পরাক্রান্ত সম্রাট হচ্ছেন বাহাদুর শাহ। সিংহাসন পাবার পর তাঁর রাজত্বকাল দীর্ঘস্থায়ী হয়নি বটে, কিন্তু ঔরঙ্গজিবের পুত্র হয়ে সিংহাসন অধিকার করার সময়ে তিনিও বংশগত ধারা বজায় রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। তবে তিনি প্রায় ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ভ্রাতৃবিরোধে ও খুনখারাবিতে যোগদান না করে পারেননি।

তারপরেও মোগল রাজপরিবারে ভ্রাতৃবিরোধ ও খুনোখুনি একটা অবশ্যম্ভাবী

কাণ্ড হয়ে ওঠে এবং যে কারণে তৈমুরের সাম্রাজ্য ছারখার হয়ে যায়, তৈমুরের বংশধরদের নির্বুদ্ধিতার জন্যে মোগল সাম্রাজ্যেরও অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় ঠিক সেই কারণেই।

রক্তাক্ত বাদশাহি প্রহসন

রক্তাক্ত বাদশাহি প্রহসন? মিলনান্ত নয়—বিয়োগান্ত। অথচ প্রহসন। কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হয়নি। একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দি।

বাহাদুর শা-র মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্রদের মধ্যে অনেক মারামারি, কাটাকাটি ও খুনোখুনি চলল, তারপর ময়ূরসিংহাসনের উপরে চেপে বসলেন তাঁর পুত্র জাহান্দার শা। ঘটা হল, বাজনা বাজল, আলোর মালা দুলল।

তারপর মাস দুই যেতে না যেতেই সকলের বুঝে নিতে দেরি লাগল না যে, ভারতসম্রাটের মুকুট ধারণ করেছেন একটা সিদ্ধিখোর, বদ্ধমাতাল, মাথাপাগলা, বদখেয়ালি আস্ত ভাঁড়।

প্রথমেই তিনি ইমতিয়াজমহল উপাধি দিয়ে একটা সাধারণ নাচনাওয়ালীকে সম্রাজ্ঞী সাজিয়ে নিজের পাশে এনে বসালেন। লালকুঁয়ার নামে ইতিহাসে সে কুখ্যাত হয়ে আছে। তাদের উদ্ভট সব কীর্তিকথা বলবার জায়গা এখানে নেই, সংক্ষেপে মাত্র দুই-চারটির উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে।

হঠাৎ একদিন লালকুঁয়ারের খেয়াল হল জলে ডুবে মরবার সময়ে লোকে কী করে তা দেখবার জন্যে।

সম্রাট জাহান্দার শা বললেন, 'এ আর এমন শক্ত কথা কী? এখনই তোমাকে দেখাচ্ছি।'

দুর্গপ্রাসাদের অনতিদূরে প্রবহমানা যমুনা নদী এবং নদীর বুকে নৌকায় বসে এপার থেকে ওপারে ভেসে চলেছে যাত্রীভরা নৌকাগুলো।

সম্রাট হুকুম দিলেন—'এই সেপাইরা, একখানা নৌকো এখনই ডুবিয়ে দিয়ে আয়!'

সেপাইরা হুকুম তামিল করতে ছুটল। লালকুঁয়ারকে নিয়ে সম্রাট লালকেল্লার উঁচু ছাদে গিয়ে উঠলেন—সেই উপভোগ্য দৃশ্য দেখে হেসে গড়াগড়ি দেবার জন্যে! তারপরের দৃশ্য আর বর্ণনা না করাই ভালো।

সম্রাট একদিন রাজপথে বেরিয়ে পড়লেন—ঘোড়ার বা হাতির পিঠে বা তাঞ্জামে চড়ে নয়, দস্তুরমতো, হ্যাঁকোচ-প্যাঁকোচ গোরুর গাড়িতে চেপে! চললেন

কোথায়? সাধারণ সরাবখানায় ঢুকে ছোটোলোকদের সঙ্গে মিলেমিশে একেবারে ছোটোলোকের মতো মদ্যপান করতে!

একদিন শুঁড়িখানায় মদ খেতে গিয়ে সম্রাট আর ফিরে এলেন না। পরদিন সকালে লালকেল্লায় হুল্লোড় আর হুলুস্থুলু—বাদশা লোপাট, বাদশা লোপাট! সেপাইরা দলে দলে পথে পথে বেরিয়ে পড়ে খোঁজাখুঁজি করতে করতে অবশেষে দেখে, ভারতসম্রাট জাহান্দার শা মদে বেহুঁশ হয়ে একখানা ভাড়াটে গাড়ির মধ্যে দিব্য নিদ্রাসুখ উপভোগ করছেন! ছোটোলোক ভবঘুরে ইয়াররাও মাতাল হয়ে তাঁকে গালি দিলে বা লাথি মারলেও সম্রাট রাগ করতেন না!

আর একদিন। দিল্লি শহরের এক জায়গায় একটা উঁচু পাথরের ঢিপি ছিল, তার ঢালু গা খুব তেলা। রাস্তার ছোটো ছোটো ছেলেরা এই ঢিপির মসৃণ গা বয়ে হড়কে নামতে নামতে চারিদিক আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত করে তুলত।

একদিন শিশু ও বালকরা একটি আমোদে মেতে আছে। হঠাৎ সচমকে তারা দেখলে, জমকালো পোশাকপরা এক বুড়োখোকা আহ্লাদে আটখানা হয়ে নাচতে নাচতে এসে শিশুদের খেলায় যোগদান করলে। বুড়োখোকার বয়স তখন পঞ্চাশ! তিনিই দিল্লির বাদশাহ শুনে শিশুরা একেবারে হতভম্ব!

দুনিয়ার আর কোনো দেশে এমন আজব বাদশাহ আর কেউ দেখেছে?

ডাকু নাদির শা মর্যাদাহীন ময়ূরসিংহাসন লুটে নিয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু তার অনেক আগেই হাজার হাজার মানুষের রক্তে দুই হাত ডুবিয়ে এই নৃশংস বুড়োখোকা ময়ূরসিংহাসনে আরোহণ করে তার সমস্ত গৌরব ধুলায় মিশিয়ে দিয়েছিল—এ সব প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয় এবং প্রহসনই শেষটা বিয়োগান্ত দৃশ্যে পরিণত হয়েছিল। দিল্লি জাহান্দার শাহকে পুরো এক বৎসরও সহ্য করতে পারেনি—হত্যাকারীরা গলা টিপে ও লাথি মেরে তাঁকে জাহান্নমে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

শেষপর্যন্ত এমনি রক্তাক্ত প্রহসনের ভিতর দিয়েই দিল্লিতে একদিন নকল ময়ূরসিংহাসনের উপরে সাজিয়ে-রাখা নকল ও অসার বাদশাহির ঝকমকানি নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

এইবারে ঔরঙ্গজিবের উত্তরাধিকারী মহম্মদ মুয়াজ্জাম বা শা আলম, বাহাদুর শাহের সিংহাসন অধিকারের ব্যাপার নিয়ে একটু বিস্তৃত আলোচনা করব। তাহলেই পাঠকরা বুঝতে পারবেন তৈমুরের রোপিত বিষবৃক্ষের ফল কী ভাবে বারে বারে সমগ্র মোগল রাজবংশে ছড়িয়ে পড়েছিল—মোগল রাজকুমাররা শুনে বা দেখে বা ঠেকেও কিছুই শিখতে পারেননি—এমনকি এই অভিশপ্ত বংশে জন্মগ্রহণ করে মিষ্টস্বভাব ও দয়ামায়ার অধিকারী হয়েও বাহাদুর শা-কে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও রক্তপ্লাবনে গা ভাসাতে হয়েছিল।

সাবধানী ঔরঙ্গজিব

ঔরঙ্গজিবের পাপী মন, পাছে স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিজেকেই ভোগ করতে হয়, সেই ভয়ে সর্বদাই উদ্বিগ্ন হয়ে থাকত। একে পিতৃদ্রোহের ধাক্কা মৃত্যুর অনেক আগেই তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল, তার উপরে তিনি নিজের পিতাকেও যে ভাবে আগ্রা দুর্গে বহুকালের জন্যে বন্দি করে রেখেছিলেন, তাঁর নিজের পুত্রদেরও কেউ তাঁর সঙ্গে যদি সেই রকম অসদাচরণ করে, সেই ভয়ে পুত্রদের কারুকেই কাছে না রেখে তিনি দূরে-দূরান্তরে থাকতে বাধ্য করেছিলেন। তিনি তাঁর কোনো পুত্রকেই বিশ্বাস করতেন না—যদিও ছোটোছেলে কামবক্সের উপরে তাঁর প্রাণের টান ছিল একটু বেশি মাত্রায়। থাক প্রাণের টান, তবু সাপের বাচ্চা তো!

তাঁর সন্তানসংখ্যা দশ—পাঁচ ছেলে, পাঁচ মেয়ে। মেয়েদের কথা ধরব না, ঔরঙ্গজিবের মৃত্যুর সময়ে দুই পুত্রও বর্তমান ছিল না। বড়োছেলে মহম্মদ সুলতান যৌবনসীমা পার হয়েই অপুত্রক অবস্থায় মারা পড়েন এবং চতুর্থ পুত্র আকবর বিদ্রোহী হয়ে প্রথমে রাজপুতদের সঙ্গে যোগ দেন, তারপর শিবাজির পুত্র শম্ভুজির দলে ভিড়ে সুবিধা করতে না পেরে অবশেষে পারস্য দেশে পালিয়ে যান ও পারস্যপতির অন্নদাস হয়ে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ঔরঙ্গজিব পুত্রদের অকারণে সন্দেহ করতেন না। আকবরের পর তাঁর দ্বিতীয় পুত্র ও যুবরাজরূপে বিবেচিত মহম্মদ মুয়াজ্জামও (পরে বাহাদুর শাহ) পিতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে প্রায় সাত বৎসরকাল বন্দিজীবন যাপন করে পরে মুক্তিলাভ করেন। পিতার মৃত্যুকালে তিনি ছিলেন সুদূর কাবুলের শাসনকর্তা।

তৃতীয় পুত্র আজম শাহ কারাগারে নিক্ষিপ্ত না হলেও কোনো কোনো ষড়যন্ত্রের সঙ্গে তাঁরও যোগসাজস ছিল। তবু নারাজ মনেও ঔরঙ্গজিব তাঁকে কতকটা নিজের কাছাকাছি থাকতে দিয়েছিলেন।

ছোটোছেলে মহম্মদ কামবক্স নিজেকে পিতার প্রিয়পাত্র জেনে বয়সে প্রৌঢ় হয়েও ব্যবহার করতেন আদুরে দুলালের মতো। তিনি বিজাপুরের সুবাদারের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দূরে দূরে তিন ভ্রাতার অবস্থান, কারুর সঙ্গে কারুর ঝগড়া করবার বিশেষ সুবিধা নেই।

নিজের মৃত্যুর পর যাতে ভ্রাতৃবিরোধ না হয় সেজন্যেও ঔরঙ্গজিব অল্প মাথা ঘামাতেন না—কারণ কথিত আছে তিনি নিজের সাম্রাজ্যকে বিভিন্ন সুবায় বা প্রদেশে বিভক্ত করে তিন পুত্রকে দান করে গিয়েছিলেন। এই উইলখানি ঔরঙ্গজিবের মৃত্যুর পর তাঁর উপাধানের তলায় পাওয়া যায়। সাম্রাজ্য ভাগ

হয়েছিল এই ভাবে: যুবরাজ মুয়াজ্জাম পাবেন উত্তর-পশ্চিমের বারোটি প্রদেশ এবং দিল্লি হবে তাঁর রাজধানী। আজম শাহ্ পাবেন দক্ষিণের ছয়টি প্রদেশ এবং আগ্রা হবে তাঁর রাজধানী। বিজাপুর ও হায়দ্রাবাদ দুইটি প্রদেশ নিয়ে কামবক্স যদি খুশি থাকেন, তাহলে কেউ যেন তাঁর উপরে কোনো তম্বিতাম্বি না করেন।

কিন্তু নিষ্ঠুর নিয়তি ঔরঙ্গজিবকে ক্ষমা করলে না, জীবনে যত মহাপাপ তিনি করেছিলেন, মৃত্যুর পরেও তাঁর পরলোকগত আত্মার উপরে সে সব অনাচার ও দুষ্কৃতি চেপে বসেছিল দুঃসহ বোঝার মতো!

ঔরঙ্গজিব শেষশয্যা গ্রহণ করলেন। পিতা সাজাহানের রোগশয্যাকে পুত্র হয়েও তিনি কেমন করে বন্দিশালার মধ্যে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন ঔরঙ্গজিব তা ভুলতে পারেননি। নিজের অন্তিমকালে পাছে তারই পুনরাভিনয় হয়, সেই ভয়ে নিকটস্থ পুত্র আজম শাহকে তিনি মালোয়ার বিদ্রোহ দমনের অছিলায় দূরে যাত্রা করতে হুকুম দিলেন।

আজম শাহের শম্বুকগতি

কিন্তু সাপের বাচ্চা সাপ ছাড়া আর কিছু হয় না। পিতার ছল ধরে ফেলতে আজম শাহের বিলম্ব হল না। তিনি বুঝতে পারলেন, পিতার শেষদিনের আর দেরি নেই। লোক দেখানো হুকুম তামিল করবার জন্যে তিনি যুদ্ধযাত্রা করলেন বটে, কিন্তু শম্বুকগতিতে। চার দিনে মোট চল্লিশ মাইল!

গোদাবরী নদীর তীরে তাঁবু ফেলবার পর আজম শাহ্ খবর পেলেন ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দের ৩রা মার্চ তারিখে অর্ধ শতাব্দীর উপর রাজত্ব ভোগ করবার পর ঔরঙ্গজিব রাজদণ্ড ফেলে দিয়ে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন।

মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত—কে আর এখন বোকার মতো যুদ্ধযাত্রা করে, নিজের আখের ভুললে চলবে না।

মন্ত্রীরাও আজম শাহকে পিতার শেষকৃত্য করবার জন্যে তাড়াতাড়ি ফিরে আসবার জন্যে অনুরোধ করলেন।

আজম শাহের দেরি হল না। পিতৃহারা পুত্র চোখের জলে বুক ভাসাতে পিতার মৃত্যুর পরের রাত্রেই মৃত্যুশয্যার পাশে এসে পড়লেন এবং সাধারণ লোকের মতোই অশ্রুজড়িত ভগ্নস্বরে 'পিতা! পিতা!' বলে চিৎকার করতে লাগলেন। সবাই বলাবলি করতে লাগল—ওঃ, রাজপুত্র কী পিতৃভক্ত!

শেষকৃত্যের তোড়জোড় করতে করতে আজম শাহ্ কিন্তু নিজের কাজ গোছাতে

ভুললেন না! পিতার দেহ সমাধিস্থ করেই তিনি নিজেকে গোটা হিন্দুস্থানের 'সম্রাট' বলে ঘোষণা করে দিলেন। প্রকাশ্যভাবে রাজমুকুট ধারণ করে নিজের নাম গ্রহণ করলেন—'আবুল-ফয়েজ, কুতবউদ্দীন, মহম্মদ আজম শা, গাজী।' উপস্থিত সমস্ত প্রধান প্রধান রাজকর্মচারী তাঁর আনুগত্য স্বীকার করলেন—তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাত সেনাপতি জুলফিকার খাঁ পর্যন্ত।

আজম শাহের নামে যে সব মুদ্রা প্রস্তুত হল তার উপরে লেখা রইল—সম্রাট আজম শাহ।

মন্ত্রীরা পরামর্শ দিলেন, আগে কামবক্সকে দমন করা হোক।

আজম শাহ বললেন, 'উঁহুঁ, আগে মুয়াজ্জাম। যদিও সে নয় দারাশেকো, তাকে শায়েস্তা করতে হলে একগাছা যষ্টিই যথেষ্ট, তবু আগে তার লম্ফঝম্প বন্ধ করা দরকার। চলো হিন্দুস্থানের দিকে।'

আজম শাহ আমেদনগর থেকে সসৈন্যে যাত্রা করলেন হিন্দুস্থানের পথে।

মুয়াজ্জামের সমস্ত গতিবিধির খবর আজম শাহের কাছে এসে পৌঁছতে লাগল। সর্বাগ্রে তাঁর নজর গেল আগ্রার দিকে। তিনি ছুটলেন আগ্রা দুর্গ দখল করবার জন্যে।

এর কারণও ছিল। তাঁর বা মুয়াজ্জাম, কারুর হাতেই উচিতমতো টাকাকড়ি ছিল না। আগ্রা দুর্গের ভাণ্ডারে রক্ষিত আছে কয়েকজন মোগল সম্রাটের রাজত্বকালে সঞ্চিত কোটি কোটি টাকা মূল্যের বিপুল ধনরত্ন। যে আগে সেই ধনরত্নের ভাণ্ডার দখল করতে পারবে, কেউ পারবে না তার অগ্রগতি রোধ করতে।

অতএব আগ্রা চলো, আগ্রা চলো!

মুয়াজ্জাম শা আলম

সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয়, নরহন্তা তৈমুরের বংশে জন্মগ্রহণ করলেও মুয়াজ্জাম ছিলেন না রক্তের ভক্ত। তিনি ছিলেন যেন অনেকটা হিন্দুদের দৈত্যসন্তান প্রহ্লাদের মতো।

পিতাকে কারারুদ্ধ এবং দারাকে হত্যা করেও ঔরঙ্গজিবের রক্তপিপাসা তৃপ্ত হয়নি, তারপরেও তিনি দাদার রক্তাপ্লুত কাটামুণ্ড পর্যন্ত স্বচক্ষে দর্শন করতে ছাড়েননি। এবং আর এক অগ্রজ মুরাদের সাহায্যে যুদ্ধজয়ী হয়েও তাঁকে কারাগারে পাঠিয়ে বিষ প্রয়োগে হত্যা করতেও তিনি সংকুচিত হননি। তাঁর কোনো অতিভক্তও

বলতে পারবে না, এই সব মহা অপকর্মের পরেও ঔরঙ্গজিব জীবনে কোনোদিন অনুতপ্ত হয়েছিলেন।

কিন্তু ঔরঙ্গজিবের পুত্র হয়েও মুয়াজ্জামের মন ছিল ভিন্ন ধাতুতে গড়া। তার মধ্যে ছিল দয়ামায়া ও পারিবারিক স্নেহ-ভালোবাসার স্থান। যুবরাজরূপে রাজধর্মে দীক্ষিত হয়ে রাজ্যরক্ষা এবং আত্মরক্ষার জন্যে তাঁকে তরবারি ধারণ করতে হয়েছিল বটে, কিন্তু তিনি কোনোদিন দেখেননি ভ্রাতৃহত্যার বিকট দুঃস্বপ্ন। বরং তিনি সহোদরদের সঙ্গে মিলেমিশে নিরুপদ্রব জীবনযাপন করতেই চেয়েছিলেন। পরের ঘটনাবলীই স্পষ্টভাবে প্রমাণিত করবে এই সত্য।

আজম শাহ হিন্দুস্থানের দিকে সসৈন্যে ছুটে আসছেন আগ্রা দুর্গের রত্নভাণ্ডার লুণ্ঠন করবার জন্যে, এই সংবাদ পেয়েই মুয়াজ্জাম তাঁর রাজ্যলোভী ভ্রাতাকে পত্র লিখে জানালেন, তুমি কেন বৃথা রক্তপাত করবে? তুমি কি জানো না যে যুবরাজরূপে পিতা আমাকেই নির্বাচন করেছেন এবং তোমাকে দান করেছেন দক্ষিণের কয়েকটি সুবা? এতেও তুমি যদি তুষ্ট না হও তাহলে এর উপরে আমি গুজরাট ও আজমির প্রদেশও ছেড়ে দিতে রাজি আছি।

কারুর কারুর মতে মুয়াজ্জাম আরও বলেছিলেন যে, এতেও যদি তোমার মন না ওঠে, তাহলে অগণ্য নিরপরাধ লোককে যুদ্ধক্ষেত্রে হত্যা না করে এসো, আমরা দুইজনে স্বহস্তে তরবারি নিয়ে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হই—যে জিতবে সেইই পাবে হিন্দুস্থানের সিংহাসন।

এই প্রস্তাব শুনে আজম শাহ রেগে টং হয়ে উঠলেন বেনিয়ার (তিনি তাঁর দাদাকে বেনিয়া নামেই ডাকতেন) স্পর্ধা দেখে।

তিনি বললেন, 'বেনিয়া দাদা ভালো লেখাপড়া জেনেও শেখ সাদি মিয়াজির 'গুলিস্তানে'র এই উক্তি বোধ হয় ভুলে গেছেন—'দশজন গরিব লোক একখানা লেপ গায়ে দিয়েই সুখে ঘুমোতে পারে, কিন্তু এক রাজ্যের মধ্যে দুই রাজার স্থান সংকুলান হয় না।'

'দু-খানা তরবারি কি একখানা খাপে ঢোকে? ভাগাভাগি করতে হলে একমাত্র শর্তে আমি সম্মত হতে পারি। সকলের ভাগ সমান হওয়া উচিত—একজন নিজের পাতে বেশি ঝোল টানবে কেন? আমি চাই এইরকম ভাগাভাগি (এখানেও তিনি কবি-কথিত বচন উদ্ধার করলেন)—'আমার অংশে থাকবে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত, আর তুমি পাবে ছাদের উপর থেকে শূন্যতল পর্যন্ত।'

তারপর সগর্বে বুক চিতিয়ে জামার আস্তিন গুটিয়ে দুই বাহু প্রসারিত করে বললেন, 'যুদ্ধক্ষেত্রে আবার আমাদের দেখা হবে।'

মুয়াজ্জাম দুঃখিত মনে উপলব্ধি করলেন, এমন অবস্থায় যুদ্ধ অনিবার্য। তখন তিনি আত্মরক্ষার জন্যে যুদ্ধের তোড়জোড় করতে লাগলেন—দারার শোচনীয় পরিণাম তিনি ভোলেননি। আত্মরক্ষা করতে না পারলে তাঁকেও অপঘাতে মরতে হবে—ঘাতকের খড়্গাঘাতে ভ্রাতাকে নিজের মুণ্ডচ্ছেদ করার অবসর দেবার আগ্রহ তাঁর ছিল না। কোনো মানুষেরই তা থাকে না।

আগ্রার মতো দিল্লির লালকেল্লার মধ্যেও প্রভূত ধনরত্ন সঞ্চিত ছিল। যে এই দুইটি কেল্লা আগে দখল করতে পারবে তার জয়ের আশা সুনিশ্চিত।

দুজনেরই যাত্রাপথ প্রায় সমান সমান। আজম শাহকে সাতশো মাইল অতিক্রম করে আগ্রায় পৌঁছতে হবে, আর মুয়াজ্জামকে যেতে হবে সাতশো পনেরো মাইল।

দুজনেই লোকলশকর নিয়ে যথাসম্ভব শীঘ্রগতিতে অগ্রসর হলেন। এবং প্রথম চালে জিতে গেলেন মুয়াজ্জামই। সর্বাগ্রে তিনি দিল্লি এবং তারপর আগ্রা দখল করে বসলেন।

গোয়ালিয়র পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে আজম শাহ এই দুঃসংবাদ শ্রবণ করলেন।

তারপর শোনা গেল, আশি হাজার সৈন্য নিয়ে মুয়াজ্জাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসছেন।

কিন্তু এজন্যে তিনি একটুও চিন্তিত হলেন না, কারণ তাঁর অধীনে ছিল পঁয়ষট্টি হাজার অশ্বারোহী ও পঁয়তাল্লিশ হাজার বন্দুকধারী পদাতিক সৈন্য। সৈন্যবলে তিনিই অধিকতর শক্তিশালী। তার উপরে মুয়াজ্জামকে কোনোদিনই তিনি মানুষের মতো মানুষ বলে গণ্য করতেন না—সে লড়াইয়ের কী জানে? একখানা লাঠি নিয়ে তেড়ে গেলেই সে তরোয়াল ফেলে পালাবার পথ পাবে না! যুদ্ধের প্রথম নীতি হচ্ছে, শত্রুকে তুচ্ছ মনে না করা। এই নীতি না মেনে কুরুক্ষেত্রে দুর্যোধনের কী পরিণাম হয়েছিল সকলেই তা জানে। এখন ওই নীতি অগ্রাহ্য করে দর্পী আজম শাহও কী বিপদের খাঁড়ার তলায় গিয়ে দাঁড়ালেন, এইবারে আমরা তা দেখতে পাব।

জাজাউয়ের যুদ্ধ

অতঃপর যে যুদ্ধ হয় আমরা খুব সংক্ষেপে তা বর্ণনা করব। ব্যাপারটা বিয়োগান্ত হলেও এর মধ্যেও প্রহসনের অভাব নেই।

মুয়াজ্জাম দিল্লি ও আগ্রা দুর্গ দখল করেছেন, এই খবর পেয়েই আজম শাহ

যেন খেপে গেলেন। তার উপরে তাঁর দ্বিতীয় ভ্রাতুষ্পুত্র এবং বাংলা ও বিহারের সুবাদার মহম্মদ আজিমও বহু সৈন্য ও প্রভূত ধনসম্পত্তি নিয়ে পিতার সঙ্গে যোগদান করেছেন শুনে প্রচণ্ড রাগে তিনি আর সব কথা ভুলে গেলেন।

ভারী ভারী কামান ও অতিরিক্ত যা-কিছু মাল পিছনে ফেলে রাখবার হুকুম হল—মুয়াজ্জাম লড়াই করতেই জানে না—মশা মারবার জন্যে কামান পাতবার দরকার কী? মুয়াজ্জামকে সমুচিত শিক্ষা দেবার জন্যে তরবারিই যথেষ্ট! অতএব তাড়াতাড়ি এগুবার জন্যে কতকটা ঝাড়া-হাত-পা হয়ে আজম শাহ প্রাণপণ বেগে ছুটে চললেন।

তিনি স্থির করলেন, যুদ্ধক্ষেত্র হবে সমুগড়ে। এ হচ্ছে সেই ইতিহাসখ্যাত সমুগড় প্রান্তর, বাহান্ন বৎসর আগে যে যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভের ফলে ঔরঙ্গজিব জ্যেষ্ঠভ্রাতা দারার মুণ্ডচ্ছেদ করতে পেরেছিলেন। গণৎকাররাও তিথি-নক্ষত্র দেখে ভবিষ্যদ্‌বাণী করলে—ঠিক, ঠিক, জায়গার মতো জায়গা নির্বাচন করা হয়েছে, যুদ্ধজয় অবশ্যম্ভাবী!

সমুগড়ে গিয়ে পৌঁছাবার আগেই সৈন্যদের অবস্থা দস্তুরমতো কাহিল হয়ে পড়ল।

একে তো এ অঞ্চলে দুর্ধর্ষ গরম পড়ে, তার উপরে পথে পুকুর কি ইঁদারা পাওয়া গেল না—এক জায়গায় কেবল একটা নালার ভিতর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল অব্যবহার্য, নোংরা ও পঙ্কিল জল। সে অস্বাস্থ্যকর জল যে পান করেছিল সেই-ই যাতনায় কাতর হয়ে পড়েছিল। আমির-ওমরাওদের ততটা কষ্টভোগ করতে হল না—কারণ তাঁদের সঙ্গে ছিল মশক-ভরতি মিষ্ট জল, বিপদে পড়ল কেবল সাধারণ যুদ্ধব্যবসায়ীরা। বিষম তেষ্টায় তাদের প্রাণ টা-টা করতে লাগল, অনেকের শুকনো জিভ মুখের বাইরে বেরিয়ে ঝুলে পড়ল, অনেকে তৃষ্ণার জ্বালা সইতে না পেরে মাটিতে শুয়ে পড়ে প্রাণত্যাগ করলে।

তারপর বিপদের উপর বিপদ—সমুগড়ে পৌঁছে শত্রুর কোনোই পাত্তা পাওয়া গেল না।

মুয়াজ্জাম দূতের মুখে আজম শাহের গতিবিধির সব খবরাখবর পাচ্ছিলেন। তিনি ধীরেসুস্থে ঢোলপুরের নিকটবর্তী জাজাউ প্রান্তরে তাঁবু ফেলে ছোটো একদল অগ্রবর্তী রক্ষী সৈন্যকে শত্রুর সন্ধানে প্রেরণ করলেন।

আজম শাহও দৌড় দিলেন জাজাউ প্রান্তরের দিকে।

অগ্রসেনাদল জাজাউ প্রান্তরে গিয়ে পৌঁছেই আক্রান্ত হল। প্রধান সেনাদল নিয়ে মুয়াজ্জাম নিজে ছিলেন অনেকটা পিছনে, ঘটনাস্থলে বার্তা যথাসময়ে তাঁর

কাছে পৌঁছাল না। তিনি নিশ্চিন্তভাবে কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে শিকারে বেরিয়ে পড়লেন।

আজম শাহের পুত্র বিদার বখত অনেক সৈন্যসামন্ত নিয়ে সেই অগ্রবর্তী শত্রুদলকে তেড়ে গিয়ে আক্রমণ করলেন, তারা খানিক লড়াই করেই অসংখ্য শত্রু দেখে, বুদ্ধিমানের মতো চম্পট দিতে বাধ্য হল।

বিদার বখত আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন—'আমরা জিতে গিয়েছি—আমরা জিতে গিয়েছি—জোরসে বাজাও জয়ডঙ্কা!'

ডিমি ডিমি ডিমি ডিমি রণদামামাগুলো গভীর রবে বাজতে বাজতে বিদার বখতের বিজয়বার্তা দিকে দিকে প্রেরণ করতে লাগল।

সেই ডঙ্কাগুলোর ঘোর নির্ঘোষ শুনেই আজম শাহ আহ্লাদে আটখানা হয়ে পুত্রের সঙ্গে যোগ দিতে ছুটলেন—কেউ কেউ বাধা দিয়ে বললে, 'হুজুর, একটু সাবধান হওয়া উচিত—আগে ভালো করে খবরাখবর নেওয়া দরকার।'

আজম শাহ খাপ্পা হয়ে বললেন, 'এ সব হচ্ছে মেয়েলি কথা। সৈন্যদল, অগ্রসর হও, অগ্রসর হও!'

তিন মাইল দূরে মুয়াজ্জাম তখন নিকটবর্তী অরণ্যে শিকারখেলা নিয়ে মেতে ছিলেন। আচম্বিতে শত্রু-দামামার বিজয় ঘোষণা শুনে তাঁর মনে পড়ে গেল, অগ্রবর্তী সেনাদের সঙ্গে তাঁর পুত্র আজিম-উসসানও আছেন! পুত্র বিপদে পড়েছে ভেবে প্রধান সেনাদল নিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন।

একজন খবর-দার সব দেখেশুনে আজম শাহকে গিয়ে বললে, 'হুজুর, আসল ফৌজ নিয়ে এইবার মুয়াজ্জাম লড়াই করতে আসছেন।'

আজম শাহ চিরদিনের অভ্যাসমতো বুক ফুলিয়ে জামার আস্তিন গুটাতে গুটাতে ক্রুদ্ধ স্বরে চিৎকার করে বললেন, 'আমার সমুখে কোন শত্রু আসতে সাহস করবে? আনো আমার হাতি, দাও আমাকে একগাছা লাঠি! আমি মুয়াজ্জামকে শায়েস্তা করব লাঠির চোটেই? মাভৈঃ! আমি আমার বিজয়ী পুত্রের সঙ্গে মুলাকাত করতে যাচ্ছি!'

তখন আসল লড়াই শুরু হয়েছে—মুয়াজ্জামের কামান-শ্রেণি ভৈরব গর্জন ও দীপ্তমুখ থেকে ঘন ঘন তপ্ত গোলা উদ্‌গার করছিল।

তাতল বালুকাভরা প্রান্তর এবং গ্রীষ্মের তপ্ততাও ভয়াবহ। হু হু করে লু ছুটছে—ধুলোর ঝড়ে আজম শাহের তৃষ্ণার্ত সেনাদলের প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ হয়ে উঠল। সে ঝড়ের বেগ এত তীব্র যে নিক্ষিপ্ত তির আবার ফিরে আসে নিক্ষেপকারীর দিকে! স্বহস্তে নিক্ষিপ্ত তির ফিরে এসে অনেককে বধ করতেও ছাড়লে না!

ব্যাপার দেখে সেনাপতি জুলফিকার খাঁ বুদ্ধিমানের মতো সদলবলে পিছিয়ে এলেন, রাজা জয়সিংহ যোগ দিলেন শত্রুদলের সঙ্গে এবং অন্যান্য অনেক সেনাপতিও জুলফিকারের পথ অবলম্বন করলেন।

যিনি ভালো করে না দেখেশুনে জয়ডঙ্কা বাজাবার হুকুম দিয়ে এই অভাবিত কাণ্ড বাধালেন, আজম শাহের পুত্র সেই বিদার বখতও এক গোলার আঘাতে মারা পড়লেন এবং আহত হলেন তাঁর এক ভ্রাতাও। তাছাড়া সেই সঙ্গে বহু সেনাপতিকে মৃত্যুমুখে পড়তে হল।

কিন্তু আজম শাহের ভ্রূক্ষেপ নেই কিছুতেই—যেখানে জোর যুদ্ধ চলছিল সেইদিকে হস্তীচালনা করবার জন্যে মাহুতকে হুকুম দিলেন।

মাহুত হাতজোড় করে বললে, 'হুজুর, আমার হাতি অনায়াসে একশো মাইল ছুটে পালাতে পারবে। যদি আদেশ করেন—'

মাহুতের ইঙ্গিত বুঝে আজম শাহ ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন, 'কী! আমাকে পালাতে বলছিস?' তৎক্ষণাৎ তরবারির এক আঘাতে তাকে মাটির উপরে ফেলে দিয়ে নিজেই মাহুতের স্থান অধিকার করে হাতি চালাতে লাগলেন। তাঁর দেহের কয়েক জায়গায় তির বিদ্ধ হল কিন্তু তিনি আমলে আনলেন না। অবশেষে বন্দুকের এক গুলির আঘাতে তাঁর মৃতদেহ হাতির পিঠেই লুটিয়ে পড়ল।

জ্যেষ্ঠভ্রাতা দারার ছিন্নমুণ্ড দর্শন করে ঔরঙ্গজিব খুশি হয়েছিলেন। সুতরাং আজম শাহের কাটা মুণ্ড দেখেও মুয়াজ্জাম খুশি হয়ে নিশ্চয়ই পুরস্কার দান করবেন! এই কথা ভেবে পাঠান সেনানী রুস্তম দিল খাঁ হাতির পিঠে চড়ে আজম শাহের মৃতদেহ থেকে মুণ্ডটা কেটে নিয়ে ছুটে গিয়ে মুয়াজ্জামের পায়ের তলায় উপহার দিলেন।

পুরস্কার? বিষম ক্রুদ্ধ হয়ে মুয়াজ্জাম তাঁকে ভীষণ তিরস্কার করতে লাগলেন—রুস্তম খাঁ তাড়াতাড়ি পালিয়ে বাঁচলেন।

তারপর মুয়াজ্জামের দুই চক্ষু দিয়ে ঝরঝর করে শোকাশ্রু ঝরতে লাগল।

নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করবার পর আজম শাহ তিন মাস দশ দিন বেঁচে ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল পঞ্চান্ন বৎসর সাত মাস ছয় দিন। তিনি নিজেই নিজের মৃত্যুর কারণ, এ কথা বললে ভুল বলা হয় না। এ হচ্ছে ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দের কথা।

কিন্তু আজম শাহের মৃত্যুর পরেও মুয়াজ্জাম হাঁপ ছাড়বার সময় পেলেন না। কারণ তারপর নিজেকে 'সম্রাট' বলে ঘোষণা করে ঘটনাস্থলে এগিয়ে এলেন

ঔরঙ্গজিবের প্রিয়তম কনিষ্ঠ পুত্র মহম্মদ কামবক্স। তাঁর নামেও প্রস্তুত হল স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা।

সে আর এক বিয়োগান্ত প্রহসন।

কামবক্সের কারদানি

সম্রাট নাম ধারণ করবার পর থেকেই কামবক্স যথেচ্ছভাবে যে অত্যাচার আরম্ভ করলেন, তার ফলে সকলেরই প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়তে লাগল।

অতিরিক্ত আদর পেয়ে ঔরঙ্গজিবের জীবদ্দশাতেই তাঁর মাথা খারাপ হওয়ার লক্ষণ দেখা গিয়ে ছিল, এখন হাতে ক্ষমতা পেয়ে তিনি ব্যবহার করতে লাগলেন ঘোর উন্মাদগ্রস্তের মতো।

সে সব এখানে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলবার জায়গা হবে না। যে সব মানী আমির-ওমরাহ্ বিশ্বস্তভাবে তাঁর স্বার্থরক্ষার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন, তাঁদের কারুকে তিনি যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করলেন, এবং কারুর সমস্ত সম্পত্তি লুটে নিলেন।

রুস্তম দিল খাঁয়ের কুকীর্তির কথা আগেই বর্ণনা করা হয়েছে, হতভাগ্য আজম শাহের কাটা মুণ্ড ভেট দিয়ে মুয়াজ্জামের কাছ থেকে তিনি লাভ করেছিলেন পুরস্কারের বদলে তিরস্কার; এখন কামবক্সের অনুগত হয়ে লাভ করলেন চরম দণ্ড প্রাণদণ্ড। আর এক দিক দিয়ে দেখলে বলা যায় এ হচ্ছে তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

এমনই সব অত্যাচারের ফলে বহু নিরপরাধ ও প্রধান ওমরাওকে অপঘাতে মারা পড়তে হল, বহু ধনীর সর্বস্ব লুণ্ঠিত হল এবং দলে দলে লোক ধনপ্রাণ বাঁচাবার জন্যে রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হল।

অবশেষে কামবক্স হায়দ্রাবাদ ছেড়ে মুয়াজ্জামের সঙ্গে শক্তিপরীক্ষার জন্যে সদলবলে বেরিয়ে পড়লেন।

এইবার মুয়াজ্জাম কী করছেন তা দেখা দরকার।

মুয়াজ্জাম বা শা আলম ঔরঙ্গজিবের মৃত্যুর পূর্বেই আসীন ছিলেন তাঁর উত্তরাধিকারী যুবরাজের আসনে, সুতরাং এখন পিতার মৃত্যুর পর তিনি যে সিংহাসন লাভ করলেন সে কথা বলাই বাহুল্য। 'সম্রাট' উপাধি তিনি তাঁর দুই ভ্রাতার মতো গায়ের জোরে গ্রহণ করেননি। এবং সম্রাট হয়ে তিনি নিজেকে

বাহাদুর শাহ নামে পরিচিত করলেন। অতঃপর আমরাও তাঁকে ওই নামেই ডাকব।

তারপর আজম শাহের সঙ্গে যুদ্ধ ও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর মৃত্যু।

সম্রাট বাহাদুর শাহ জয়ী হয়ে দেখলেন, তাঁর চারিদিকেই অন্যান্য শত্রুর দল আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে এবং তাদের মধ্যে রাজপুত ও শিখরা ক্রমেই অধিকতর বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। তাই সর্বাগ্রে তিনি রাজপুতানা আক্রমণ করলেন।

সেখানে ছোটোখাটো কয়েকটা যুদ্ধে জিতেই তিনি খবর পেলেন, তাঁর ছোটোভাই কামবক্সও 'সম্রাট' নামে নিজেকে পরিচিত করে তাঁকে আক্রমণ করার জন্যে সসৈন্যে অগ্রসর হচ্ছে।

বাহাদুর শাহ যে ভ্রাতৃবিরোধের পক্ষপাতী ছিলেন না, সেটা আমরা আগেই দেখেছি। এবারেও রক্তপাত না করে ভালোয় ভালোয় সব গোলমাল মিটিয়ে ফেলবার জন্যে তিনি দূত-মারফত কামবক্সকে এই মর্মে জানালেন যে—তুমি যদি বাবার উইলের শর্ত অনুসারে দুইটি সুবা নিয়ে তুষ্ট থাকো তাহলে তোমার সঙ্গে আমি কোনো শত্রুতাই করব না। আশা করি তোমার দাদা আজম শাহের পরিণামের কথা তুমি ভুলবে না। মোসাহেবদের কুপরামর্শে ভুলে আমাকে আক্রমণ করে নিজের বিপদকে নিজেই ডেকে এনো না।

বাহাদুর শাহের কথা কামবক্স কানেও তুললেন না, মোসাহেবদেরই মত মেনে নিয়ে তিনি সগর্বে বললেন—'আমি যুদ্ধ করব। সৈন্যগণ! প্রস্তুত হও, অস্ত্র নাও, দিল্লি চলো!'

কিন্তু কোথায় সৈন্যদল? বিরাট এক বাহিনী নিয়ে বাহাদুর শাহ এগিয়ে আসছেন শুনে কামবক্সের অধিকাংশ সৈন্য দলে দলে পলায়ন করল এবং অনেকে যোগ দিলে বাহাদুর শাহের দলেই।

কামবক্স কিন্তু একটুও দমলেন না, বললেন, 'কী দরকার আমার সৈন্যসামন্ত নিয়ে? আমার সহায় ভগবান,—তিনি আমার মঙ্গলই করবেন!'

চাটুভাষী গণৎকাররাও ভবিষ্যদ্‌বাণী করলে—'হুজুর, নিশ্চিন্ত থাকুন ভগবান আশ্চর্যভাবে আপনাকে রক্ষা করবেন, যুদ্ধে আপনার জয়লাভ অনিবার্য!'

তিনি তাদের কথাই বিশ্বাস করলেন এবং কপাল ঠুকে তিন-চারি শত মাত্র অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে বাহাদুর শাহের লক্ষাধিক যোদ্ধাকে ঠেকাবার জন্যে বেরিয়ে পড়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন।

তারপর যুদ্ধের নামে যা হল তা প্রায় একতরফা হত্যাকাণ্ড ছাড়া আর কিছুই

নয়—এক পক্ষ মারলে, আর এক পক্ষ প্রায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেলে, ভূমিতলে বইতে লাগল বীভৎস রক্তবন্যা! বিপুল বাদশাহি বাহিনীকে অঙ্গুলাগ্রে গণনীয় কামবক্সের কয়েকজন সৈনিক ঠেকাতে পারবে কেন? অনেকে মরল, অনেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল, নিতান্ত বিশ্বাসী কয়েকজন মাত্র তখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লড়তে ও মরতে লাগল।

সাজাহানের রাজত্বকালে, অন্যান্য রাজপুত্রদের সঙ্গে তরুণ ঔরঙ্গজিব একবার একটা খ্যাপা হাতির সামনে গিয়ে পড়েছিলেন। বড়োভাইরা অর্থাৎ দারা, সুজা ও মুরাদ বুদ্ধিমানের মতো সরে পড়ে বিপদ থেকে নিস্তারলাভ করলেন, কিন্তু ঔরঙ্গজিব পালাবার নাম মুখেও আনলেন না, তরোয়াল খুলে সেই মত্তমাতঙ্গের সামনে একাই রুখে দাঁড়ালেন। এই সাহস ও বীরত্বের জন্য ঔরঙ্গজিব পরে পিতার কাছ থেকে প্রভূত প্রশংসা ও পুরস্কার লাভ করেছিলেন।

সম্রাট হবার যোগ্যতা না থাকলেও কামবক্স যে কত বড়ো 'বাপকো বেটা', সেদিন যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে তার জ্বলন্ত নজির দিলেন।

নিজের অধিকাংশ সৈন্য হত বা আহত, সম্মুখে নিশ্চিত পরাজয় বা মৃত্যু জেনেও কামবক্স একবারও পশ্চাৎপদ হলেন না, যেখানে শত্রুরা দলে ভারী সেইখানেই মহাবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তিরধনুক নিয়ে প্রাণপণে লড়াই করতে লাগলেন। তাঁর নিজের দেহের কয়েক জায়গা আহত হয়ে দর দর ধারে রক্ত ঝরতে লাগল। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে তিনি ধনুক থেকে বাণের পর বাণ নিক্ষেপ করে শত্রু বধ করতে লাগলেন—পরে পরে তাঁর দুইটা তূণ খালি হয়ে গেল—বাদশাহি সৈন্যরা তাঁর সামনে এসে দাঁড়াতে সাহস পেলে না—অনেকে মারাত্মক চোট খেয়ে মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ল—অনেকে তাঁর মারমূর্তি দেখে ভয়ে পালিয়ে গেল—তিনি একাই যেন একশো! তাঁর অসমসাহস ও বীরত্ব দর্শন করে শত্রুপক্ষের সবাই বিপুল বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল!

অবশেষে যা হবার তাই হল। ক্রমাগত রক্তপাতের ফলে কামবক্স নির্জীবের মতো হাতির হাওদার ভিতরে শুয়ে পড়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন।

বাদশাহি সেপাইরা তখন চারিদিক থেকে তাঁর হস্তীকে ঘিরে ফেলেছিল। কামবক্সের অচেতন দেহ পালকিতে তুলে বাহাদুর শাহের সামনে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করা হল।

এই রণক্ষেত্রে হাজির ছিলেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক কাফি খাঁ। তিনি নিজে গুনে দেখেছিলেন, কামবক্সের হাতির চারপাশে বাষট্টি জন বাদশাহি সৈন্যের মৃতদেহ পড়ে আছে!

তৎক্ষণাৎ বড়ো বড়ো চিকিৎসককে ডেকে তাঁদের হাতে কামবক্সের জীবনরক্ষার ভার দেওয়া হল। সম্রাট বাহাদুর শাহ নিজে এসে ভ্রাতার ক্ষতস্থানগুলি সযত্নে ধুয়ে এবং তাঁর রক্তাক্ত পোশাক বদলে দিলেন। নিজের গা থেকে শাল খুলে সস্নেহে ঢেকে দিলেন ভাইয়ের ক্ষতবিক্ষত দেহ।

তারপর করুণস্বরে বললেন, 'ভাই, তোমাকে যে এমন অবস্থায় দেখতে হবে এটা আমি কোনোদিন কল্পনাও করতে পারিনি।'

কামবক্স বললেন, 'সকলই ভগবানের ইচ্ছা।'

—'কেন এমন মরিয়া হয়ে লড়তে গেলে?'

—'আমি মরে দেখাতে চাই যে আমি ভীরু নই, আমার দেহে আছে মহাবীর তৈমুরের রক্ত!'

কামবক্স কিছু খেতে চাইছিলেন না, বাহাদুর শাহ জোর করে তাঁর মুখে স্বহস্তে কয়েক চামচ খাবার তুলে দিলেন।

কামবক্স কাতরস্বরে বলে উঠলেন, 'উঃ, বড়ো তেষ্টা!'

বাহাদুর শাহ তাড়াতাড়ি তাঁর মুখের সামনে গোলাপজল মিশানো পানীয়ের পাত্র তুলে ধরলেন।

সেই রাত্রেই কামবক্স অন্তিমশ্বাস ত্যাগ করলেন।

পিতা ঔরঙ্গজিব বিদ্রোহের ভয়ে পুত্রদের দূরে দূরে প্রেরণ করেছিলেন। তবু বিদ্রোহী হয়ে পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন তাঁর চতুর্থ পুত্র আকবর। এবং মুয়াজ্জাম ও আসফ শাহও পিতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছিলেন বলে ঔরঙ্গজিবের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

কিন্তু সাম্রাজ্য লাভ করে বাহাদুর শাহ পিতার নীতি মানেননি। তিনি পুত্রদের দূরে দূরে না পাঠিয়ে নিজের কাছে কাছেই রেখেছিলেন এবং তাঁর নীতিই সফল হয়েছিল; কারণ বাহাদুর শাহের জীবনকালে তাঁর কোনো পুত্রই বিদ্রোহাচরণ করেনি।

তবে বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্ররা পরস্পরের সঙ্গে মারামারি কাটাকাটি করেছিল বটে, কিন্তু সেটা হচ্ছে মোগল রাজবংশের চিরাচরিত রীতি।

এবং সে রীতির মূলে ছিল পূর্বপুরুষ তৈমুর রোপিত বিষবৃক্ষের বিষফলের প্রভাব। মোগল রাজবংশ লুপ্ত হওয়ার আগে সে বিষক্রিয়ার জের মেটেনি। অভিশপ্ত বংশ!*

---

*এই লেখাটি হেমেন্দ্রকুমার রায়ের শেষ রচনা—সম্পাদক।

মহাভারতের মহারথ

॥ এক ॥

ভূমিকা

আজ ভারত স্বাধীন। ভারতের সন্তানরা এখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিদের সঙ্গে সমকক্ষতার দাবি করে।

কিন্তু তার এ সৌভাগ্য ছিল না মাত্র কয়েক বৎসর আগেও। পায়ে পায়ে বেজেছে কঠিন দাসত্ব-শৃঙ্খল, হৃদয়ে হৃদয়ে জেগেছে উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাস, কণ্ঠে কণ্ঠে ফুটেছে তীব্র হাহাকারের ধ্বনি। কী নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যে দিয়েই কেটে গিয়েছে প্রায় আট শতাব্দীকাল! এক আধ নয়, কিছু কম আট শতাব্দী!

যেদিন থেকে এই চরম দুর্ভাগ্যের সূচনা, তোমাদের কাছে বলতে চাই আজ সেই অতিদুর্দিনের কাহিনি। পুরাতন দিনের পুরাতন কাহিনি, কিন্তু তার মধ্যেও খুঁজে পাবে নতুন করে ভাববার কথা। তাই তা চিরস্মরণীয়।

ভারত ছিল গরীয়ান এবং বাহুবলে বলীয়ান। কিন্তু তবু কেন সে বঞ্চিত হল স্বাধীনতার পরম সম্পদ থেকে? কেন সে পরতে বাধ্য হল গোলামির চাপরাশ?

প্রধান কারণ হচ্ছে, অনৈক্য। এই পুরাতন অনৈক্য-ব্যাধির জন্যেই ভারতকে বারংবার বিপদগ্রস্ত হতে হয়েছে যুগে যুগে। পাছে ঐক্যের বীজমন্ত্র ভুলে অসামান্য কৃচ্ছ্রসাধনের পর অর্জিত দুর্লভ স্বাধীনতার মর্যাদা আবার আমরা নষ্ট করি, তাই এই নূতন যুগের নূতন সূর্যের আলোকে তোমাদের সামনে আবার নতুন করে তুলে ধরলুম সেই পুরাতন ঐতিহাসিক চিত্র।

॥ দুই ॥

আমাদের নায়ক

প্রথমেই কাহিনির নায়ক পৃথ্বীরাজ এবং তাঁর বংশপরিচয়টা দিয়ে রাখি। তাঁর আর এক ডাকনাম হচ্ছে রায় পিথোরা। রাজপুত চৌহান বংশে তাঁর জন্ম।

অনলদেব ছিলেন আজমিরের রাজা। তাঁর তিন পুত্রের নাম জগদেব, বিশালদেব ও সোমেশ্বর।

জগদেবের পর সিংহাসন অধিকার করেন বিশালদেব (১১৫৩—৬৪ খ্রিস্টাব্দ)। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত যোদ্ধা। চৌহান বংশের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথমে অস্ত্রধারণ করেছিলেন মুসলমান বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে। তিনি দিল্লি দখল করেন এবং নিজের রাজ্যসীমা বিস্তৃত করেন হিমালয়ের পাদদেশ থেকে বিন্ধ্য পর্বতমালা পর্যন্ত। কেবল যোদ্ধা নন, তিনি ছিলেন সুকবি। তাঁর রচিত 'হরিকেলি নাটক' আজও পাওয়া যায়।

বিশালদেবের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন ছোটোভাই সোমেশ্বর (১১৭০—৭৭ খ্রিস্টাব্দ)। পৃথ্বীরাজ তাঁরই বড়োছেলে ও সিংহাসনের অধিকারী।

পৃথ্বীরাজ ছিলেন তখনকার আর্যাবর্তে অতুলনীয় যোদ্ধা। চিরদিনেরই রাজধর্ম হচ্ছে, অন্যের রাজ্য কেড়ে নেওয়া। তিনিও সেই ধর্ম পালন করতে ইতস্তত করেননি, ফলে আরও বেড়ে যায় তাঁর রাজ্যের সীমা।

তখনকার সমসাময়িক কাব্যে ও গাথায় উচ্ছ্বসিত ভাষায় পৃথ্বীরাজের মহিমা কীর্তিত হয়েছে। আজও পথে পথে তাঁর নামগান করে বেড়ায় উত্তর-ভারতের চারণকবির দল। তাঁর সভাকবি ছিলেন চাঁদ বার্দাই, তিনি রচনা করেছিলেন, 'পৃথ্বীরাজ-রাসৌ' নামে বিখ্যাত মহাকাব্য। চাঁদ-কবির বংশধররা আজও যোধপুর রাজ্যে বাস করেন। অন্য কবির রচিত আর একখানি উল্লেখ্য কাব্যের নাম 'পৃথ্বীরাজ-বিজয়'।

কিন্তু উত্তর-ভারতে তখন অন্যতম শক্তিশালী ও কোনো কোনো দিক দিয়ে প্রধান রাজা ছিলেন, জয়চন্দ্র (তাঁকে জয়চাঁদ নামেও ডাকা হয়)। তিনি ছিলেন রাঠোর বংশীয় রাজপুত এবং কনোজ ও বারাণসীর অধিপতি। বংশগৌরব, সহায়-সম্পদ ও খ্যাতি-প্রতিপত্তিতে তিনি নিজেকে পৃথ্বীরাজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলেই মনে করতেন। সব ঐতিহাসিক স্বীকার না করলেও কেউ কেউ বলেন, তিনি ছিলেন পৃথ্বীরাজের আত্মীয়।

পৃথ্বীরাজের মাতার নাম কর্পূরদেবী, তিনি চেদিরাজ অনঙ্গপালের কন্যা। জয়চন্দ্রও অনঙ্গ পালের আর এক কন্যার গর্ভজাত সন্তান। একথা সত্য হলে বলতে হবে পৃথ্বীরাজ ও জয়চন্দ্র ছিলেন মাসতুতো ভাই।

কিন্তু স্বার্থে স্বার্থে সঙ্ঘাত বাধলে রাজধর্ম কোনো আত্মীয়তাই স্বীকার করে না। পৃথ্বীরাজ ও জয়চন্দ্র উভয়েই চান উত্তর-ভারতের প্রভুত্ব। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দুইজনে অদ্বিতীয় হবার চেষ্টা করলেই সর্বনাশের সূত্রপাত হয়। এখানেও তাই হল।

॥ তিন ॥

পৃথ্বীরাজ ও জয়চন্দ্র

এখান থেকে পৃথ্বীরাজের বিবাহ পর্যন্ত আমরা যে সব ঘটনার উল্লেখ করব, তার মধ্যে কতখানি আছে ঐতিহাসিক সত্য, কবির কল্পনা বা লৌকিক কাহিনি, তা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত করতে গেলে অনেক তর্কবিতর্কের অবতারণা করতে হবে। এ-সব নিয়ে ঐতিহাসিকদের নিজেদের ভিতরেই বহু বাগ্‌বিতণ্ডার অন্ত নেই।

পৃথ্বীরাজের কথা নিয়ে তিন শ্রেণির ঐতিহাসিকের মতামত পাওয়া যায়। হিন্দু, মুসলমান ও ইংরেজ। একজন যা বলেন, আর একজন বলেন ঠিক তার উলটো কথা। এত ঝামেলার ভিতরে গিয়ে পড়লে গল্পের মাধুর্যটুকু উপে যাবে কর্পূরের মতো। তাই ওরই মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে আমরা পৃথ্বীরাজের কথা বলবার চেষ্টা করব।

জয়চন্দ্র নিজেকে আর্যাবর্তের একচ্ছত্র মহারাজাধিরাজ বলে পরিচিত করতে চাইতেন এবং অনেক নরপতিই ছিলেন তাঁর সামন্তরাজা। তাঁর রাজ্যের আয়তনও পৃথ্বীরাজের চেয়ে বড়ো ছিল এবং তাঁর পূর্বপুরুষরা অষ্টম শতাব্দী থেকেই কনোজের সিংহাসনে বসে রাজদণ্ড চালনা করে এসেছেন এবং এইজন্যে তাঁর মনে ছিল অধিকতর কৌলীন্য বা আভিজাত্যের অহংকার।

পৃথ্বীরাজ যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন থেকেই জয়চন্দ্র তাঁকে ভালো চোখে দেখতে পারতেন না। একালে আমাদের সম্ভ্রান্ত বা বনিয়াদী বংশের লোকেরা যেমন হঠাৎ বড়োলোকদের আমল দিতে চান না, পৃথ্বীরাজের প্রতি তাঁর মনের ভাব ছিল অনেকটা সেইরকম। এবং এদিক দিয়ে সায় দিতেন তাঁর অধীনস্থ অন্যান্য রাজন্যবর্গও।

ওদিকে দিকে দিকে নূতন নূতন রাজ্য জয় করে আজমির ও দিল্লির রাজদণ্ডধারী পৃথ্বীরাজ নিজের খ্যাতি-প্রতিপত্তি ক্রমেই বাড়িয়ে তুলে স্বনামধন্য হয়ে উঠলেন। আধুনিক দিল্লির অনতিদূরে তিনি যে বিশাল দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন তার অস্তিত্ব আজও বিদ্যমান আছে। তখন পর্যন্ত আর্যাবর্তের রাজারাজড়ারা মহাভারত ও রামায়ণে বর্ণিত বহু রাজরীতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। পৃথ্বীরাজও পৌরাণিক দিগ্বিজয়ীর মতো রটিয়ে দিলেন, অতঃপর তিনি করবেন মহাসমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন।

ক্রুদ্ধ জয়চন্দ্র এ ব্যাপারটাকে মনে করলেন ভুঁইফোঁড়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা বামন হয়ে চাঁদ ধরবার চেষ্টা।

পৃথ্বীরাজের উপরে টেক্কা মারবার জন্যে তিনি রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করলেন।

এ বড়ো যার-তার কাজ নয়, কারণ এমন লোককে আয়োজক হতে হবে সবাই যাকে সম্রাট বলে জানে আর মানে।

আমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসবেন যে-সব সামন্ত রাজা, তাঁদের প্রত্যেকের জন্যে নির্দিষ্ট থাকবে বিভিন্ন কর্তব্য। অর্থাৎ তাঁদের স্বীকার করতে হবে যে, যজ্ঞকর্তার সঙ্গে তাঁদের প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক।

যজ্ঞস্থল কনোজ বা কান্যকুব্জে। সেখানে আগমনের জন্যে আমন্ত্রণ গেল পৃথ্বীরাজের কাছে। তাঁকে নিযুক্ত করা হয়েছে দ্বারপালের কার্যে।

আমন্ত্রণ পেয়ে পৃথ্বীরাজের মনের ভাব কীরকম হয়েছিল, আমরা এতকাল পরেও অনায়াসে তা অনুমান করতে পারি।

তিনি দিল্লি ও আজমিরের দণ্ডমুণ্ডকর্তা, দিগ্বিজয়ী, অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠাতা মহারাজা পৃথ্বীরাজ, তাঁকে আহ্বান করা হয়েছে দারোয়ান হয়ে দ্বারপথে দাঁড়িয়ে সকলকে মাথা নুইয়ে সেলাম করবার জন্যে! এমন অভাবিত ও অপমানকর প্রস্তাবের উদ্দেশ্য বুঝতে বিলম্ব হয় না।

এর ফলে যুদ্ধ হয়ে ওঠে অনিবার্য। বিশেষত যুদ্ধেই যখন যোদ্ধার আনন্দ। আপন অমিত পরাক্রম সম্বন্ধে পৃথ্বীরাজ ছিলেন নিশ্চিত এবং তাঁর শাণিত তরবারি অলস ও কোষবদ্ধ হয়ে থাকতে ভালোবাসে না।

কিন্তু গৃহযুদ্ধ বা আত্মীয়হনন বা অন্য যে কারণেই হোক, আপাতত যুদ্ধ করবার প্রবৃত্তি তাঁর হল না।

জয়চন্দ্রের আমন্ত্রণ রক্ষা করবেন না, যুদ্ধেও তিনি নারাজ, তবু আদেশ দিলেন, 'সৈন্যগণ, প্রস্তুত হও! আমরা কান্যকুব্জের দিকে যাত্রা করব!'

—কেন?

॥ চার ॥

পৃথ্বীরাজের অ্যাডভেঞ্চার

পৃথ্বীরাজ যে আমন্ত্রণ রাখবেন না, এ ছিল ধরা কথা।

কিন্তু আমন্ত্রিত রাজন্যবর্গের সামনে মহারথ মহারাজা পৃথ্বীরাজকে অপমান করবার জন্যে কান্যকুব্জপতি জয়চন্দ্র ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অতএব আগে থাকতেই সে উপায় করে রেখেছিলেন।

রাজার আদেশে মৃৎশিল্পী গড়েছিল পৃথ্বীরাজের প্রতিমূর্তি। যজ্ঞসভার তোরণে সেই নকল পৃথ্বীরাজের নিশ্চল মূর্তিকে দাঁড় করিয়ে রাখা হল দ্বারপালের মতো।

একে একে আমন্ত্রিত সামন্তরাজগণ আগমন করেন, প্রবেশপথে দণ্ডায়মান সেই প্রতিমূর্তির দিকে দৃষ্টিপাত করে ওষ্ঠাধারে ফুটিয়ে তোলেন কৌতুকহাস্য। সেইটুকুতেই যথাসম্ভব সান্ত্বনালাভ করে মূঢ় জয়চন্দ্রের আক্রোশভরা চিত্ত।

কিন্তু কেবল রাজসূয় যজ্ঞ নয়, এই সুযোগে জয়চন্দ্র করেছিলেন আর একটি বিশেষ আয়োজন।

তিনি ঘোষণা করেছেন, কান্যকুব্জের কুমারী রাজকন্যা সংযুক্তা হবেন স্বয়ংবরা। সমাগত রাজন্যবর্গের মধ্য থেকে নিজের মনের মতো পাত্র বেছে নিয়ে সংযুক্তা তাঁরই কণ্ঠে অর্পণ করবেন বরমাল্য। এও হচ্ছে প্রাচীন ভারতের চিরাচরিত প্রথা।

কিন্তু এই প্রথা রাখতে গিয়ে প্রাচীন ভারতেও বারবার তুমুল কাণ্ড বেধে গিয়েছিল, এবারও বাধল।

তরুণী রাজকন্যা সংযুক্তা—রূপবতী, গুণবতী, বুদ্ধিমতী।

ঘরে ঘরে লোকে পৃথ্বীরাজের কথা নিয়ে আলোচনা করে—শৌর্যে এবং বীর্যে, সৌন্দর্যে এবং ঐশ্বর্যে আর্যাবর্তে তিনি অনন্যসুলভ। তিনিই হচ্ছেন সংযুক্তার ধ্যানজ্ঞানপ্রাণ। স্বামীর কথা ভাবতে গেলে তাঁর কথাই মনে হয়।

লোকপরম্পরায় সেই সংবাদ পৃথ্বীরাজেরও কানে গিয়ে উঠেছে। অতএব স্বয়ংবর-সভায় সংযুক্তা কী করেন দেখবার জন্যে পৃথ্বীরাজের মনে জেগেছে অতিশয় কৌতূহল এবং সেই কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্যেই কান্যকুব্জে তাঁর উপস্থিতি।

কিন্তু নগরের ভিতরে তিনি এসেছেন একাকী, ছদ্মবেশে, অশ্বারোহণে! নগরের বাইরে গোপনে অপেক্ষা করছে তাঁর সৈন্যসামন্ত।

স্বয়ংবর-সভার বাইরে কৌতূহলী বিপুল জনতা। তারই মধ্যে পৃথ্বীরাজ। কেউ তাঁকে চিনতে পারলে না।

সারি সারি বসে আছেন দেশদেশান্তর থেকে আগত রাজার পর রাজা। কেউ বড়ো, কেউ ছোটো, কেউ সুপুরুষ, কেউ কুপুরুষ—কিন্তু সকলেরই মনে এক আশা, বরমাল্য লাভ করবেন তিনিই!

এগিয়ে এলেন সুন্দরী সংযুক্তা, হাতে তাঁর টাটকা ফুলের মালা। কিন্তু যাঁকে খুঁজছেন তাঁকে তিনি দেখতে পেলেন না, রাজার পর রাজাকে ছাড়িয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন।

তারপর তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল দ্বারপালবেশে পৃথ্বীরাজের মৃন্ময়-মূর্তি।

সেই প্রতিমূর্তির কণ্ঠদেশে সংযুক্তা অর্পণ করলেন তাঁর বরমাল্য। বিনা বাক্যব্যয়ে।

সভাস্থ রাজন্যবর্গ এবং অন্যান্য সকলেই বিস্ময়-বিহ্বল! এবং কেউ ভালো করে কিছু বুঝতে না বুঝতেই সমবেত জনতার মধ্যে থেকে আবির্ভূত হল এক অপূর্ব, সুদর্শন, বীর্যবন্ত মূর্তি। কবির ভাষায়—'পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ'!

আগন্তুক স্মিতমুখে বললেন, 'সংযুক্তা! আমি পৃথ্বীরাজ। ওই আমার অশ্ব! এসো আমার সঙ্গে।'

সে মূর্তিকে দেখলেই চেনা যায়। সংযুক্তা চললেন তাঁর পিছনে পিছনে—যেন মন্ত্রাভিভূত হরিণী!

সংযুক্তাকে সঙ্গে নিয়ে পৃথ্বীরাজ চোখের নিমেষে ঘোড়ায় চড়ে বসলেন। ছুটল ঘোড়া—উড়ে চলল যেন পক্ষিরাজ!

এতক্ষণে সংবিৎ ফিরে পেয়ে জয়চন্দ্র সচিৎকারে গর্জন করে বলে উঠলেন, 'চোর! দস্যু! প্রহরীগণ, ধরে আনো, বধ করো!'

পলাতকদের পশ্চাদ্ধাবন করলে দলে দলে প্রহরী ও সৈনিক। কিন্তু কাকে ধরবে—বিদ্যুৎশিখা কি ধরা যায়?

নগরের প্রত্যন্তদেশে অন্তরাল থেকে আত্মপ্রকাশ করে কাতারে কাতারে বিদেশি সৈন্য পলাতকদের ঘিরে দাঁড়াল—হাতে তাদের খড়্গ, ভল্ল, তিরধনু। তারা পৃথ্বীরাজেরই অনুচর।

পলাতকদের আর ধরা হল না। সাত দিনের পথ অতিক্রম করে স্বয়ংবরবধূ সংযুক্তাকে নিয়ে পৃথ্বীরাজ উপস্থিত হলেন দিল্লি নগরে।

পৃথ্বীরাজকে অপমান করতে গিয়ে জয়চন্দ্র নিজেই হলেন অপমানিত। কন্যা সংযুক্তা হলেন শত্রুর সঙ্গে সংযুক্ত। জয়চন্দ্র দুর্জয় ক্রোধে ও দারুণ লজ্জায় মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন কিনা ইতিহাসে তার উল্লেখ নেই।

॥ পাঁচ ॥

উত্তুরে আঁধি

বীরবর পৃথ্বীরাজ পেলেন মনের মতো বউ, বীরবালা সংযুক্তা পেলেন মনের মতো বর। নিশ্চিন্ত আনন্দসুন্দর জীবন, ধনধান্যে ধন্য দেশ, সুখ-স্বচ্ছন্দ্যে পরিতৃপ্ত প্রজাবৃন্দ।

কেবল সভাকবি চাঁদভাটই নিজের পৃষ্ঠপোষক বীররাজার স্তুতিগীতি রচনা করেন না, সারা আর্যাবর্ত মুখরিত হয়ে উঠেছে পৃথ্বীরাজের প্রশস্তিগানে।

তার ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি সবই ভেসে আসে জয়চন্দ্রের কানে। তাই শুনে রাগে রি রি করে ওঠে তাঁর সর্বশরীর, কিন্তু নিষ্ফল আক্রোশে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ছাড়া আর কিছুই তিনি করতে পারেন না।

যুদ্ধ? কিন্তু পৃথ্বীরাজের সঙ্গে যুদ্ধ তো জুয়াখেলার সামিল, মুখে তাচ্ছিল্য করলে কী হয়—পৃথ্বীরাজ দুর্বল নন, তাঁর সঙ্গে যুদ্ধের পরিণাম অনিশ্চিত। শেষটা কি নিজের রাজ্য নিয়ে টানাটানি পড়বে? অতএব যুদ্ধের কথা জয়চন্দ্র চেপে গেলেন।

কিন্তু ভারতবর্ষের শিয়রে উঠছিল তখন উত্তুরে আঁধি।

শিকারের সন্ধান পেলে বাঘ আর ভোলে না। এক বাঘকে বধ করো, তাড়িয়ে দাও, তার বদলে হানা দিতে আসবে আবার নতুন বাঘ।

আফগানিস্তানের মুসলমানরা ভারতবর্ষের মধ্যে পেয়েছিল অগণ্য শিকারের সন্ধান। সাবুক্তিগিন ও মামুদের সঙ্গে বারংবার হানা দিয়ে ভারতের রক্ত নিঃশেষে শোষণ করে মুসলমানরা বেশ কিছু কাল (কিঞ্চিৎ অল্প দুই শতাব্দী) শান্ত হয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছিল—কারণ তাদের নানাদিক নিয়ে মাথা ঘামাতে হত নিজেদের ঘরোয়া ঝঞ্ঝাটের জন্যে।

তারপর গজনির সাম্রাজ্য দখল করে সিহাবুদ্দীন বা মহম্মদ ঘোরীর বাসনা হল, হিন্দুস্থানকেও তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্গত করবেন।

পঞ্চনদের তীর পেরিয়ে মুসলমানরা দাবানলের মতো এগিয়ে আসতে লাগল হিন্দু ভারতের দিকে। এ পথে তার কতকাল আগে বিধর্মীদের পদক্ষেপ হয়েছে, সে কথা হিন্দুদের আর স্মরণ নেই।

দিকে দিকে ছুটে গেল পৃথ্বীরাজের উদাত্ত কণ্ঠধ্বনি—দেশের বিপদ, জাতির সর্বনাশ আসন্ন। ম্লেচ্ছ আসছে হিন্দুর ধ্বংস করতে! এসো আর্যগণ দলে দলে, আমার পতাকার তলায় সমবেত হও!

দিকে দিকে জাগল সাড়া। পৃথ্বীরাজের বীরবাহুর প্রতি শ্রদ্ধা নেই কার?

রাজ্যশাসন ছেড়ে ছুটে এলেন যোদ্ধা রাজার দল, সংসারধর্ম ছেড়ে ছুটে এল দেশভক্ত প্রজার দল, অসি-চর্ম-বর্ম নিয়ে প্রস্তুত হয়ে এল নিয়মিত সৈনিকের দল। ঘন ঘন জাগতে লাগল মত্ত মাতঙ্গযূথের বৃংহিত, তেজী ঘোড়াদের হ্রেষা, রথচক্রের ঘর্ঘর। পত পত ওড়ে অসংখ্য পতাকা, শূন্যতার বুক ফুঁড়ে চোখ

ধাঁধায় শাণিত ইস্পাতের বিদ্যুৎকটাক্ষ, বৃহতী বাহিনীনিবেশের দিকে দিকে শোনা যায় সমবেত কণ্ঠে দৃপ্ত জয়ধ্বনি—'হর হর মহাদেও'!

পৃথ্বীরাজের আহ্বানে যে সব রাজা সাড়া দিলেন, তাঁরা হচ্ছেন অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের। উত্তর-ভারতে যাঁর রাজ্য সবচেয়ে বৃহৎ, তিনি হচ্ছেন কান্যকুব্জের মহারাজা জয়চন্দ্র—মুসলমান ঐতিহাসিকরা তাঁকে বারাণসীর রাজা বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর তরফ থেকে সাড়া পাওয়া গেল না।

পৃথ্বীরাজের উপরে জয়চন্দ্রের জাতক্রোধ, বিশেষত স্বয়ংবরসভার দারুণ অপমান তিনি ভুলতে পারবেন না এ জীবনে। সেই ঘৃণ্য ব্যক্তিকে নায়ক বলে মেনে নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব।

এখানে একটা কথা পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দরকার।

সাধারণ ইতিহাসে জয়চন্দ্রকে দেশের শত্রু বলে দেখাবার চেষ্টা হয়। অনেকেরই মত হচ্ছে, পৃথ্বীরাজের রাজ্য আক্রমণ করবার জন্যে তিনিই নাকি মহম্মদ ঘোরীকে আহ্বান করে এনেছিলেন।

এ অভিযোগ অমূলক। অন্তত এ সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য প্রমাণের অভাব। এমনকি মুসলমান ঐতিহাসিকরাও এ অভিযোগ সমর্থন করেন না।

দেশের শত্রু বলতে যা বোঝায় জয়চন্দ্র তা ছিলেন না। মহম্মদ ঘোরীকে তিনি বন্ধু বলে মনে করতেন না।

তিনি কেবল এই দেখতে চেয়েছিলেন, কাঁটা দিয়ে যদি কাঁটা তোলা যায়। ভারতে তাঁর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছেন পৃথ্বীরাজ। তার উপরে দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি তাঁর আত্মীয়। পৃথ্বীরাজকে স্বীকার করা বা তাঁর বিপক্ষে যুদ্ধ করা, দুইই তাঁর কাছে অপ্রীতিকর। তবে মহম্মদ ঘোরীর কবলে যদি এই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর পতন হয়, তাহলে সমগ্র আর্যাবর্তে তিনি অনায়াসেই এমন একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন, যেখানে আর কেউ তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস করবে না। তিনি হবেন সর্বময় প্রভু। তিনি হবেন একচ্ছত্র সম্রাট। এই বিপজ্জনক যুক্তিই পরে পৃথ্বীরাজের, আর্যাবর্তের—এমনকি জয়চন্দ্রেরও সর্বনাশের কারণ হয়ে উঠেছিল। অর্থাৎ দেশের শত্রু না হয়েও শেষ পর্যন্ত তিনি দেশের শত্রুতাই করলেন—হরে দরে প্রায় একই কথা হয়ে দাঁড়ায়।

এ বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই যে, জয়চন্দ্র ভেবেছিলেন অন্যান্য মুসলমান হানাদারদের মতো মহম্মদ ঘোরীও পৃথ্বীরাজের রাজ্য লুণ্ঠন করেই তুষ্ট হয়ে বিদায়গ্রহণ করবেন। তিনি আন্দাজ করতে পারেননি, এবারের 'এ সব দৈত্য নহে তেমন'। এরা এসেছে সারা ভারতে কায়েমি বাসা বাঁধতে।

এই স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণ নীতির জন্যেই ভারতে জয়চন্দ্রের নাম বহন করে আসছে চিরকলঙ্কের ভার।

॥ ছয় ॥

তারাইনের যুদ্ধ

গজনির সুলতানরা ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশ পর্যন্ত নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন এবং তাঁদের অধঃপতনের সময়ে সে অঞ্চল আবার সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল।

সেই অংশের উপরে পুনর্বার ইসলামের পতাকা উত্তোলন করলেন মহম্মদ ঘোরী। তারপর তিনি বললেন, 'এইবার দিল্লি চলো!'

কিন্তু তিনি জানতেন না, তখনও দিল্লি বহুদূরে! হতে পারে দিল্লির লাড্ডু লোভনীয়, কিন্তু খেতে গেলে নাকি পস্তাতে হয়।

মহম্মদ ঘোরী প্রথম যেখানে গিয়ে হিন্দুদের রণভেরিধ্বনি শ্রবণ করলেন, সেখানে ছিল তারাইন বা তালাওয়ারি নামে গ্রাম। তারই কাছে থানেশ্বর, কুরুক্ষেত্র এবং পানিপথ। এ অঞ্চল হচ্ছে মহাভারতের প্রাচীন রণক্ষেত্র—আর্যাবর্তের আত্মা এখানে যুগে যুগে বার বার স্নান করেছে রক্তগঙ্গার ধারায়। ভারতবাসীর স্মৃতির পটে আজও লেগে আছে তার রাঙা ছোপ।

জয়চন্দ্র দেশের কাজে সাড়া দিলেন না বলে পৃথ্বীরাজ হতাশ হননি। তিনি হচ্ছেন স্বনামধন্য উদ্যোগী পুরুষ। অন্যান্য রাজপুত রাজা এবং বিপুল এক বাহিনী নিয়ে ভারতের শত্রুর অগ্রগতি রুদ্ধ করবার জন্যে নির্ভয়ে তিনি এগিয়ে এসেছেন।

মুসলমান ঐতিহাসিক ফিরিস্তা বলেন, পৃথ্বীরাজের অধীনে ছিল দুই লক্ষ অশ্বারোহী এবং তিন হাজার গজারোহী সৈন্য।

সেইখানেই ব্যূহ রচনা করে মহম্মদ ঘোরী নিজে মধ্যভাগে গিয়ে দাঁড়ালেন। কাফের বধ করবার জন্যে বেজে উঠল ইসলামের রণ-দামামা। সে হচ্ছে ১১৯১ খ্রিস্টাব্দ।

পৃথ্বীরাজের হুকুমে হিন্দুরা প্রবল বিক্রমে একসঙ্গে আক্রমণ করলে মুসলমান ব্যূহের দুই পার্শ্ব।

মুসলমানের হুঙ্কার—'আল্লা হো আকবর!'

হিন্দুর হুঙ্কার—'হর হর মহাদেও!'

ছোটে গজারোহী, ছোটে অশ্বারোহী, ছোটে পদাতিক, ছোটে বন বন বাণ, শন শন বর্শা! বাজে দম দম শত শত দামামা, বাজে ঝঞ্ঝন লক্ষ লক্ষ তরবারি, বাজে মুহুর্মুহু কোদণ্ড-টঙ্কার। সিংহনাদ! আর্তনাদ! ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত আকাশ-বাতাস! যোদ্ধাদের পদঘাতে পৃথিবী থর থর কম্পমান। মিশে যায় দুই দল—হিন্দু ও মুসলমান। সবুজ মাঠের উপরে বিছিয়ে যায় যেন ভয়াবহ রক্তাম্বর!

প্রথমটা—'কে হারে কে জিনে দুজনে সমান।' তারপর দেখা গেল, হিন্দুরা বেশি এগিয়ে এসেছে এবং মুসলমানরা বেশি পিছিয়ে গিয়েছে। তারপর বোঝা গেল, 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর এবং 'হর হর মহাদেও' ধ্বনি উচ্চ থেকে উচ্চতর!

আচম্বিতে মহম্মদ ঘোরী আবিষ্কার করলেন, তাঁর চারিদিকে দেখা যায় কেবল রাজপুর যোদ্ধাদের মারমুখো মূর্তি!

কিন্তু তিনি দমলেন না, অসম সাহসে ঝাঁপিয়ে পড়লেন শত্রুদের উপরে।

সামনেই পেলেন পৃথ্বীরাজের ভাই গোবিন্দ রায়কে।

ঘোরীর তরবারির এক আঘাতে উড়ে গেল গোবিন্দ রায়ের দুই দন্ত।

কিন্তু রাজপুতও মার খেয়ে মার ফিরিয়ে দিতে জানে। গোবিন্দ রায়ও শত্রুর উপরে চড়াও হয়ে তরবারি চালনা করলেন প্রচণ্ড বেগে, ঘোরী সে আঘাত রুখতে পারলেন না, বিষম চোট লাগল তাঁর হাতে—আর একটু হলেই হাতখানা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত।

মুসলমান ঐতিহাসিক মিনহাস-উস-সিরাজ বলছেন: 'সুলতান ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে পিছিয়ে এলেন, কিন্তু আহত হাতের যন্ত্রণায় তাঁর পক্ষে ঘোড়ার পিঠের উপরে বসে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠল।

ইসলামের হল পরাজয়। তার সৈন্যগণ করলে পলায়ন।

'সুলতান ঘোড়ার উপর থেকে পড়ে যাচ্ছিলেন। জনৈক যুবক ও সিংহ-হৃদয় মুসলমান সৈনিক তাঁকে চিনতে পেরে তাড়াতাড়ি তাঁর দেহ নিজের বাহুর উপরে রেখে ঘোড়াসুদ্ধ বেরিয়ে এল যুদ্ধক্ষেত্রের ভিতর থেকে।'

মুসলমানরা আর পিছু ফিরে তাকালে না, ছুটতে লাগল ক্রোশের পর ক্রোশ। তারাও যত পালায়, হিন্দুরাও তত তাড়া করে। দীর্ঘ চল্লিশ মাইল পর্যন্ত সোজা পিঠটান দিয়ে তবে মুসলমানরা হিন্দুদের কবল থেকে অব্যাহতি লাভ করেছিল।

মহম্মদ ঘোরীর পরম সৌভাগ্য, রাজপুতরা তাঁকে চিনতে পারেনি। তাহলে সেই তারাইনের রণক্ষেত্রেই তাঁর ভারত-সাম্রাজ্য স্থাপনের দুরাকাঙ্ক্ষা বিলুপ্ত হয়ে যেত এবং আর্যাবর্তকেও হয়তো পরতে হত না সাড়ে আঠারো শত বৎসর ধরে দাসত্বের শৃঙ্খল।

॥ সাত ॥

আনন্দ এবং নিরানন্দ

দ্যাখো, দ্যাখো! দেশের শত্রু দলন করে বিজয়ী বীর ফিরে আসছেন, বিজয়ী বীর ফিরে আসছেন!

সফলতায় উৎফুল্ল চতুরঙ্গবাহিনীর পুরোভাগে অশ্বারোহণে পৃথ্বীরাজ যখন দিল্লির পথে প্রত্যাবর্তন করেন, সেদিন আনন্দে উচ্ছ্বসিত আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে মুখে নিশ্চয়ই ওই একই কথা শোনা গিয়েছিল হাটে-বাটে-মাঠে বারংবার।

উথলে উঠেছিল দিগ্‌বিদিকে উন্মাদ জনতাসাগরের তরঙ্গের পর তরঙ্গভঙ্গ, বর্ষণ করেছিল লাজাঞ্জলি পুরাঙ্গনারা শঙ্খনাদের সঙ্গে, মুখরিত হয়েছিল অগণ্য জয়ঢক্কা নৃত্যশীল জয়ধ্বজার আগেপিছে গগনভেদী জয়জয়কারের ছন্দে ছন্দে।

সেদিনেরও রাজকবি নিশ্চয়ই এই ভাব নিয়ে প্রশস্তিসংগীত রচনা করেছিলেন:

'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে,
ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে,
জয় জয় জয়, জয় হে!'

সেদিন কান্যকুব্জকন্যা শ্রেয়সী সংযুক্তা দিল্লির ঘরণী হয়ে মনে মনে কি বিপুল গর্বপুলক অনুভব করেননি? কী সুখে তিনি স্বামীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, কোন পুষ্পিত ভাষায় তাঁর বীরত্বকে অভিনন্দিত করেছিলেন এবং কত আদরে তাঁর রণশ্রান্ত দেহ থেকে যুদ্ধসাজ খুলে নিয়েছিলেন, আজ আমরা কি তা অনুমান করতে পারব?

এই অপূর্ব যুদ্ধজয়ের পর পৃথ্বীরাজ যে গণ্য হলেন আর্যাবর্তের শিরোমণির মতো, সেটা উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। সূর্যোদয়ের পর আকাশের আর সব গ্রহতারা অদৃশ্য হয়ে যায়, পৃথ্বীরাজের গৌরবসূর্যের দিকে তাকিয়ে ভারতবাসী

তাঁর আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখতে পেলে না। খ্রিস্টপূর্ব যুগে যবন গ্রিকদের তাড়িয়ে সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত ভারতের যে শ্রেষ্ঠাসনে আসীন হয়েছিলেন, পৃথ্বীরাজ আজ হলেন সেই আসনেরই অধিকারী।

পৃথ্বীরাজের মতো জামাই পেলে লোকে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করে। কিন্তু তাঁর এই অতুলনীয়তায় জয়চন্দ্র মর্মে মর্মে অনুভব করলেন দুর্ভাগ্যের কশাঘাত। পূর্ণভাবে না হোক, আংশিক ভাবেও ওই গৌরবের অধিকারী হতে পারতেন তিনিও কিন্তু পৃথ্বীরাজের সাহচর্য বর্জন করে তাথেকেও তিনি বঞ্চিত হয়েছেন। কেবল তাই নয়, লোকে আর তাঁকে বড়ো বলে মানে না এবং অনেকেই দেয় তাঁকে ধিক্কার। মন তাঁর ধিকিধিকি জ্বলতে থাকে হিংসার আগুনে।

ওদিকে আহত মহম্মদ ঘোরী সিন্ধুনদ পার হয়ে স্বদেশে পলায়ন করলেন।

ক্রোধে ও মর্মযাতনায় তাঁর মন হয়ে উঠল একান্ত জর্জর। ইসলামের এমন শোচনীয় পরাজয় এর আগে আর কখনো হয়নি।

যে সব সৈনিক ও সেনানী কাপুরুষের মতো রণক্ষেত্র ত্যাগ করে পালিয়ে এসেছিল, সুলতান তাদের ক্ষমা করলেন না। তিনি হুকুম দিলেন, 'ওই হতভাগ্যদের ধরে সাধারণ অপরাধীদের মতো অপমান করতে করতে পথে পথে ঘুরিয়ে আনো।' অনেককেই বন্দি করে কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

তবু ঘোরীর গায়ের জ্বালা যায় না। ক্ষত না সেরে ওঠা পর্যন্ত তাঁকে দায়ে পড়ে শয্যায় শুয়ে থাকতে হল বটে, কিন্তু তার পরেই আবার তিনি নিজমূর্তি ধারণ করলেন। দৃপ্ত কণ্ঠে বললেন, 'পরাজয়ের প্রতিশোধ না নিয়ে আমার শান্তি নেই। ইসলামের অপমান আমি সইতে পারব না। এসো তুর্কি, এসো আফগান, এস তাতার,—অস্ত্র ধরো, প্রস্তুত হও! আবার আমরা হিন্দুস্থানে যাত্রা করব। সেখানে তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে প্রভূত যশ, অগাধ ঐশ্বর্য! কাফের বধ করলে প্রচুর পুণ্য, সে চেষ্টায় প্রাণ দিলেও স্বর্গলাভ! এসো তুর্কি, এসো আফগান, এসো তাতার!'

দলে দলে যোদ্ধা ইসলামের অর্ধচন্দ্রাঙ্কিত পতাকার তলায় এসে সমবেত হতে লাগল, পরাজয়ের দুশ্চিন্তা সকলেই মন থেকে মুছে ফেলেছে, তেজী ও তাজা উৎসাহ-শিখায় প্রত্যেকের চিত্ত উদ্দীপ্ত।

এক লক্ষ বিশ হাজার বাছা বাছা সৈনিক নিয়ে মহম্মদ ঘোরী আবার নবোদ্যমে যাত্রা করলেন হিন্দুস্থানের দিকে।

ইতিমধ্যে কেটে গিয়েছে এক বৎসর কাল। সেটা হচ্ছে ১১৯২ খ্রিস্টাব্দ।

॥ আট ॥

আর্যাবর্তের মহাশ্মশানে

কবি বলেছেন—

'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুরা পন্থা, যুগযুগধাবিত যাত্রী!'

উঁচু-নিচু পথ—চলতে গিয়ে পড়ে এবং ওঠে, তবু সেই পথ ধরেই যুগে যুগে ধেয়ে আসছে যাত্রীদল।

এই পথ ছেয়ে আছে কত চূর্ণবিচূর্ণ সাম্রাজ্যের ধুলো এবং সেই ধুলোয় ধূসর হয়ে আবার নূতন সাম্রাজ্যবাদী চলতে চলতে চেঁচিয়ে বলে—এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো!

কেবল ভারতের নয়, পৃথিবীর ইতিহাস দেখিয়ে দেয় এমনি দৃষ্টান্তের পর দৃষ্টান্ত।

গ্রিক যাত্রী, শক যাত্রী ও হিন্দু যাত্রীর পর এবারে এসেছে মুসলমান যাত্রীর চলবার পালা।

'আল্লা হো আকবর!'

সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হল আজমির ও দিল্লির রাজাপ্রাসাদের মহলে মহলে। রাজাও শুনলেন, প্রজারাও শুনলে। চারিদিকে আবার উঠল সাজ সাজ রব!

আবার পৃথ্বীরাজের অনাহত বাণী দিকে দিকে ছুটে গেল,—'জাগ্রত হও রাজপুত, জাগ্রত হও ক্ষত্রবীর, জাগ্রত হও আর্যপুত্রগণ! হিন্দুস্থানে আবার জাতির বৈরী, ধর্মের বৈরী, দেশের বৈরী বিধর্মীদল পদার্পণ করেছে। বহিঃশত্রুদের বাধা দেবার জন্যে আবার আমি যুদ্ধযাত্রা করব—যদি আত্মরক্ষা, ধর্মরক্ষা, দেশরক্ষা করতে চাও, তবে একমত, একভাব, একপ্রাণ হয়ে সবাই হও আমার সঙ্গে আগুয়ান!'

পৃথ্বীরাজের পরীক্ষিত নেতৃত্বে ও বীরত্বে কারুর আর সন্দেহ ছিল না। রাজপুতানা থেকে দলে দলে রাজা সসৈন্যে তাঁর সঙ্গে যোগ দিতে বিলম্ব করলেন না। দেড়শতজন রাজার সাহচর্য ও সাহায্য পেয়ে পৃথ্বীরাজের বাহিনী হয়ে উঠল রীতিমতো বিশাল।

নিঃসাড় ও নিশ্চেষ্ট হয়ে রইলেন কেবল জয়চন্দ্র। উত্তর-ভারতের অধিকাংশ জুড়ে তাঁর বৃহৎ রাজ্য এবং তাঁর সৈন্যসংখ্যাও ছিল অপরিমিত। তিনিও পৃথ্বীরাজের পাশে গিয়ে দাঁড়ালে হিন্দুবাহিনী হয়ে উঠত একেবারেই দুর্ধর্ষ। জয়চন্দ্রও তা

জানতেন। কিন্তু দেশপ্রেমের উপরেও ঠাঁই দিলেন তিনি আত্মাভিমান ও পারিবারিক কলহকে।

ভাবলেন, আগে তো পৃথ্বীরাজের পতন হোক, তারপর অন্য কথা। তখনও যদি বিধর্মীরা হিন্দুস্থানকে গ্রাস করতে চায়, তবে তাঁর তরবারিও অলস হয়ে থাকবে না।

সত্যসত্যই পৃথ্বীরাজের পরে এসেছিল জয়চন্দ্রের পালা এবং সত্যসত্যই তাঁর তরবারিও অলস হয়ে থাকেনি। কিন্তু ফল যা হয়েছিল ইতিহাসে তা লেখা আছে আগ্নেয় অক্ষরে।

জয়চন্দ্র এলেন না। মিত্ররাজাদের নিয়ে পৃথ্বীরাজ নিজেই বেরিয়ে পড়লেন শত্রুদের সন্ধানে।

আবার সেই তারাইনের রণক্ষেত্র।

আবার সেখানে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায় হিন্দু ও মুসলমান।

আবার হিন্দু ও মুসলমান হাঁকে—'হর হর মহাদেও' এবং 'আল্লা হো আকবর!'

আবার মুসলমান ব্যূহের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে রাজপুত অশ্বারোহীগণ।

কিন্তু মহম্মদ ঘোরীর আদেশে এবারে ইসলামের ধ্বজাধারীরা অবলম্বন করেছিল নূতন রণকৌশল।

কথা ছিল, লড়াই শুরু হবার পর রাজপুতরা যেই দলে দলে আক্রমণ করবে, মুসলমানরা অমনি ভয়ের ভান করে পালিয়ে যাবে দলে দলে। রাজপুতরা খানিক দূর পর্যন্ত পিছনে তাড়া করে এলে পর মুসলমানরা আবার ফিরে দাঁড়াবে।

প্রথম দৃষ্টিতে এটা নূতন রণকৌশল বলে মনে হয় বটে, কিন্তু অশ্রুতপূর্ব নয়। তার আগেও এই রণকৌশল ব্যবহৃত ও ফলপ্রদ হয়েছে। এবং তার পরেও। অধিকন্তু আজও এই কৌশল ব্যর্থ হয় না।

চিরদিনই মানুষের মন কাজ করে একই ভাবে। এই তথাকথিত এবং প্রকৃত পক্ষে সেকেলে কৌশলে এখনও ঠকতে হয় বারংবার। তার কারণ যুদ্ধের সাময়িক উত্তেজনায় মানুষ মনের ঝোঁকে কাজ করে, মাথা ঘামাবার সময় পায় না।

নিজের বাছা বাছা সৈন্যদল নিয়ে ঘোরী একেবারে পিছনদিকে নিশ্চেষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কেবল চারদল সাদী সৈন্য সামনের দিকে পাঠিয়ে দিলেন তিনি রাজপুতদের ঠকাবার জন্যে। প্রত্যেক দলে রইল দশ হাজার করে সওয়ার।

প্রভাতসূর্য হল অস্তাচলের যাত্রী। সারা দিন ধরে চলল এই নকল যুদ্ধাভিনয়।

একবার মুসলমানরা বাঘের মতো তেড়ে আসে, রাজপুতদের সঙ্গে হয় তাদের খড়্গো খড়্গো পরিচয়, তারপর আবার তারা পালাতে থাকে শৃগালের মতো এবং জয় জয় নাদে আকাশ কাঁপিয়ে তাদের বহুদূর পর্য্যন্ত খেদিয়ে নিয়ে চলে রাজপুতগণ। আবার শত্রুরা ফিরে দাঁড়ায়, আবার পালায়। এমনি বারংবার। ক্রমাগত ছুটোছুটি করে রাজপুতরা শেষটা শ্রান্ত হয়ে পড়ল।

বারো হাজার তাজা ও বাছা অশ্বারোহী নিয়ে স্বয়ং মহম্মদ ঘোরী তখন প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করলেন রাজপুত ব্যূহ।

হিন্দুরা বীরের মতো বাধা দেবার চেষ্টা করলে বটে, কিন্তু তাদের প্রত্যেকের শরীর তখন রণশ্রমে ক্লান্ত ও দুর্বল, তারা পিছু হটতে লাগল পদে পদে। দেখতে দেখতে সমগ্র শত্রুবাহিনী আছড়ে পড়ল তাদের উপরে।

রাজপুতদের ব্যূহ ভেঙে গেল, ছত্রভঙ্গ হয়ে তারা ছড়িয়ে পড়ল। সার্থক হল ঘোরীর রণকৌশল।

তারপর যা হল, বর্ণনা না করলেও চলে। একবার ব্যূহ ভেঙে গেলে কোনো সেনাপতিই শেষ রাখতে পারেন না—পৃথ্বীরাজও পারলেন না। তারপর যে হানাহানি ও হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হল, তার মধ্যে আততায়ীর অংশগ্রহণ করলে মুসলমানরাই—রাজপুতরা হতে লাগল নিহত, আহত ও পলায়মান। হিন্দুর রক্তে ভেসে গেল রণক্ষেত্র।

আকাশের সূর্য এবং হিন্দু গৌরবসূর্য একসঙ্গে হল অস্তগত। পড়ে রইল কেবল আহতদের আর্তনাদপূর্ণ মহাশ্মশান—আর কেউ সেখানে শ্মশান-জাগানো উদাত্ত কণ্ঠে 'হর হর মহাদেও' বলে জয়নাদ করেনি।

পৃথ্বীরাজ-ভ্রাতা গোবিন্দ রায় রণক্ষেত্রেই অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

পৃথ্বীরাজ রণক্ষেত্র ত্যাগ করলেন বটে, কিন্তু শত্রুকবল থেকে নিষ্কৃতি পেলেন না। তারা ছুটল তাঁর পিছনে পিছনে এবং সরস্বতী নদীর তীর পর্যন্ত গিয়ে তিনি হলেন বন্দি।

গ্রিক দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডার হিন্দুদের সঙ্গে যুদ্ধে জিতে মহারাজা পুরুকে বন্দি করেও মুক্তি দিয়েছিলেন।

কিন্তু তেমন উদারতা প্রকাশ করতে পারলেন না মহম্মদ ঘোরী। তিনি করলেন মহারাজ পৃথ্বীরাজের মুণ্ডচ্ছেদ।

পৃথ্বীরাজের জীবনপ্রদীপের সঙ্গে নিবে গেল আর্যাবর্তের আশার প্রদীপ। তিনিই ছিলেন মহাভারতের শেষ মহারথ।

অবশিষ্ট

আর অল্প কিছু বক্তব্য আছে।

পৃথ্বীরাজের আদরের স্বয়ংবরবধূ বীরাঙ্গনা সংযুক্তা তাঁর আদর্শ স্বামীর মৃত্যুশোক সহ্য করতে পারেননি। তিনি করলেন জ্বলন্ত চিতায় আত্মদান।

'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা'য় মহাবীর পৃথ্বীরাজের প্রাণহীন দেহ হল ভূলুণ্ঠিত। তারপর দেখা গেল ইসলামের বাঁধা কর্মসূচি। হিন্দুহনন, ধর্ষণ, নগরলুণ্ঠন ও অসংখ্য মন্দির-ধ্বংসন এবং সেই ধ্বংসস্তূপের উপরে মসজিদ-গঠন। সমস্ত হিন্দুস্থান মর্মে মর্মে পৃথ্বীরাজের অভাব অনুভব করলে, কিন্তু সে অভাব পূরণ করবার দ্বিতীয় লোক নেই।

জয়চন্দ্র ভেবেছিল, পৃথ্বীরাজের মৃত্যুর পরে আর্যাবর্তে তিনি হবেন নিষ্কণ্টক এবং একেশ্বর। কিন্তু দুই বৎসর পরে তাঁর সেই ভ্রম ভেঙে গেল। ১১৯৪ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ ঘোরী কান্যকুব্জ আক্রমণ করলেন।

ধিক্কৃত জয়চন্দ্রকে সাহায্য করবার জন্যে এগিয়ে এলেন না রাজস্থানের কোনো রাজাই। যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হলেন। তাঁর মুকুটহীন ছিন্নমুণ্ড দেখা গেল শত্রুর বর্শাদণ্ডের উপরে।

তারপর জয়চন্দ্রের অধীন বারাণসীধামের উপরে হল মুসলমানদের প্রথম আক্রমণ। সেখানে বিধ্বস্ত হল প্রায় এক হাজার মন্দির। এক হাজার চারি শত উষ্ট্রের পিঠের উপরে চাপিয়ে মহম্মদ ঘোরী নিয়ে গেলেন লুণ্ঠিত বিপুল ঐশ্বর্য।

হিন্দুদের চক্ষু সজল করে তুললে পৃথ্বীরাজের স্মৃতি। আজও সেই অক্ষয় স্মৃতি ভারতে জাগ্রত করে নূতন প্রেরণা।

পঞ্চশরের কীর্তি

বন্ধুবর

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুহ

করকমলেষু

দাদা,

আপনি আমাকে একখানি ইংরেজি ছোটোগল্পের বই পড়তে দিয়েছিলেন। তারই একটি গল্পকে এই উপন্যাসের ভিত্তি-রূপে ব্যবহার করেছি। আমার এই উপন্যাসে ছোটোগল্পের চরিত্রগুলিকে সম্পূর্ণ নূতনভাবে চিত্রিত করবার চেষ্টা করেছি তো বটেই, তার উপরে আমি নূতন নূতন চরিত্র ও ঘটনারও সাহায্য নিয়েছি। ছোটো জিনিস বড়ো হয়ে কেমন দেখতে হল জানি না, কিন্তু বইখানি আপনাকেই উপহার দিলুম। ইতি

স্নেহধন্য

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

প্রেতশিখর

প্রতাপপুর হচ্ছে একটি বড়ো করদ রাজ্য। প্রতাপপুর বলে ডাকলুম বটে, কিন্তু কেউ যদি বলেন 'প্রতাপপুর' নামে কোনো করদ রাজ্য ভারতবর্ষে নেই, তাহলে আমি আপত্তি করব না। কারণ আলোচ্য করদ রাজ্যটিকে আমি কল্পিত নামেই পরিচিত করতে চাই।

প্রতাপপুরের স্বর্গীয় মহারাজা বিজয় সিংহ ছিলেন অপুত্রক। তাঁর একমাত্র কন্যার নাম সুমিত্রাদেবী। দত্তকপুত্র রূপে গ্রহণ করতে পারেন তাঁর এমন কোনো আত্মীয়সন্তানও ছিল না। ফলে প্রতাপপুরের গদিতে বসেছেন এখন মহারানি সুমিত্রাদেবী।

কিন্তু সুমিত্রা এখনও কুমারী। (তিনি সুন্দরীও বটে, কারণ রাজকুমারীর সুন্দরী হওয়াই উচিত—অন্তত উপন্যাসের খাতিরেও!) তাঁর বয়স আঠারো বৎসর। এ বয়সে এদেশে গরিবের মেয়েরও বিবাহ হয়ে যায়। মহারানি সুমিত্রার হয়নি। এর কারণ পাত্রের অভাব নয়। নানা দেশের নানা রাজপুত্র সুমিত্রার মতো নারীরত্ন লাভ করবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন যথেষ্ট, কিন্তু তাঁদের কারুরই আবেদন সুমিত্রার যৌবনের অন্তঃপুরে গিয়ে পৌঁছায়নি।

রানি সুমিত্রা পুরাতন বনিয়াদী বংশের মেয়ে বটে, কিন্তু মানুষ হয়েছেন বিশ শতাব্দীর শিক্ষাদীক্ষার ভিতর দিয়ে। নতুন কোনো সম্বন্ধ এলেই তিনি ঘাড় নেড়ে বলেন, 'ঘটককে বিদায় করে দাও। সেকাল আর নেই, অন্যের পছন্দমতো আমি বিবাহ করব না।'

মহারাজা বিজয় সিংহ জীবিত থাকলে সুমিত্রার এতটা স্বাধীনতা নিশ্চয়ই থাকত না। কিন্তু এখন তাঁর মুখের উপরে কথা বলতে পারে এমন কেউ নেই। নারী হলেও সুমিত্রা হচ্ছেন রানি। মন্ত্রীরা হতাশ ভাবে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেন এবং আড়ালে গিয়ে বলেন, 'ইংরেজি নাটক-নভেল পড়ে মেয়েটার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। রানি হলে কী হয়—নারী হচ্ছে, নারী!'

এমনি সময়ে রাজবাড়ির আর একটি মেয়ের বিবাহে খুব সমারোহের সাড়া পড়ে গেল। সেই বিবাহে আমন্ত্রিত হয়ে এলেন রাজনগরের রাজকুমার সুন্দর

সিংহ। তাঁকে দেখে সকলেই বললে, নামের সঙ্গে চেহারার এমন আশ্চর্য মিল দেখা যায় না।

কাব্যে প্রসিদ্ধ অশরীরী দেবতাটি বিংশ শতাব্দীতেও প্রতাপপুরে বেড়াতে গিয়েছিলেন কি না জানি না, কিন্তু সুন্দর সিংহকে লোকদেখানো অভ্যর্থনা করতে এসে সুমিত্রা তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিলেন নিজের মনের ভিতরেই।

প্রথম দর্শনে প্রেম হয় কি না তাই নিয়ে মনস্তত্ত্ববিদরা অনেক বড়ো বড়ো কথা বলেছেন। সুমিত্রাও প্রেমে পড়লেন কি না বলতে পারি না, তবে কিছুদিন পরেই শোনা গেল, রাজনগরের রাজপুত্র সুন্দর সিংহের সঙ্গে প্রতাপপুরের মহারানি সুমিত্রাদেবীর বিবাহ!

রাজনগর খুব বড়ো রাজ্য নয় বটে, কিন্তু মন্ত্রীরা তবু আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। রানিজির যা মেজাজ! কোন দিন কী এক অসম্ভব বিবাহের বায়না ধরে বসেন, এই ছিল তাঁদের বিষম ভয়! তাঁরা স্থির করলেন, পরের মাসেই এই শুভ কাজটা শেষ করে ফেলে একেবারে নিশ্চিন্ত হতে হবে।

সুমিত্রা হৃদয়-রাজ্য জয় করে সুন্দর সিংহ রাজনগরে ফিরে গেলেন। এবং সেখান থেকে ভবিষ্য বধূকে আমন্ত্রণলিপি পাঠালেন নিজের দেশ দেখবার জন্যে।

মন্ত্রীরা ঘন ঘন মস্তক আন্দোলন করে জানালেন, অসম্ভব। এটা হচ্ছে চিরন্তন রীতি-বিরুদ্ধ। বিবাহের আগে মহারানিজির রাজনগরে যাওয়া হতেই পারে না।

সুমিত্রা বললেন, 'চিরন্তন রীতি, সনাতন প্রথা এ-সব হচ্ছে সেকেলে কথা। এখন ওদের শিকেয় তুলে রেখে আমার রাজনগর যাওয়ার আয়োজন করুন।'

—'সে কী মহারানি, লোকে কী বলবে?'

—'লোকে ঘরে বসে যা খুশি বলুক, আমি তা শুনতে পাব না। কালই আমি রাজনগরে যাত্রা করব, এইটুকুই খালি মনে রাখবেন।'

সুমিত্রার দৃঢ় সংকল্পের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চলল না।

প্রতাপপুর থেকে রাজনগরে যাবার জন্যে রেলপথ নেই। পথের অধিকাংশ পর্বতে ও অরণ্যে দুর্গম! কিন্তু মোটরে যাতায়াত করবার রাস্তা আছে।

যথাসময়ে সুমিত্রা রাজনগরে যাত্রা করলেন সদলবলে। আদবকায়দা যথাসম্ভব বজায় রাখবার জন্যে সঙ্গে চললেন এক বিজ্ঞ মন্ত্রী। রাজ্ঞী-মহিমা রক্ষা করবার জন্যে একদল সৈন্য নিয়ে সেনাপতিও রওনা হলেন।

সুমিত্রার গাড়িতে যে সহচরী ছিলেন তাঁর নাম কমলা।

গাড়ি যখন প্রতাপপুরের সীমানা ছাড়াল, কমলা বললে, 'রানিজি, জয়গড় রাজ্য পড়বে আমাদের পথেই।'

—'জয়গড়? চন্দ্র সিংহের রাজ্য?'

—'হ্যাঁ রানিজি, চন্দ্র সিংহ হচ্ছেন আপনারই সামন্ত রাজা। কিন্তু মনে আছে তো, আপনাকে বিবাহ করবার জন্যে গেল বছরে তিনি কী-রকম গোলমাল করেছিলেন?

মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে সুমিত্রা বললেন, 'না কমলা, আমার উপরে নয়, চন্দ্র সিংহের লোভ ছিল আমার রাজ্যের উপরে। তিনি জানতেন, আমাকে পেলে আমার রাজ্যও তাঁর হস্তগত হবে। চন্দ্র সিংহ বড়ো বুদ্ধিমান।'

—'তিনি কেবল বুদ্ধিমান নন রানিজি, লোকে বলে তাঁর স্বভাবও পাথরের মতো কঠিন। তিনি যা ধরেন ছাড়েন না।'

—'তুমি কী বলতে চাও কমলা? তাঁর রাজ্যের মধ্যে পেলে তিনি কি আমাকেও ছাড়বেন না?'

—'না রানিজি, অতটা সাহস তাঁর হবে বলে মনে হয় না। তবে এটা তো সবাই জানে, আপনি তাঁকে বিবাহ করতে চাননি বলে তিনি প্রায় বিদ্রোহ ঘোষণা করতে উদ্যত হয়েছিলেন।'

সকৌতুকে হেসে উঠে সুমিত্রা বললেন, 'বিদ্রোহ করে কেউ কোনো দিন নারীর প্রাণ দখল করতে পারেনি! আর একালে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে এমন কোনো সামন্ত-রাজা আছে নাকি?'

—'রানিজি, এই সেদিন জয়পুরের রাজার সঙ্গে এক সামন্ত-রাজার যে লড়াই হয়ে গেল, খবরের কাগজে আপনি কি তা পড়েননি?'

—'কমলা, মিছে আজগুবি ভাবনা ভেবে মন ভারী কোরো না। তার চেয়ে চারিদিকে চেয়ে দ্যাখো,—কী সুন্দর!'

গাড়ি তখন একটি পাহাড়ে-পথ ধরে ঊর্ধ্বগামী হয়েছে। সকলে যত উপরে উঠছে পৃথিবীকেও দেখাচ্ছে তত চমৎকার! কোথাও রৌপ্য হারের মতো উজ্জ্বল নদী, কোথাও শ্যামলতার স্বর্গের মতো স্নিগ্ধ বনভূমি, কোথাও রূপকথার কল্পনামাখা তেপান্তর মাঠ! সামনে কে যেন চিত্রপটের পর চিত্রপট খুলে রেখেছে।

সুমিত্রা তখন মনে মনে ভাবছেন, এই পথের শেষে আছে আমার রূপকথার রাজ্য—আমার রূপকথার রাজকুমার! এই পথ আমাকে নিয়ে যাবে তাঁর কাছে, এই পথ আমার প্রাণের বন্ধু!

পরদিন বৈকালে গাড়ি গিয়ে পৌঁছাল জয়গড়ের রাজধানীতে।

সুমিত্রা মুখ বাড়িয়ে দেখলেন, নগর-তোরণের সামনেটা লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েছে। বড়ো বড়ো রাজকর্মচারী, সেপাই-শাস্ত্রী, গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সাধারণ প্রজা সবাই এসেছে তাঁকে অভ্যর্থনা করতে। প্রজারা তাঁর নামে জয়ধ্বনি দিলে, মন্ত্রী ও অন্যান্য রাজপুরুষরা এসে শ্রদ্ধাপূর্ণ স্বরে তাঁকে অনেক মিষ্ট কথা বললে এবং এও জানালে যে, রাজা চন্দ্র সিংহ এখন শিকারে গিয়েছেন, তাই তিনি নিজে অভ্যর্থনা করতে আসতে পারলেন না এবং এজন্যে তারা অত্যন্ত দুঃখিত, ইত্যাদি।

সুমিত্রা মনে মনে বললেন, 'চন্দ্র সিংহ নেই বলে আমি কিন্তু অত্যন্ত সুখী হয়েছি। আমি তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছি। তিনি এখানে এসে আমাকে আদর-যত্ন করলে লজ্জায় আমি মুখ তুলে তাকাতে পারতুম না! মাগো, খুব বেঁচে যাওয়া গিয়েছে!'

অভিনন্দনের পালা শেষ হলে পর গাড়ি আবার অগ্রসর হল।

এইবারে আরম্ভ হল সবচেয়ে দুর্গম পথ।

প্রকাণ্ড এক আকাশ-ছোঁয়া পাহাড় যেন মাথার উপরে ভেঙে পড়বার জন্যে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারই মাঝখান দিয়ে এক দুরারোহ চড়াই এবং তার দুই ধারেই গভীর খাদ।

ধীরে ধীরে অতি-সন্তর্পণে যাত্রীদের মোটরগুলো উপরে উঠতে লাগল।

ক্রমেই আসন্ন সন্ধ্যার আঁধার-অঞ্চল অধিকতর ঘনীভূত হয়ে উঠছে। বন্য পাখির দল কলরব করতে করতে বাসার দিকে ফিরে গেল। তারপর পৃথিবী হয়ে গেল একেবারে মৌন ও অন্ধ।

...রাত করছে ঝিম ঝিম ঝিম। এপাশে, ওপাশে, চারিপাশে অন্ধকার—আকাশের অতি-ক্ষীণ চাঁদের রেখাকে দেখাচ্ছে যেন মুমূর্ষু আলোকের বোবা আর্তনাদের মতো।

সুমিত্রা মনে মনে ভাবছেন, রূপকথার রাজ্যে যাবার পথ এত বন্ধুর!

কমলা ভয়ে আর কথা কইছে না—তার চোখের সামনে জাগছে কেবল দুই পাশের ভীষণ খাদের অতলতা!...

রাত যখন বারোটা বাজে বাজে, তখন দূর থেকে হঠাৎ এক চিৎকার জেগে রাত্রির স্তব্ধতা ভেঙে দিলে।

গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল।

সুমিত্রা সচমকে শুধোলেন, 'কে চ্যাঁচালে?'

ড্রাইভার বললে, 'আমাদের সেপাই। ও গাড়ি থামাতে বলছে।'

কমলা একবার ভয়ে ভয়ে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে চোখ চালাবার চেষ্টা করলে। কিছু দূরে আকাশের কতক স্বচ্ছ অন্ধকার পটে লিপ্ত হয়ে রয়েছে কালিমাখা দুই তুঙ্গ শৈলচূড়া।

সে শিউরে উঠে অস্ফুট স্বরে বললে, 'রানিজি, প্রেতশিখর!'

—'প্রেতশিখর! সে আবার কী?'

প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় কমলা বললে, 'লোকে বলে ওই শিখরের কাছে রাতে যারা দেখা দেয় তারা মানুষ নয়!'

ঠিক সেই সময়ে এদিকে-ওদিকে লণ্ঠনের আলো ছড়াতে ছড়াতে একজন সেপাই এগিয়ে এল।

সুমিত্রা বললেন, 'কী হয়েছে?'

সেপাই সেলাম করে বললে, 'পাহাড় ধসে পড়ে পথ বন্ধ হয়ে গেছে। আজ আমাদের এইখানেই থাকতে হবে।'

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

প্রেত-শিখরের বিভীষিকা

সেপাইয়ের কথা শুনে কমলা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল।

কিন্তু সুমিত্রার মুখে ফুটল তরল কৌতুক-হাসি!

অভিযোগ-ভরা স্বরে কমলা বললে, 'রানিজি, আপনি হাসছেন!'

সুমিত্রা হাসতে হাসতে বললেন, 'কাঁদতে আজও শিখিনি কমলা! আর অকারণে কাঁদবই বা কেন?'

—'অকারণে, রানিজি? এই অন্ধকার ঘুটঘুটে রাত, এই ভয়ানক প্রেত-শিখর, এই কনকনে হাড়ভাঙা শীত আর দু-পাশে এই অতল খাদ! এখানে মানুষ থাকতে পারে?'

—'যখন মানুষ থাকতে পারে না তখন তোমার কোনোই ভয় নেই কমলা! মানুষ যেখানে থাকে না ভূতও সেখানে আসে না! কারণ ভূতের একমাত্র পেশা

হচ্ছে মানুষকে ভয় দেখানো। এখানে মানুষ নেই জেনে কোনো পেশাদার ভূতই এ পথ মাড়াবে না!'

—'রানিজি, রানিজি! আপনার পায়ে পড়ি রানিজি! প্রেত-শিখরে দাঁড়িয়ে প্রেত নিয়ে ঠাট্টা করবেন না! ওদিকে চেয়ে দেখুন, পাহাড়ের তলায় অন্ধকার যেন পাথরেরও চেয়ে নিরেট! ওখানে ওগুলো কী জ্বলছে?'

আবার খিল খিল করে হেসে উঠে সুমিত্রা বললেন, 'ভূতের চোখ নয়, ওগুলো জোনাকি!'

ভয়ার্ত স্বরে কমলা বললে, 'না—না রানিজি! আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি, ওখানে সাদা কাপড় পরে একটা মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে!'

সুমিত্রা কিছুই দেখতে পেলেন না, দেখবার চেষ্টা করেও।

এমন সময়ে মন্ত্রীমশাই এসে পড়লেন। সুমিত্রাও মোটর থেকে নেমে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন।

মন্ত্রী ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'গাড়ি থেকে নামবেন না রানিজি, এখনই ঠান্ডা লেগে যাবে!'

—'আমার মাথার একটা চুলও এখনও পাকেনি মন্ত্রীজি, ঠান্ডা লাগবার বয়স আজও আমার হয়নি!'

—'কিন্তু পথের দু-পাশেই যে খাদ! এই অন্ধকারে—'

—'খাদ দিয়ে গড়াতে গড়াতে নীচে নামবার শখও আমার নেই, আপনি অনায়াসেই নিশ্চিন্ত হতে পারেন!'

—'না রানিজি, আপনি দয়া করে গাড়িতে গিয়ে উঠুন।'

—'কেন বলুন দেখি?'

—'জায়গাটা ভালো নয়।'

—'তার মানে?'

—'লোকে বলে—'

—'থাক। লোকে কী বলে আমি শুনেছি। তাহলে আপনারও কুসংস্কার আছে?'

—'কুসংস্কার নয়, রানিজি! এখানে মাঝে মাঝে মানুষের মৃতদেহ পাওয়া যায়।'

—'দুষ্টু ডাকাতের কীর্তি! আমাদের সঙ্গে সেপাই আছে।... কিন্তু ও-কথা যেতে দিন। আসল ব্যাপার কী বলুন দেখি?'

—'মস্ত একখানা পাথর পথের উপরে ভেঙে পড়েছে। যে-সে পাথর নয়, ছোটোখাটো একটি পাহাড় বললেই হয়। আমরা পঞ্চাশজনে মিলে ঠেলাঠেলি করলেও সেখানাকে সরাতে পারব না।'

—'তাহলে আবার কি আমাদের ফিরে যেতে হবে?'

—'ফিরে গেলেই ভালো হত।'

প্রবল ভাবে মাথা নেড়ে সুমিত্রা বললেন, 'অসম্ভব! ফিরে আমি কিছুতেই যাব না!'

মন্ত্রী মৃদু হাস্য করে বললেন, 'আপনার স্বভাব আমি জানি রানিজি! তাই রাজা চন্দ্র সিংহের কাছে লোক পাঠিয়েছি।'

—'রাজা চন্দ্র সিংহ! তিনি এখন কোথায়?'

—'এখান থেকে মাইল-খানেক তফাতে তাঁর একটি শৈল-প্রাসাদ আছে। শিকারে এসে তিনি সেইখানেই আছেন। আজ রাতে আমরা তাঁর অতিথি হতে চাই। তারপর কাল সকালে আরও বেশি লোকজন আনিয়ে পাথরখানা সরিয়ে ফেলবার ব্যবস্থা করা যাবে।'

সুমিত্রা একবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন।

আকাশের বাঁকা চন্দ্রকলা তখনও অন্ধকারের কবল থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে এবং হাজার হাজার তারা যেন নিষ্পলক নেত্রে দেখছে সেই জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্ব।

আরও নীচে কালো পাহাড়ের পর কালো পাহাড়ের শিখর ও নতোন্নত দেহ—সে-যেন স্তব্ধ আঁধার-সমুদ্রের স্তম্ভিত, উত্তুঙ্গ তরঙ্গদল!

থেকে থেকে শীতার্ত নিশীথের তুষারশীতল দীর্ঘশ্বাসের মতো বাতাস জেগে উঠছে এবং সঙ্গে সঙ্গে শোনা যাচ্ছে শিউরে-ওঠা গাছে গাছে পাতাদের মর্মর-কান্না!

সুমিত্রা বললেন, 'মন্ত্রীজি, রাজা চন্দ্র সিংহকে খবর না দিলেই পারতেন!'

মন্ত্রী দুই চোখ বিস্ফারিত করে বললেন, 'বলেন কী মা, এই দুরন্ত শীতে এমন জায়গায়—'

বাধা দিয়ে সুমিত্রা বললেন, 'না মন্ত্রীজি, এ আমার বেশ লাগছে! চিরদিন বন্দি হয়ে আছি শহরের হট্টগোল, ইট-পাথরের খাঁচায়, এখানে এসে পাচ্ছি যেন এক উদ্দাম স্বাধীনতা, মন ছড়িয়ে পড়তে চাইছে আকাশে-বাতাসে অসীম আনন্দে!

ইচ্ছে হচ্ছে ছুটে এগিয়ে যাই এই পথ ধরে...' বলেই সুমিত্রা দ্রুতপদে সামনের দিকে চলতে শুরু করলেন!

—'করেন কী, করেন কী রানিজি, এখনই পড়ে যাবেন যে, কী বিপদ!'—মন্ত্রী তাড়াতাড়ি টিপে ধরলেন হাতের বিজলি-মশালের চাবি!

হাত পাঁচ-ছয় তফাতেই প্রখর আলোকরেখার মধ্যে হঠাৎ বিষম দুঃস্বপ্নের মতো জাগ্রত হয়ে উঠল ও কার ভীষণ মুখ! প্রজ্বলিত দুই চক্ষু, স্ফীত নাসারন্ধ্র, বিকশিত উগ্র দন্ত! সেই ভ্রুকুটিকুটিল মুখ দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে যেন অমানুষিক হিংসা ও ক্ষুধিত পশুত্ব! পরমুহূর্তেই মূর্তি গেল মিলিয়ে!

গাড়ি থেকে কমলা তীক্ষ্ণ স্বরে কেঁদে উঠল!

সুমিত্রা দাঁড়িয়ে পড়লেন, স্তম্ভিত হয়ে।

মন্ত্রী কিছু দেখতে পেলেন না, তাঁর ভীত দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল কেবল সুমিত্রার দিকেই। কিন্তু কমলার কান্না শুনে তিনি চকিত স্বরে বললেন, 'কী হল, কী হল? কমলাদেবী কেঁদে উঠলেন কেন?'

সুমিত্রা বিকৃত স্বরে বললেন, 'ও কে মন্ত্রীজি, ও কে?'

মন্ত্রী আরও বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কার কথা বলছেন রানিজি?'

—'ও কার মুখ দেখলুম? ও কি মানুষের মুখ?'

—'মুখ? কোথায়?' —মন্ত্রী হাতে 'টর্চে'র আলো ফেলতে লাগলেন চতুর্দিকে, কিন্তু কেউ কোথাও নেই। তিনি চিৎকার করলেন, 'সেপাই! সেপাই! এদিকে এসো—জ্বালো আলো!'

বিশ-পঁচিশ জন সেপাই পেট্রলের উজ্জ্বল লণ্ঠন নিয়ে ছুটে এল। সেনাপতি বার করলেন রিভলভার।

আধুনিক আলোকের তীব্রতায় সেখানকার প্রাচীন অন্ধকার হল অদৃশ্য! পথের উপরে অন্য কেউ নেই। খানিক তফাতে পথ জুড়ে পড়ে আছে খালি একখানা প্রকাণ্ড পাথর।

পথের দুই দিকেই নেমে গিয়েছে গভীর খাদ। কিন্তু ডানদিকের খাদে একটা ব্যাপার লক্ষ করা গেল।

পাহাড়ের প্রায়-খাড়া গায়ের উপরে রয়েছে একটানা ঝোপের পর ঝোপ।

ঝোপের বাইরে কিছু নেই বটে, কিন্তু শ্রেণিবদ্ধ ঝোপের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে নিম্নমুখী একটা স্পন্দন-রেখা! ঝোপের ভিতর দিয়ে কেউ যেন বেগে নেমে যাচ্ছে নীচের দিকে! কে সে? মানুষ, না কোনো হিংস্র জন্তু?

সেপাইদের তিন-চারটে বন্দুক চারিদিক কাঁপিয়ে গর্জন করে উঠল। কিন্তু সেই স্পন্দন-রেখা থামল না। ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে আলো-সীমানার বাইরে চলে গেল।

মন্ত্রী তখন শীতেও ঘেমে উঠেছেন। চিৎকার করে ডাকলেন, 'ফিরে আসুন—ফিরে আসুন রানিজি! শিগগির গাড়িতে উঠুন!'

মন্ত্রীর কণ্ঠস্বর অনেকটা আদেশ-বাণীর মতো শোনাল বটে, কিন্তু সুমিত্রা এবারে আর তা অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। তাঁর মনে আর উদ্দাম স্বাধীনতার কোনো আনন্দই নেই, তাড়াতাড়ি তিনি নিজের মোটরের দিকে ফিরে এলেন অভিভূতের মতো। কমলা তখন প্রায়-অজ্ঞান।

সেনাপতি বললেন, 'মন্ত্রীজি, পাহাড়ের অত-ঢালু গা বয়ে মানুষ কখনো ও-ভাবে নেমে যেতে পারে?'

রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে মন্ত্রী বললেন, 'আমিও তাই ভাবছি।'

সেনাপতি অস্ফুট স্বরে বললেন, 'তবে কি লোকে প্রেতশিখরের কথা যা বলে তা মিথ্যে নয়?'

মন্ত্রী বললেন, 'লোকের কথা নিয়ে এখন মাথা ঘামাবার সময় নেই। এই মাথাপাগলা রানিকে নিয়ে মানে মানে যথাস্থানে পৌঁছোতে পারলেই বাঁচি!'

ঠিক সেই সময়ে জেগে উঠল যেন নিশীথরাতের স্তব্ধতা! অন্ধকারের বুকে বাজছে ঘোড়ার পায়ের শব্দ! শুনলেই বোঝা যায় একটা নয়, ঘোড়া আসছে অনেকগুলো।

মন্ত্রী বললেন, 'নিশ্চয় রাজা চন্দ্র সিংহের লোক!'

যেন অন্ধকারের বুক ফুঁড়ে আত্মপ্রকাশ করল একে একে অনেকগুলো অশ্বারোহীর অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি।

সর্বপ্রথম অশ্বারোহী একেবারে সুমিত্রার মোটরের সামনে এসে এক লাফে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। একবার এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে দেখলে। তারপর মোটরের দিকে ফিরে অভিবাদন করে বললে, 'মহারানি সুমিত্রাদেবী, আপনি আমার অতিথি হতে চেয়েছেন বলে নিজেকে আমি ভাগ্যবান বলে মনে করছি।'

সুমিত্রা সবিস্ময়ে বললেন, 'আপনার অতিথি!... তবে কি... তবে কি আপনি—'

—'আমার নাম চন্দ্র সিংহ।'

—'আপনি নিজে এসেছেন!'

—'আপনার মতো অতিথিকে ভৃত্য পাঠিয়ে অভ্যর্থনা করা উচিত মনে করি না।'—বলেই চন্দ্র সিংহ হাত বাড়িয়ে মোটরের দরজা খুলে দিলেন।

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

নর ও নারী

লণ্ঠনগুলোর উজ্জ্বল আলো রাজা চন্দ্র সিংহের মূর্তির উপরে এসে পড়েছে।

নতুন কোনো মানুষ চোখের সামনে এলে প্রথম দৃষ্টিতেই ভালো করে দেখবার চেষ্টা করাটা হচ্ছে স্ত্রীজাতি-সুলভ কৌতূহলের একটা প্রধান লক্ষণ। এবং মহারানি হলেও সুমিত্রা নারীদের এই বিশেষত্ব থেকে বঞ্চিত ছিলেন না। একজন নতুন লোককে ভালো করে দেখতে গেলে পুরুষের যথেষ্ট সময়ের দরকার হয়। কিন্তু মেয়েরা যা দেখবার, টপ করে দেখে নেয়। সুমিত্রার মনের ক্যামেরার প্লেটে চন্দ্র সিংহের ছবি উঠে গেল এক মুহূর্তেই।

সুমিত্রা শুনেছিলেন চন্দ্র সিংহের বয়স বত্রিশের কম নয়। কিন্তু তাঁকে দেখাচ্ছে ঠিক বাইশ বৎসরের যুবকের মতো।

দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, প্রায় গৌর বর্ণ, প্রশস্ত কপাল, উন্নত নাক, দাড়ি-গোঁফ কামানো—মুখ-চোখ দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে যেন উগ্র আভিজাত্যের গর্ব। ভাব-ভঙ্গি শিক্ষিত সৈনিকের মতো।

প্রথম দর্শনেই সুমিত্রা বুঝলেন, এ হচ্ছে গোটা পুরুষের মূর্তি। এ-রকম মানুষ মহিলার প্রতি সামাজিক সম্মান দেখাতে পারে, কিন্তু নারীত্বের মায়াময় ফাঁদে বন্দি হবার মতো দুর্বলতা প্রকাশ করে না। এ যেন প্রভুর মূর্তি, এর কাছে দাসীর মতো গেলে অনুগ্রহ লাভের সম্ভাবনা আছে, কিন্তু মাথা উঁচু করে দাঁড়ালে ফিরে আসতে হবে ব্যথা পেয়ে।

সুমিত্রা হচ্ছেন দস্তুরমতো বিংশ শতাব্দীর নারী—তাঁর প্রাচ্য-মনের মধ্যেও খেলা করে পাশ্চাত্য সভ্যতার অবাধ আলো-বাতাস। পুরুষের মধ্যে প্রভুর রূপ দেখলে সুমিত্রার আত্মসম্মান করতে চায় বিদ্রোহ প্রকাশ। চন্দ্র সিংহের মধ্যে তিনি

দেখতে পেলেন যেন কোনো শত্রুর মূর্তি! তাই তৎক্ষণাৎ আত্মরক্ষার জন্যে সচেতন হয়ে উঠলেন।

জীবের মধ্যে এই সচেতনতা জাগানো হচ্ছে সহজ সংস্কারের ধর্ম। যে বিড়াল-শিশু কখনো দেখেনি, প্রথম কুকুর দেখলেও সে এক পলকে সচেতন হয়ে উঠবে; ঠিক বুঝতে পারবে যে এ হচ্ছে পরম শত্রু!

সুমিত্রা ভাবছেন, এই রাজা চন্দ্র সিংহ? ইনিই আমাকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন? ভাগ্যে মত দিইনি! মানে মানে বেঁচে গিয়েছি!

চন্দ্র সিংহ বললেন, 'রানিজি, অনুগ্রহ করে গাড়ি থেকে নামুন!'

সুমিত্রার লক্ষ করতে ভুল হল না যে, আদবকায়দায় দুরন্ত কণ্ঠস্বরের মধ্যে ভদ্রতা আছে, কিন্তু আন্তরিকতার অভাব।

সুমিত্রার দৃষ্টি মুহূর্ত-মধ্যে চন্দ্র সিংহের অস্তিত্ব ভুলে গেল। অন্যদিকে ফিরে তিনি ডাকলেন, 'মন্ত্রীজি!'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ রানিজি!'

—'আজ রাতে তাহলে পথ খোলা পাব না?'

—'না রানিজি।'

—'কিন্তু এত রাতে কারুর আতিথ্য স্বীকার করা উচিত নয়। আমাকে না জানিয়ে রাজাকে খবর দিয়ে আপনারা ভালো করেননি।'—তারপরই আবার ফিরে বললেন, 'নয় রাজা? আপনাকে কি কষ্ট দেওয়া হল না?'

চন্দ্র সিংহের ওষ্ঠাধরের উপরে খেলে গেল যেন ব্যঙ্গের হাসি। নতনেত্রে বললেন, 'রানিজি ইংরেজিতে খুব পটু বলেই শুনেছি। ইংরেজি ভাষায় 'শিভালরি' বলে একটা শব্দ আছে, তিনি নিশ্চয়ই তার অর্থ জানেন।'

সুমিত্রা আবার লক্ষ করলেন, চন্দ্র সিংহ এবারে আর সরাসরি তাঁকে সম্বোধন করে কথা কইলেন না। বুঝলেন তাঁর উপেক্ষার ভাব বুঝতে রাজার পক্ষে দেরি হয়নি। মনে মনে হেসে প্রকাশ্যে বললেন, 'শিভালরি শব্দের অর্থ নানা রকম। তার মধ্যে দুটো অর্থ হচ্ছে, নারীসেবায় অনুরাগ আর দুর্বলকে রক্ষা করবার প্রবৃত্তি। রাজা 'শিভালরি' বলতে কোন অর্থ বোঝেন?'

সকলের অগোচরে চন্দ্র সিংহ করলেন ওষ্ঠ দংশন। বললেন, 'নারী সেবার আনন্দ থেকে আমি বঞ্চিত। তবে দুর্বলাকে রক্ষা করা রাজধর্ম বলেই জানি।'

সুমিত্রা বললেন, 'রাজা আমার সৈনিকদের দিকে তাকালেই বুঝবেন, ভগবানের কৃপায় আমি দুর্বল বা অসহায় নই।'

সুমিত্রার মতো চন্দ্র সিংহ মনে মনে হাসলেন না, তাঁর উচ্চ হাসি রানিজিরও কানের ভিতরে গিয়ে পৌঁছল বিদ্রূপের মতো। হাসতে হাসতে তিনি বললেন, 'মানুষ বাইরে সেপাইয়ের পাহারা বসায় লোকের চোখ ঠকাবার জন্যেই। আমাদের আসল দুর্বলতা গোপনে বাস করে মনের ভিতরেই। আমার চোখ তালপাতার সেপাইদের পাহারা ভেদ করে মানুষের মনের মধ্যে ঢোকবার পথ জানে।'

সুমিত্রা বললেন, 'রাজার দৃষ্টিশক্তি বিস্ময়কর।' কিন্তু তারপরে প্রকাশ্যে কৌতুকহাস্য করেই মনে মনে বললেন, 'রাজার কথাগুলো এবারে বড়ো বেশি স্পষ্ট হবার চেষ্টা করছে। আর এ বিপজ্জনক অভিনয়ের দরকার নেই। কিন্তু চন্দ্র সিংহকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার, তিনি আমারই সামন্ত-রাজা ছাড়া আর কিছুই নন।'

ওদিকে মন্ত্রীমশাই কেবল ব্যস্ত নন, ক্রমে ভীত হয়েও উঠছেন। যেমন পাগলি রানি, তেমনি বন্য রাজা! ওদের কথাগুলো সাধারণের কাছে হেঁয়ালির মতো শোনালেও তাঁর কাছে হেঁয়ালি নয়, মানে বেশ বোঝা যায়—অর্থপুস্তকের দরকার হয় না। এ হচ্ছে পুরোদস্তুর দ্বন্দ্বযুদ্ধ, দুই প্রতিদ্বন্দ্বীই তরবারি চালনায় সুদক্ষ। এঁদের আর অবসর দেওয়া উচিত নয়।

রানির শেষ কথার কোনো উত্তর দেবার আগেই মন্ত্রী তাড়াতাড়ি চন্দ্র সিংহের কাছে গিয়ে বললেন, 'মহারাজ, আপনার প্রাসাদে যাবার পথে মোটর চলে তো?'

—'না।'

—'তাহলে আমাদের কি হাঁটতে হবে?'

—'আপনাদের জন্যে ঘোড়া আছে আর মেয়েদের জন্যে আছে ডুলি।'

সুমিত্রা তীক্ষ্ণস্বরে বললেন, 'মন্ত্রীজি, যে-মেয়েরা ডুলিতে চাপে আমি তাদের দলে নই।'

মন্ত্রী দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'অসম্ভব। আপনি ঘোড়ায় চড়তে পারেন আমি তা জানি। কিন্তু অন্ধকার রাতে এই পাহাড়ের উপরে আপনার ঘোড়ায় চড়া হবে না।'

সুমিত্রা হেসে উঠে বললেন, 'বেশ, তাহলে প্রাচীনের বচনই গ্রাহ্য করতে বাধ্য হব।'

চন্দ্র সিংহ আবার অভিবাদনের ভঙ্গিতে সামনের দিকে একটু নত হয়ে বললেন, 'রানিজির ডুলি প্রস্তুত।'

সুমিত্রার হঠাৎ নিজের হাতের হিরার আংটিটা পরীক্ষা করবার জন্যে অত্যন্ত আগ্রহ হল, চন্দ্র সিংহের কথা যেন তিনি শুনতেই পেলেন না।

কমলা বললে, 'উঠুন রানিজি, আর যে শীত সইতে পারছি না—হাড়ে হাড়ে কাঁপুনি ধরেছে!'

চন্দ্র সিংহ অত্যন্ত শুকনো হাসি হেসে বললেন, 'মন্ত্রীজি, আপনি রানিজিকে সাহায্য করুন। উনি নারী, শীতে কাতর হয়েছেন।'

মন্ত্রী সাহায্য করতে অগ্রসর হলেন। সুমিত্রা ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, 'না, না, আমাকে সাহায্য করতে হবে না। আমি নিজেই নামতে পারব!'

গাড়ি থেকে নেমে পড়েই সুমিত্রা চট করে একবার চন্দ্র সিংহের মুখ দেখে নিলেন।

চন্দ্র সিংহের মুখে আবার ব্যঙ্গের হাসি। সে হাসি বোবা নয়। সে যেন বলতে চায়—রানি, যতই একেলে পুরুষত্বের অভিনয় করো, তোমার বুকে বাস করছে সেকেলে নারীত্বই। কোথায় ঘা মারলে তোমার লাগবে আমি তা জানি!

রানিকে গাড়ি থেকে নামাবার উপায় যে কত সহজ সেটা দেখে মন্ত্রী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে হেসে নিলেন।

সেটাও সুমিত্রার চোখ এড়াল না। মনে মনে রেগে যেন তিনটে হয়ে তিনি হনহন করে এগিয়ে চললেন একদিকে।

দীর্ঘপদক্ষেপ করে সুমিত্রার অগ্রবর্তী হয়ে চন্দ্র সিংহ বললেন, 'রানিজি, ওদিকে গেলে পাবেন খালি খাদ আর অন্ধকার। পথ আছে এদিকে।'

জবাব না দিয়ে সুমিত্রা ফিরে চন্দ্র সিংহের পিছনে পিছনে যেতে লাগলেন।

চন্দ্র সিংহ বললেন, 'রানিজি, ভগবান অনেক ভেবেচিন্তেই নারীকে পথ দেখাবার অধিকার দিয়েছেন পুরুষকে।'

সুমিত্রা বললেন, 'ভগবান নারীকে কী অধিকার দিয়েছেন, রাজা বোধহয় সে-খবরও রাখেন?'

—'হ্যাঁ। পুরুষের সঙ্গিনী হবার।'

সুমিত্রা জবাব দিতে যাচ্ছেন, হঠাৎ তাঁর চোখ উঠল চমকে। তাঁরা তখন যেখান দিয়ে যাচ্ছেন তার দুইধারেই পাহাড়ের খাড়া প্রাচীর, তার কোলে জঙ্গল এবং মাঝখানে একটা ঢালু পথ—ধীরে ধীরে নেমে গিয়েছে নীচের দিকে। সুমিত্রা স্পষ্ট দেখলেন, জঙ্গল ফাঁক করে অদ্ভুত একখানা মুখ বেরিয়ে পড়ল, দুই চক্ষু তার করলে যেন অগ্নিবৃষ্টি এবং তারপরেই মিলিয়ে গেল বিদ্যুতের মতো।

সুমিত্রা স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর মুখ দিয়ে বেরুল, 'রাজা!'

চন্দ্র সিংহ থমকে দাঁড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'কি রানিজি?' বেশ বোঝা গেল, সুমিত্রার স্বর শুনে তিনি বিস্মিত হয়েছেন।

নিজের দুর্বলতায় নিজের উপরেই ক্রুদ্ধ হয়ে সুমিত্রা তাড়াতাড়ি আপনাকে সামলে নিয়ে সহজ স্বরে বললেন, 'রাজা, ডুলি কি আপনার শৈল-প্রাসাদে আছে?'

—'চলতে কষ্ট হচ্ছে বুঝি? এজন্যে আমি দুঃখিত। কিন্তু আর হাঁটতে হবে না রানিজি, এই মোড়টা ফিরলেই ডুলি পাবেন।'

তাই পাওয়া গেল। ঘোড়া নিয়ে একদল সওয়ার ও মশাল নিয়ে একদল মশালচি সেখানে অপেক্ষা করছে। খানিক তফাতেই দেখা গেল, কালো ও নিবিড় এক বন।

চন্দ্র সিংহ বললেন, 'এইবারে আমাদের ওই বনের ভিতর দিয়েই এগুতে হবে।'

কমলা শিউরে উঠে বললে, 'ওই বনের ভেতরে! ওখানে কি মানুষ থাকে?'

সুমিত্রা বললেন, 'না কমলা, ও বনে থাকে বনমানুষ।'

চন্দ্র সিংহ বললেন, 'রানিজি, প্রত্যেক মানুষেরই বুকের ভিতরটা খুঁজলে আবিষ্কার করবেন বনমানুষকে।'

—'আপনারও বুকের ভিতরে?'

—'আমার, আপনার, সকলকার বুকের ভিতরেই। বনমানুষে বনমানুষে পৃথিবী আচ্ছন্ন হয়ে গেছে! হাজার হাজার যুগের চেষ্টায় সভ্য হয়েছে কেবল মানুষের বাহিরটাই। কিন্তু তার মনের ভিতরে আছে বনমানুষের বাসা—আদিম কালের জঙ্গল। ...আসুন রানিজি, ডুলিতে উঠুন!'

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

রক্ষ ও রাজকন্যা

কখনো পাহাড়, কখনো অরণ্য ও কখনো নদী বা ঝরনার আশপাশ দিয়ে যে নির্জন পথটি যেন কোনো অজানার টানেই সামনের দিকে এগিয়ে আর এগিয়ে চলেছে, কবির চোখ দিয়ে দেখলে তার মধ্যে কবিতার মালমশলা পাওয়া যেত যথেষ্টই। কিন্তু সুমিত্রা এখন কবিতার কথা ভাবছেন না।

রাজনগরের পথে বাধা পেয়ে সুমিত্রার মন বিরক্ত হয়ে উঠল। রাজপুত্র সুন্দর সিংহের প্রিয় মুখের পরিবর্তে চন্দ্র সিংহের সাবধানী ভদ্রতা তাঁকে আনন্দ দিতে পারলে না।

এই চন্দ্র সিংহের অভাবিত আবির্ভাবটা যেন নিয়তির পরিহাসের মতো বলে বোধ হচ্ছে। গেল বছরে ইনিই চেয়েছিলেন সুমিত্রার জীবনকে অধিকার করতে। তাঁর ইচ্ছা সফল হয়নি বলে তিনি যে-ব্যবহার করেছিলেন তার মধ্যে ভদ্রতা ছিল না কিছুমাত্র। সুমিত্রাকে আজ অতিথিরূপে দাঁড়াতে হল তাঁর দ্বারেই!

কারুর কাছে অনুগৃহীত হওয়া সুমিত্রা একেবারেই বাঞ্ছনীয় মনে করতেন না। বিশেষ এই চন্দ্র সিংহের কাছে! এটা যেন অসহনীয়! এর চেয়ে নিজের রাজধানীতে ফিরে গিয়ে অপেক্ষা করলেই ভালো হত।

ভাবতে ভাবতে ডুলির ভিতর থেকে উঁকি মেরে সুমিত্রা দেখলেন, চন্দ্র সিংহের ঘোড়া আসছে ঠিক ডুলির পিছনে পিছনেই। সারা পথই তিনি আসছেন এই ভাবে প্রহরীর মতো।

সুমিত্রা একটা উপমার কথাও ভাবলে। অনুসরণকারী বাঘকে দেখলে হরিণীর মনের ভাব হয় কী-রকম? ...চন্দ্র সিংহ কি এখনও তার আশা ছাড়েননি? ...কিন্তু তাঁর মুখ ও ভাবভঙ্গি দেখে কিছুই ধরবার-ছোঁবার জো নেই!

ও যেন মুখ নয়, মুখোশ! তার উপরে আঁকা রয়েছে একই ভাব। আদব-কায়দা দুরস্ত অতি-সাবধানী ভদ্রতা। তাঁর দৃষ্টি নিমীলিত, ডুলির দিকে যেন চাইতেও নারাজ। তিনি যেন মহারানি সুমিত্রার সঙ্গে সঙ্গে আসছেন কঠোর কর্তব্যের খাতিরেই।

হঠাৎ রাত্রির মৌনব্রত ভঙ্গ করলে এক ভেরিধ্বনি।

সুমিত্রা গলা তুলে বললে, 'রাজা, ভেরি বাজায় কে?'

ডুলির পাশে ঘোড়া এনে চন্দ্র সিংহ বললেন, 'আমার লোক, মহারানি। আমরা প্রাসাদের কাছে এসে পড়েছি।'

ডুলি থেকে মুখ বাড়িয়ে সুমিত্রা দেখলেন, মশালের আলোতে রাতের কালোর ভিতরে জেগে উঠেছে বড়ো একটা গম্বুজ এবং খুব উঁচু উঁচু প্রাচীর।

সুমিত্রা বললেন, 'ওটা প্রাসাদ, না কেল্লা?'

চন্দ্র সিংহ বললেন, 'দুইই। আমি একে প্রাসাদ বলি বটে, কিন্তু আমার পূর্বপুরুষরা এ প্রাসাদকে দুর্গ বলেই জানতেন।'

—'রাজা, আমারও অনেক দুর্গ আছে। আমি কিন্তু দুর্গের ভিতরে কখনো বাস করিনি, এ আমার নতুন অভিজ্ঞতা।'

—'মহারানি, নূতন নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করাই হচ্ছে মানুষের জীবনের ধর্ম।'

ঘড় ঘড় ঘড় ঘড় করে কর্কশ শব্দ শোনা গেল—কারা প্রকাণ্ড এক ফটক খুলছে!

চন্দ্র সিংহ স্বর তুলে বললেন, 'প্রহরী! মহারানির ডুলি সর্বাগ্রে ভিতরে যাক!'

ডুলি ভিতরে গেল।

চন্দ্র সিংহ আবার হাঁকলেন, 'প্রহরী, ফটক বন্ধ করে দাও!'

আবার ঘড় ঘড় শব্দে ফটক বন্ধ হয়ে গেল। তারপর লোহার শিকলের ঝনঝনানি!

কমলা আড়ষ্ট স্বরে চুপি চুপি ডাকলে, 'রানিজি!'

—'কী?'

—'মনে হচ্ছে আমরা যেন জেলখানায় ঢুকলুম!'

—'চুপ!'

কমলাকে চুপ করতে বললেন বটে, কিন্তু সুমিত্রারও বুকের ভিতরটা ছাঁৎ ছাঁৎ করছিল।

পিছন থেকে চন্দ্র সিংহ বললেন, 'এটা জেলখানা নয় দেবী, এটা প্রাসাদের অন্তঃপুরে যাবার পথ।'

সুমিত্রা বললেন, 'আমার সঙ্গের লোকজনেরা কোথায়?'

—'সকলকার জন্যেই যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্তঃপুরে অন্য পুরুষের প্রবেশ নিষেধ।'

নীরস কণ্ঠস্বর, ওজন-করা কথা। তার মধ্যে যেন রহস্যের আভাসও পাওয়া যায়। সুমিত্রা আবার একবার চন্দ্র সিংহের মুখের দিকে ফিরে তাকালেন। সেই নিমীলিত দৃষ্টি! মুখ নয়, মুখোশ! ভালোমন্দ কিছু বোঝা যায় না।

এতক্ষণ তারা ছিল যেন মধ্য-যুগের কোনো দেশে। আঁধার রাত্রি, পর্বত অরণ্য নদী, জ্বলন্ত মশাল, অশ্বারোহী সৈনিক, মান্ধাতার ডুলি, গিরিদুর্গ!

হঠাৎ এখন চারিদিকে জ্বলে উঠল বিজলিবাতিতে আধুনিক বিলাসী সভ্যতার উজ্জ্বল দীপ্তি! অন্ধকার পালিয়ে গেল, একটা পাথরে-বাঁধানো অঙ্গন পেরিয়ে ডুলিও থেমে দাঁড়াল।

চন্দ্র সিংহ বললেন, 'মহারানি, এইবারে আপনাদের নামতে হবে।'

সুমিত্রা বাইরে বেরিয়ে এলেন। চন্দ্র সিংহ অগ্রসর হয়ে বললেন, 'আসুন।'

সামনেই লোহার কিল মারা মস্ত এক দরজা। ভিতরে ঢুকে খানিক এগিয়ে পাওয়া গেল আবার একটি অঙ্গন—চারিদিকে তার সারবন্দি ঘর ও টানা দালান। এককোণে সিঁড়ির সার। উপরে উঠেই আবার দালান।

এগুতে এগুতে সুমিত্রা বললেন, 'রাজা, বনের ভিতরে আপনার এই বিরাট প্রাসাদ দেখে আমার মনে পড়ছে রূপকথার রক্ষপুরীর কথা।'

চন্দ্র সিংহ একটু হাসবার চেষ্টা করে বললেন, 'হ্যাঁ, রূপকথার ঘুমন্ত রক্ষপুরীর মধ্যে থাকতেন পরমাসুন্দরী রাজকন্যা। আপনার আগমনে সে অভাব দূর হল।'

—'কিন্তু এখানে রক্ষের দেখা পাবার আশা করতে পারি কি?'

চন্দ্র সিংহ এই প্রথম পূর্ণ দৃষ্টিতে সুমিত্রার মুখের পানে তাকালেন। পর-মুহূর্তেই মুখ নামিয়ে বললেন, 'ঘুমন্ত দেবতাকে জাগাবার জন্যে সাধনা করতে হয়। কিন্তু পৃথিবীতে রক্ষ থাকে সর্বদাই সজাগ হয়ে, তার দেখা মেলে যখন-তখন।'

—'এখানেও?'

—'হয়তো এখানেও।'

—'কিন্তু রক্ষ যদি আসে, রাজকন্যাকে উদ্ধার করবে কে?'

—'ভাবনার কথা বটে। কিন্তু মহারানি, আপনি কি রূপকথার কোনো রাজপুত্রকে চেনেন না?' চন্দ্র সিংহের স্বরে উপহাসের আভাস।

সুমিত্রা গম্ভীর ভাবে বললেন, 'হ্যাঁ রাজা, রূপকথার রাজপুত্রকে আমি চিনি।'

চন্দ্র সিংহ হঠাৎ সামনের একটি দরজা ঠেলে বললেন, 'মহারানি, এই আপনার ঘর।'

সুমিত্রা ঘরের ভিতরে ঢুকলেন। চমৎকার সাজানো-গুছানো ঘর। জানলায় জানলায় বাহারি পর্দা, সোফা কোচ রেশমি কুশন, নরম কার্পেট—একদিকে একটি ড্রেসিং টেবিল, তার উপরে রয়েছে বিবিধ গন্ধদ্রব্য, শৌখীন মেয়েদের প্রসাধন সামগ্রী।

দেখতে দেখতে সুমিত্রার চোখ বিস্মিত হয়ে উঠল।

চন্দ্র সিংহ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর মুখের ভাব লক্ষ করছিলেন। মৃদু হেসে বললেন, 'মহারানি, ঘর পছন্দ হয়েছে?'

—'রাজা, আমি বিস্মিত হয়েছি।'

—'কেন?'

—'এ ঘরে কে থাকেন?'

—'এটি আমার নিজের বসবার ঘর।'

—'কিন্তু ড্রেসিং টেবিলের উপরে ওই যে জিনিসগুলি রয়েছে—'

—'না, ওগুলি আমি ব্যবহার করি না। যিনি আমার কৌমার্যব্রত ভঙ্গ করবেন ওগুলি তাঁরই জন্যে সঞ্চয় করে রেখেছি। আপাতত দরকার হলে এগুলি আপনি ব্যবহার করতে পারেন।'

তখনই প্রসঙ্গ বদলে সুমিত্রা বললেন, 'রাজা, আমি একবার মন্ত্রীমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

চন্দ্র সিংহের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। একটু চুপ করে থেকে তিনি বললেন, 'রাত ক-টা বেজেছে দেখুন।'

—'দেখেছি। দেড়টা।'

—'মন্ত্রীমশাই প্রাসাদের যে অংশে আছেন এখান থেকে সেখানে যেতে সময় লাগবে। এত রাতে তাঁর মতো বৃদ্ধের বিশ্রামে বাধা না দিয়ে মহারানি নিজে যদি বিশ্রাম করেন, তাহলে আমি আনন্দিত হব।' বলেই চন্দ্র সিংহ তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

কমলা বললে, 'রানিজি, রাজার ভাব দেখলে মনে হয়, উনি যেন মন্ত্রীমশাইয়ের সঙ্গে আপনাকে দেখা করতে দিতে রাজি নন।'

সুমিত্রা অন্যমনস্কের মতন বললেন, 'হুঁ।' তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। খানিকক্ষণ পরে বললেন, 'কমলা, রাজা বিবাহ করেননি, কিন্তু তাঁর ঘরে মেয়েদের সাজবার জিনিস কেন?'

কমলা অর্থপূর্ণ স্বরে বললে, 'রাজা-রাজড়াদের ঘরে কেবল বিবাহিতা স্ত্রীই থাকে না।'

—'লক্ষ করে দ্যাখো কমলা, এই সজ্জাদ্রব্যগুলো একেবারে আনকোরা নতুন।'

কমলা হঠাৎ সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'রানিজি, রানিজি! দেওয়ালের গায়ে আপনার ছবি!'

সুমিত্রাও অল্প বিস্মিত হলেন না। এগিয়ে ছবিখানা দেখতে যাচ্ছেন এমন সময়ে বাহির থেকে চন্দ্র সিংহের সাড়া এল—'ভেতরে যেতে পারি কি?'

—'আসুন।'

ঘরে ঢুকে চন্দ্র সিংহ হাসিমুখে বললেন, 'নিজের ছবি দেখছেন?'

—'রাজা, এই ছবি আর ড্রেসিং টেবিলের উপকরণগুলো এ ঘরে কবে এসেছে?'

—'আজকে।'

—'আজকে? তাহলে আপনি জানতেন, আজ আমরা এখানে আসব?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ মহারানি! রাত্রে পাহাড়ের পথ বন্ধ হলে আপনি যে আমার অতিথি হবেন, এটা অনুমান করা কঠিন নয়।'

—'কিন্তু পাহাড়ের পথ হঠাৎ বন্ধ হল কেন?'

—'আমার হুকুমে।'

—'রাজা, রাজা! এ-কথা বলতে আপনার লজ্জা হল না?'

—'কিছুমাত্র না। কারণ আপনি আমার বন্দিনী!'

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥

জয়গড়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষা

—'আপনি আমার বন্দিনী!'

চন্দ্র সিংহের এই কথাটা এতই অভাবিত যে, সুমিত্রা প্রথমটা তার অর্থই উপলব্ধি করতে পারলেন না।

তারপর তাঁর মনে হল, লোকটা নিশ্চয়ই পাগল। এই নির্জন বন-পাহাড়ে আবদ্ধ থেকে থেকে এর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তাঁর মনে করুণার সঞ্চার হল।

কমলাও বোধকরি তাই ভেবে ভয়ে ভয়ে বললে, 'রানিজি, আপনি এইদিকে সরে আসুন!'

সুমিত্রা রাজ্ঞী-মহিমায় একখানা আসনের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বললেন, 'রাজা, আপনার শরীর বোধহয় ভালো নয়। আপনি একটু ঠান্ডা হয়ে বসুন।'

চন্দ্র সিংহ একটু হেসে বললেন, 'রানিজি, আমি পাগল নই।'

—'পাগল নন? শুনে আশ্বস্ত হলুম। তাহলে আপনি যে কথা বললেন তার অর্থ কী?'

—'শুনেছি আজকাল ইংরেজি শিখে অনেকেই মাতৃভাষা ভুলে যায়। মহারানি, আপনিও কি সেই দলে? সোজা কথার অর্থ বুঝতে পারছেন না?'

—'অসম্ভব সোজা কথা শুনলে সন্দেহ হয়। আপনি যদি খুব সরল ভাষায় আজকের রাতের অন্ধকারকে বলেন পূর্ণিমার আলো, আমাকে সেটা মানতে হবে নাকি?'

—'আশা করি আমি সে-রকম কিছু বলে নিজের বোকামি জাহির করিনি।'

—'বোকা যদি নিজের বোকামি বুঝতে পারত তাহলে কেউ তাকে বোকা বলে ডাকত না।'

—'তাহলে আপনিও নিশ্চয় আমাকে বোকা বলে ডাকবেন না। কারণ কোনটা বোকামি আর কোনটা বোকামি নয়, আমি তা বুঝতে পারি বলেই মনে করি।'

—'আপনার বুদ্ধির প্রাচুর্য দেখে আমার আশা হচ্ছে যে, একটু আগে আপনি আমার সঙ্গে কৌতুক করছিলেন!'

—'মহারানি, শুনেছি অনেকেই নাকি আমার ভিতরে একটা জিনিসের অভাব লক্ষ করে।'

—'সেটা কী?'

—'আমি নাকি কৌতুক কাকে বলে জানি না।'

—'সত্য?'

—'হ্যাঁ। আমার নিজেরও সেই বিশ্বাস।'

—'আপনার বিশ্বাসটাও কৌতুককর!'

চন্দ্র সিংহ প্রথমটা জবাব না দিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর কপালের উপরে শিরা ফুলে উঠল—দেখলে মনে হয় যেন তিনি কোনো মানসিক উত্তেজনাকে দমন করবার চেষ্টা করছেন। একবার এগিয়ে গিয়ে একটা জানলা খুলে দিলেন। শীতার্ত কনকনে বাতাসের ঝাপটার সঙ্গে ঘরের ভিতরে এসে ঢুকল অরণ্যের মর্মর-ক্রন্দন। জানলার ধারে খানিকক্ষণ স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থেকে আবার তিনি ফিরে এলেন। গম্ভীর স্বরে ধীরে ধীরে বললেন, 'রানিজি, আপনার প্রতাপপুরের মতো আমার এই জয়গড় বড়ো রাজ্য নয় বটে, তবু ছেলেবেলা থেকেই আমি লালিত-পালিত হয়েছি বিলাসের কোলে। পদ্ম ফোটে পাঁকে। কিন্তু সে পাঁক ছাড়িয়ে উপরে উঠে গ্রহণ করতে চায় অম্লান নীলিমাকে, অমল সূর্যকরকে।

আমিও ওই পদ্মের আদর্শই সামনে রেখেছি—বিলাসের পঙ্ক পড়ে আছে আমার পায়ের তলায়। আমিও ঊর্ধ্বে উঠতে চাই, কিন্তু চিরদিনই বাধা পেয়ে আসছে আমার ঊর্ধ্বগতি!'

চন্দ্র সিংহ একবার থামলেন। সেই ফাঁকে সুমিত্রা বললেন, 'বাধা দিচ্ছে কারা?'

—'শুনলে খুশি হবেন না। জ্ঞান হবার পর থেকেই শুনে আসছি প্রতাপপুর মস্ত রাজ্য, জয়গড় নগণ্য, প্রতাপপুরের আশ্রিত। আমাদের ইতিহাস খুললে দেখি, প্রতাপপুরের মহারাজারা জয়গড়ের রাজাদের উপরে চিরদিনই অত্যাচার করে এসেছেন, জয়গড়কে কখনো মাথা তোলবার অবকাশ দেননি,—আমাদের এ দাসত্ব যেন বিধাতার বিধান! কিন্তু মহারানি, আমি জানি দাসত্ব কোনোদিনই বিধাতার বিধান হতে পারে না, কারণ তা স্বাভাবিক নয়।'

—'স্বাভাবিক নয়?'

—'নিশ্চয়ই নয়! যা স্বাভাবিক মনকে তা ক্ষুণ্ণ করে না। দুনিয়ার এমন দাসের কল্পনা করতে পারেন কি, যে নিজের দাসত্বের জন্যে মনে মনেও লজ্জিত নয়?'

—'পৃথিবীতে প্রভু আছে দাস নেই, এমন অস্বাভাবিক অবস্থার কল্পনাও আমি করতে পারি না।'

—'আমিও পারি না। সত্যিকার মানুষের পৃথিবী যে-স্তরে উঠতে চায় সেখানে প্রভু আর দাস, এই দুই শব্দই নেই। আধুনিক সভ্যতার চরম স্বপ্ন হচ্ছে, পরম সাম্য।'

—'ওই সাম্য অর্জন করবার জন্যেই বোধহয় অতি-সভ্য ইউরোপ আজ পৃথিবীকে রক্ত-সাগরে ডুবিয়ে দিতে চায়?'

—'মহারানি, ইউরোপের এ মনোবৃত্তিকে আমি আধুনিক মনোবৃত্তি বলি না। বিশ শতাব্দীতে জন্মালেই কেউ আধুনিক হয় না—অর্থাৎ আধুনিক মনোবৃত্তির অধিকারী হয় না। আজকের হিটলার আর মুসোলিনি হচ্ছে সেই প্রস্তরযুগের আদিম মানুষ। কিন্তু বুদ্ধদেবও জন্মেছিলেন বোধ করি সেই প্রস্তরযুগেই, অথচ তাঁর মন ছিল অতি-আধুনিক যুগের চেয়েও অগ্রসর। সভ্যতার কোনো অনাগত যুগের আধুনিকরা বুদ্ধ বা খ্রিস্টকে চিনতে পারবে, আমি তা জানি না—আজকের কোনো তথাকথিত আধুনিকই তা জানে না, সুতরাং এ আলোচনা আপাতত বন্ধ করাই ভালো।'

যে-প্রসঙ্গ নিয়ে চন্দ্র সিংহ আরম্ভ করেছিলেন পাছে আবার সেই প্রসঙ্গ তোলেন, সুমিত্রা তাই তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'কিন্তু এ আলোচনাটা আমার ভালো লাগছে—খুব ভালো লাগছে!'

চন্দ্র সিংহ হাস্যমুখে একবার সুমিত্রার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'বুদ্ধদেব আর হিটলারের স্থান হচ্ছে মানবসভ্যতার দুই প্রান্তে। আমরা কেউই যখন অতটা এগুতে বা অতটা পিছোতে পারব না, তখন ওঁদের নিয়ে আর টানাটানি না করাই ভালো। ...হ্যাঁ, যা বলছিলুম! প্রথম যেদিন জয়গড়ের গদিতে বসলুম, মনে মনে সেইদিনই প্রতিজ্ঞা করলুম, প্রতাপপুরের দাসত্ব করব না! তারপর প্রতাপপুরের অপুত্রক মহারাজা বিজয় সিংহ যেদিন—কী বলব রানিজি,—প্রাণত্যাগ করলেন, না স্বর্গে গেলেন?'

—'স্বর্গে গেলেন।'

—'তাই ভালো, অন্তত ও কথা বললে চিরাচরিত প্রথার মর্যাদা রক্ষা করা হয়। হ্যাঁ, অপুত্রক মহারাজা বিজয় সিংহ যেদিন স্বর্গারোহণ করলেন, সেইদিনই প্রতিজ্ঞা রক্ষার প্রথম সুযোগ উপস্থিত দেখে আমার মন আনন্দিত হয়ে উঠল।—'

—'আপনার ভাষা সংযত করুন মহারাজা! আপনার ভাষাতেই বলছি, আমরা বর্বর প্রস্তরযুগের মানুষ নই।'

—'কিন্তু মহারানি, প্রস্তরযুগের মানুষকে এক হিসাবে সুখ্যাতি করতে পারি। সে মনে এক, মুখে আর ছিল না। আপনার পিতার মৃত্যুতে আমি আনন্দিত হয়েছি বলে আপনি ক্রুদ্ধ হচ্ছেন? কিন্তু একবার ভেবে দেখুন, বাঘের মৃত্যুতে হরিণ কোনোদিন দুঃখপ্রকাশ করেছে? আরও একটা কথা ভেবে দেখুন। প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্যে কঠোর না হলে কি চলে? প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্যে ভীমসেন তাঁর ভাই দুঃশাসনের বুক চিরে রক্তপান করেছিলেন, তবু কেউ তাঁকে অমানুষ বলে ডাকে না। অতএব আপনার কাছে অশোভন হলেও আমার আনন্দকে আপনি অনায়াসেই ক্ষমা করতে পারেন!'

রাগে ফুলতে ফুলতে সুমিত্রা বললেন, 'আপনার বক্তব্য তাড়াতাড়ি শেষ করুন।'

—'আমি আপনাকে আশা দিচ্ছি, আমার বক্তব্য শেষ করতে রাত্রি প্রভাত হবে না। তারপর শুনুন। ...প্রতাপপুরের গদিতে বসলেন এক কুমারী রাজকন্যা। তারপরই আমার কানে কানে একজন কথা কইলেন। আমি বলব তাঁকে ভগবান, আপনি হয়তো বলবেন—শয়তান!'

অধীর স্বরে সুমিত্রা বললেন, 'তিনি কী বললেন?'

—'বললেন, 'চন্দ্র সিংহ! এ মাহেন্দ্রক্ষণকে তুমি অবহেলা কোরো না! প্রতাপপুরের সঙ্গে জয়গড়ের প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক যদি তুমি লুপ্ত করতে চাও, নিজের দেশকে যদি স্বাধীন আর শ্রেষ্ঠ করতে চাও, তবে ওই কুমারী রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করো'!'

—'রাজা, এত বড়ো বড়ো কথা আর সাতকাণ্ড রামায়ণ পাঠের পর উপসংহার শুনে আমার একটা উপমা মনে পড়ছে!'

—'যথা?'

—'পর্বতের মূষিকপ্রসব।'

—'উপমাটি ভালো। তবে কি জানেন, পর্বতের তুলনায় মূষিক নগণ্য হলেও মূষিক কখনো নিজেকে অকিঞ্চিৎকর মনে করবে না! রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করাটা আমার পক্ষে মস্ত একটা ব্যাপার নয়, কারণ আমি যাঁর পাণিগ্রহণ করব তাঁর রাজকন্যা হওয়াই উচিত। কিন্তু এই বিশেষ রাজকন্যাটির পাণি আমার পক্ষে বিশেষ রূপে লোভনীয়। কেননা তার ফলে ক্ষুদ্র জয়গড় আর বৃহৎ প্রতাপপুর হবে একই রাজার অধীন, আর সে রাজা জয়গড়েরই রাজা!'

—'আপনার মুখ দেখে সন্দেহ হচ্ছে, উপসংহারের পরেও আপনি যথেষ্ট বাক্যব্যয় করতে চান!'

—'ঠিক ধরেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে বাক্যব্যয় করলে বাক্যের অপব্যয় হবে না। কারণ উপসংহারের পরেই আরম্ভ হল চন্দ্র সিংহের আসল দুর্ভাগ্য! ভগবানের বাণী শুনে আমি রাজকন্যার পাণিপ্রার্থী হলুম। তারপর—'

সুমিত্রা বাধা দিয়ে বললেন, 'তারপর কী কী হল আমি জানি। রাজকন্যা তাঁর মহিমার উচ্চশিখর ছেড়ে পথের ধুলোয় নামতে রাজি হলেন না। আপনার পক্ষে দরকার হল তখন ঘৃণ্য ছল-বল-কৌশলের। অতিথি সেবার ভান করে রাজকন্যাকে ভুলিয়ে এনে তার উপরে করতে চাইলেন আপনি অমানুষিক অত্যাচার! ধন্য পুরুষত্ব! ধিক পশুত্ব!'

চন্দ্র সিংহের মুখ সাদা হয়ে গেল। কিন্তু তখনই সে-ভাব সামনে নিয়ে তিনি বললেন, 'যুক্তিহীন কোনো কাজেই আমি অভ্যস্ত নই। মহারানি, আমি আপনার উপরে অত্যাচার করতে চাই না, কিন্তু আপনি আমার উপরে অবিচার করছেন।'

সুমিত্রা বসেছিলেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপনার সঙ্গে আর আমি কথা কইতে ইচ্ছা করি না! ভুলে যাচ্ছেন, আপনি আমার সামন্ত রাজা।'

—'কিন্তু আপনার সঙ্গে বিবাহ হলে আর আমি সামন্ত রাজা থাকব না!'

—'বামন কোনোদিন চাঁদে হাত দেয়নি।'

—'আমি হচ্ছি অসাধারণ বামন। চাঁদকে আমি বন্দি করেছি, চাঁদ হস্তগত হতে আর বাকি কী?'

—'রাজা, আপনি আবার ভুলে যাচ্ছেন, এই সেদিন জয়পুরের মহারাজার সামন্ত শিকারের রাজা বিদ্রোহ প্রকাশ করে কুড়ুল মেরেছিলেন নিজেরই পায়ে। এখনও বলুন, আমি কী? আপনার অতিথি? না বন্দিনী?'

—'আপনাকে ও-দুয়ের কোনোটাই মনে করি না। আপনি আমার ভবিষ্য বধূ।'

সুমিত্রার মুখ রাগে লাল হয়ে উঠল। এইবারে রাগ সামলাবার জন্যে তিনিও জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন। বাইরে অন্ধকার যেন আরও গাঢ় হয়ে উঠেছে। আকাশে হাজার হাজার তারা, যেন অন্ধকারের হাজার হাজার চক্ষু। জ্বলে, আলো দেয় না।

পিছন থেকে চন্দ্র সিংহ বললেন, 'মহারানি, জানলার ধার থেকে সরে আসুন। ঠান্ডা লাগবে।'

সুমিত্রা ফিরে বললেন, 'আমি এখনই মন্ত্রীমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করব।'

চন্দ্র সিংহ অভিবাদন করে বললেন, 'মহারানি, দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, সেটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমাদের দুজনের মধ্যে একটা বোঝাপড়া না-হওয়া পর্যন্ত আপনার সঙ্গে প্রতাপপুরের কারুর দেখা হবে না। এমনকি আপনার সঙ্গিনীকেও একটু পরেই এখান থেকে চলে যেতে হবে।'

সুমিত্রার মুখে এবার ফুটল চিন্তার রেখা।

চন্দ্র সিংহ সেটা লক্ষ করে বললেন, 'এখন থেকে আপনার পরিচর্যা করবেন আমার নিযুক্ত একটি মহিলা, নাম তাঁর লক্ষ্মীবাই। সুতরাং আপনার ভয় নেই।'

গর্বিত স্বরে সুমিত্রা বললেন, 'ভয়! সামন্তরাজাকে ভয় করবার জন্যে আমি প্রতাপপুরের মহারানি হইনি।'

—'শুনে সুখী হলুম। তাহলে আপনার সামন্তরাজা এখন বিদায় নিতে পারে?'

সুমিত্রা জবাব দিলেন না। চন্দ্র সিংহ দরজার দিকে অগ্রসর হলেন। কিন্তু বাইরে যাবার আগেই সুমিত্রার ডাক শুনে আবার ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কী আদেশ মহারানি?'

—'রাজা, যাবার আগে আর একটা কথা শুনে যান।'

—'শোনবার জন্যে আমি প্রস্তুত।'

—'আপনি জানেন, রাজনগরের যুবরাজকে বিবাহ করব বলে আমি কথা দিয়েছি?'

—'জানি। আর রাজনগরের সুন্দর সিংহকেও আমি জানি বলেই বলছি, তিনি আপনার যোগ্য পাত্র নন।'

—'এ-কথা কি আপনার মুখেই আমাকে শুনতে হবে?'

—'এ কথা অন্যের মুখেই আপনার শোনা উচিত ছিল। আর তা যখন শোনেননি তখন বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, প্রতাপপুরে আপনার কোনো বিশ্বস্ত লোক নেই।'

—'আপনি আবার দুর্বোধ হবার চেষ্টা করছেন।'

—'মোটেই নয়। কারণ এ-কথা কে না জানে যে, রাজনগরের যুবরাজ তাঁর রাজ্যের এক গরিব প্রজার সুন্দরী মেয়ে যমুনা বাইকে গোপনে বিবাহ করেছেন?'

—'গোপনে?'

—'হ্যাঁ, তাঁর মহারাজা পিতাকে লুকিয়ে। তাঁর দুই ছেলেও বর্তমান। কিন্তু যমুনাবাইয়ের রূপ আর অশ্রুর চেয়ে প্রতাপপুরের সিংহাসন ঢের বেশি মূল্যবান নয় কি?'

সুমিত্রা আর সহ্য করতে পারলেন না—তাঁর দুই চোখে খেলে গেল দারুণ ক্রোধের বিদ্যুৎ! কাঁপতে কাঁপতে তিনি এগিয়ে এলেন, চিৎকার করে বললেন, 'নীচ! মিথ্যাবাদী! বিশ্বাসঘাতক! নিজের দুষ্ট ষড়যন্ত্র সফল করবার জন্যে তুমি যুবরাজের চরিত্রে কলঙ্ক মাখাতে চাও? ভাবছ তাহলেই আমি তোমার হীন প্রস্তাবে রাজি হব? তোমার মতো দুরাত্মা আমি জীবনে দেখিনি! অপদার্থ, শয়তান! বেরিয়ে যাও, এখনই এ-ঘর থেকে বেরিয়ে যাও! জানো, তুমি আমার জুতোর ধুলোর যোগ্য নও? বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও বলছি!'

এই অভাবিত আক্রমণে চন্দ্র সিংহ প্রথমটা অভিভূতের মতো হয়ে গেলেন, দুই হাতে একখানা চেয়ার চেপে ধরে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন, নীরবে। তারপর মৃদু মৃদু হাসি হেসে শান্ত স্বরে বললেন, 'মহারানি, আপনি যে ভাষায় কথা কইলেন আমি ও ভাষা শিখিনি। পাশের ঘরেই আপনার জন্যে খাবার তৈরি আছে। আজ খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে মাথা ঠান্ডা করুন, পরে যথাসময়ে আমাদের

কাজের কথাবার্তা হবে।' তারপর আবার অভিবাদন করে ঘরের বাইরে চলে গেলেন।

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥

পিঞ্জরের হরিণী

চন্দ্র সিংহ চলে যাবার পরও সুমিত্রা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন মূর্তির মতো।

তারপর হঠাৎ একখানা কোচের উপরে বসে পড়ে দুই হাতে মুখ ঢেকে শিশুর মতো কাঁদতে লাগলেন ফুপিয়ে ফুপিয়ে।

কমলা দুঃখিত ভাবে সুমিত্রার দিকে তাকিয়ে রইল। এই একটু আগেই মহারানি বলছিলেন, এখনও তিনি কাঁদতে শেখেননি! অদৃষ্টের কী পরিহাস!

কমলা মনে মনে ভাবলে, পৃথিবীর মস্ত দুর্ভাগ্য যে, রাজা-রানিরা কান্নার শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। হাসি হচ্ছে তাঁদের নিজস্ব নিধি, কান্না হচ্ছে গরিবের সম্পত্তি। রাজা-রানিরা সেইদিন গরিবের দুঃখ বুঝতে পারবেন, যেদিন হবে অশ্রুর সঙ্গে তাঁদের পরিচয়।

দরজা খোলার শব্দ হল। সুমিত্রা তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন, মুখ ফিরিয়ে নিলেন—পাছে কেউ তাঁর অশ্রুভেজা মুখ দেখতে পায়।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে এক ভৃত্য সেলাম করে বললে, 'কমলা দেবীর ঘর প্রস্তুত।'

কমলা ভীত ও প্রায় আর্তনাদের স্বরে বলে উঠল, 'রানিজি!'

সুমিত্রা বললেন, 'এখানে আমি রানিজি নই কমলা! আমি বন্দিনী।'

—'আমি যাব না রানিজি, আপনাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না!'

ভৃত্য আবার সেলাম করে আর-একটু উচ্চস্বরে বললে, 'কমলাদেবীর ঘর প্রস্তুত।'

সুমিত্রা দৃঢ়স্বরে বললেন, 'যাও কমলা, যাও!'

—'আপনাকে একলা ফেলে?'

—'হ্যাঁ, আমি এখন একলা থাকতেই চাই। যাও!'

কমলা এইবারে কাঁদবার উপক্রম করলে।

কড়া-গলায় কিন্তু নিম্ন-স্বরে সুমিত্রা বললেন, 'কমলা, এদের সামনে কেঁদে নিজের দুর্বলতা জাহির কোরো না। শক্ত হও। দেখাও, এদের আমরা তুচ্ছ মনে করি। যাও।'

অত্যন্ত অসহায় ভাবে ধীরে ধীরে কমলা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুমিত্রা একলাটি বসে বসে আজকের রাত্রের অসম্ভব ঘটনাগুলো নিয়ে মনে মনে নাড়া-চাড়া করতে লাগলেন।

কঠোর বাস্তবের আঘাত বেশ টের পাওয়া যাচ্ছে, তবু মনে হয় সবটাই যেন আজগুবি! সে যেন দেড়শো বছর আগেকার লেখা কোনো রোমাঞ্চকর 'মেলো-ড্রামা'র নায়িকা! মধ্যযুগের এই রহস্যময় দুর্গপ্রাসাদে এমন সব ঘটনা আগে হয়তো অনেক বারই ঘটেছে, কিন্তু আজ যে এর মধ্যে জ্বলছে বিশ শতাব্দীর ইলেকট্রিক লাইট!

চন্দ্র সিংহ যে পাগল, এ বিষয়ে আর একটুও সন্দেহ নেই।

এক-এক জন পাগল আছে তারা দৈনন্দিন জীবন-যাত্রায় কোনোরকম অস্বাভাবিক ব্যবহার করে না। কিন্তু পাগলামি জাহির করে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রেই।

সুমিত্রার মনে পড়ল এক পাগল সাহেব-পণ্ডিতের কথা। তাঁকে পাগল বলে ধরবার ছোঁবার জো নেই। বিশেষজ্ঞ বলে তাঁর দেশজোড়া নাম। তিনি প্রসিদ্ধ 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'র অন্যতম লেখক, অথচ প্রবন্ধ রচনা করতেন পাগলা গারদে বসে।

চন্দ্র সিংহ কি এই শ্রেণির উন্মাদ রোগে আক্রান্ত? তা যদি হয় তাহলে আরও বেশি ভয়ের কথা। সহজ মানুষ যুক্তি মানে, পাগলকে বোঝাবে কে?

পাগল না হলে কেউ এমন ব্যবহার করতে পারে? প্রতাপপুরের বিখ্যাত মহারানিকে বন্দি করবার সাহস তার হয়? প্রতাপপুর সৈন্য প্রেরণ করে মহারানিকে অনায়াসেই উদ্ধার ও জয়গড়কে ধ্বংস করতে পারে তো বটেই, কিন্তু তার চেয়েও ভীতিকর সম্ভাবনা কি চন্দ্র সিংহের মনে জাগছে না? যার শাসন আজ ভারতের রাজা-প্রজা সবাই মানতে বাধ্য, সেই ইংরেজ-সরকারের কানে এই সংবাদ পৌঁছোতে কি দেরি লাগবে? তখন ক্ষুদ্র জয়গড়ের রাজার অবস্থা কী হবে? তুচ্ছ এক নাচনাওয়ালীকে বন্দিনী করে ইংরেজ-সরকারের হুকুমে ইন্দোরের এক মহারাজাকেও মুকুট খুলে ফেলে রাজ্য থেকে নির্বাসিত হতে হয়েছে, আর সে হচ্ছে মহারানি! পাগল—পাগল—চন্দ্র সিংহ নিশ্চয়ই পাগল!

ঘরের অন্য পাশের একটা দরজা খুলে গেল। জমকালো পোশাক পরা এক ব্যক্তি প্রবেশ ও অভিবাদন করে বললে, 'মহারানির খাবার দেওয়া হয়েছে।'

খাবার! এইখানে বসে নিশ্চিন্ত প্রাণে সে খাদ্যগ্রহণ করবে, চন্দ্র সিংহ তাকে এতটা অসাড় বলে ভাবে নাকি?

দুই চক্ষে অগ্নি বৃষ্টি করে সুমিত্রা বললেন, 'চলে যাও এখান থেকে! আমি খাব না!'

যে এসেছিল, চলে গেল।

সুমিত্রা সুন্দর সিংহের কথা ভাবতে লাগলেন।

কাল সকালেই তার রাজনগরে পৌঁছোবার কথা। যুবরাজ সুন্দর সিংহ নিশ্চয়ই পথে দাঁড়িয়ে তাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে অপেক্ষা করবেন। কিন্তু তার দেখা পাবেন না। তখন কী মনে করবেন তিনি?

উঃ, কী দুরাত্মা চন্দ্র সিংহ! অমন রূপবান যে সুন্দর সিংহ, যাঁর অকপট মুখের উপরে লেখা নিষ্পাপ আত্মার কাহিনি, তাঁর নামেও সে রচনা করেছে এক কুৎসিত ইতিহাস! যমুন বাই তার গুপ্তস্ত্রী, তিনি দুই সন্তানের পিতা! নিশ্চয়ই নেই এই যমুনার অস্তিত্ব।—

চিন্তায় বাধা পড়ল, হঠাৎ কে তাঁর মাথার উপরে হাত রাখলে!

সুমিত্রা সচমকে দাঁড়িয়ে উঠে দেখলেন, একটি স্ত্রীলোক হাসি হাসি মুখে তাঁর পানে তাকিয়ে আছে।

—'কে তুমি?'

—'আমার নাম লক্ষ্মী।'

একটু আগে চন্দ্র সিংহ এরই কথা বলেছিলেন? এরই হাতে তার পরিচর্যার ভার?

লক্ষ্মীর বয়স চল্লিশের কম নয়। সুশ্রী ও ভদ্র চেহারা। মুখখানিও যেন সমবেদনায় ভরা, মুখ দেখে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়।

লক্ষ্মী খুব মিষ্ট স্বরে বললে, 'মহারানি, আপনি নাকি খাবেন না?'

—'না।'

—'কেন মহারানি?'

সুমিত্রা জবাব না দিয়ে খানিকক্ষণ লক্ষ্মীর মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন। তারপর আবার বসে পড়ে ধীরে ধীরে বললেন, 'লক্ষ্মী, তোমাকে দেখে নির্দয়

বলে বোধ হচ্ছে না। তুমি হয়তো সন্তানের মা, আমার দুঃখ বুঝতে পারবে। তুমি কি আমার উপরে একটু দয়া করবে?'

লক্ষ্মী ব্যস্ত হয়ে বললে, 'এ কী কথা মহারানি, আমি কি আপনাকে ব্যথা দিতে পারি? আহা-হা, এলোমেলো পোশাক, উস্কোখুস্কো চুল—রাজারানির এ কী মূর্তি!' সে আদর-ভরা হাত দিয়ে সুমিত্রার মাথার চুলগুলো ঠিক করে দিতে লাগল।

সুমিত্রা তার দুই হাত ধরে কাতর স্বরে বললেন, 'লক্ষ্মী, লক্ষ্মী! এখানে থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব!'

লক্ষ্মী বললে, 'মহারানি, আজ আর এ-সব কথা ভাববেন না। আজ খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়ুন।'

সুমিত্রা একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'আজ আমার খিধে নেই। শোবার ঘর কোথায়, দেখিয়ে দাও।'

লক্ষ্মী এগিয়ে গিয়ে বাঁ-দিকের দেওয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে একটি পর্দা সরিয়ে বললে, 'এই আপনার শোবার ঘর।'

ভিতরে ঢুকে সুমিত্রা বললেন, 'লক্ষ্মী, আজ আমি বড়ো শ্রান্ত। রাতও আর বেশি নেই। কাল সকালে তোমার সঙ্গে কথা কইব।' তিনি দরজা বন্ধ করে দিলেন।

মাঝারি আকারের ঘর, সাজসজ্জায় অতুলনীয় বললেও চলে। খুব আধুনিক সংস্কারের গুণে ঘরের ভিতর থেকে সেকেলে প্রভাব বিলুপ্ত হয়েছে একেবারে। লক্ষ করে দেখলেই বোঝা যায়, এ ঘরখানি মেয়েদের উপযোগী করেই সাজানো গুছানো হয়েছে। চারিদিকেই বিচিত্র ঐশ্বর্যের উপকরণ! এ ঘর যেন জানে, এখানে অতিথি হয়ে আসবেন প্রতাপপুরের মহারানি!

শয্যার সামনের দেওয়ালেই ও কার ছবি? সুমিত্রা এগিয়ে গিয়ে সবিস্ময়ে দেখলেন, এ রঙিন ছবিখানিও যে তাঁরই! ছবির তলায় কী লেখা রয়েছে? 'জয়গড়ের মহারানি!'

ঘৃণায় ও ক্রোধে সুমিত্রার বুক ভরে গেল। চন্দ্র সিংহ বড়ো চতুর, তার পাপ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে আগে থাকতেই ধীরে ধীরে আমার মনকে প্রস্তুত করে রাখতে চায়! আমি হব জয়গড়ের মহারানি? কী দুর্ভাগ্য! তার আগে আমি আত্মহত্যা করব!

ছবিখানাকে একটানে দেওয়াল থেকে খুলে তিনি ছুড়ে ফেলে দিলেন। কিন্তু সেখানা ভাঙল না, পুরু নরম কার্পেটের উপরে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।

শয্যায় শুয়ে শুয়ে রাগে ফুলতে ফুলতে সুমিত্রা কখন ঘুমিয়ে পড়লেন।

সকালে পাখির ডাকে ঘুম ভেঙে গেল সুমিত্রার। প্রথমটা তাঁর কিছুই স্মরণ হল না, ভাবলেন তিনি শুয়ে আছেন নিজের ঘরে, নিজের বিছানায়! কিন্তু আজ প্রভাতের পাখিরা শিখেছে যেন কোনো নূতন ভাষা!

বৃহৎ জনবহুল শহর প্রতাপপুর, সেখানে এত পাখিও নেই—যারা আছে তারা নাগরিক। তাদের ভোরের গানে বাজে অন্য রাগিণী! আর এখানে বসেছে যে সব বন্য পাখির গানের সভা, এখানে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে যে অনাহত বিহঙ্গ-সংগীত—এর ছন্দে হিন্দোলিত হয় শ্যামলতার তাজা আনন্দ, এর ঝংকারে মূর্ছনিত হয় আকাশ-নীলিমার অসীমতা!

তারপর এক মুহূর্তেই গতকল্যকার ভীষণ স্মৃতি সজাগ হয়ে উঠল!

সুমিত্রা ধড়মড় করে উঠে বসে বিছানা থেকে নেমে পড়লেন। তাড়াতাড়ি একটা জানলা খুলে দিলেন।

সামনেই অনেক নীচে বাঁধানো অঙ্গন, তারপর উঁচু পাথরের প্রাচীর। তার ওপাশ থেকে দেখা যাচ্ছে একটা বৃক্ষশ্যামল শৈলশিখর। দৃষ্টি যেন ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল।

সুমিত্রার চোখ ঘরের আর-একদিকে গেল—সেখানে রয়েছে একটা দরজা। এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দেখলেন, সেটা হচ্ছে স্নানঘর। তার দেওয়ালের গায়ে এত উঁচুতে দুটো গবাক্ষ রয়েছে যে, বাহিরের কিছুই দেখবার জো নেই। মুখ-হাত ধুয়ে সুমিত্রা আবার ফিরে এলেন হতাশ ভাবে।

এমন অবস্থাতেও ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে দেখে সুমিত্রা আশ্চর্য হয়ে ভাবলেন, মানুষ তার মনুষ্যত্বের গর্ব করে, কিন্তু তার দেহ কী পশুধর্মী!

নাঃ, নির্বোধের মতো উপোস করে থেকে দেহকে যাতনা দিয়ে লাভ নেই, তার ফলে নিজেই আরও কাহিল হয়ে পড়ব! এখন সব আগে আমার দরকার, মন আর দেহকে সবল করে রাখা। কিন্তু এই শত্রুপুরীর খাবার খেয়ে শেষটা...না, সে ভয়ও নেই, চন্দ্র সিংহ যতই দুরাত্মা হোক সে চায় আমাকে বিবাহ করতে, আমার খাবারে নিশ্চয়ই বিষ মিশিয়ে দেবে না!

সুমিত্রা শোবার ঘরের দরজা খুলে দিয়ে বৈদ্যুতিক ঘণ্টার বোতাম টিপলেন।

আধ মিনিট যেতে-না-যেতেই দরজার গোলাপি সিল্কের পর্দা সরিয়ে খাবার ও চায়ের 'ট্রে' নিয়ে ঘরের ভিতরে লক্ষ্মী এসে ঢুকল।

লক্ষ্মী চকিত স্বরে প্রথমেই বললে, 'মহারানি, ছবিখানা কে ওখানে ফেলে দিলে?'

—'আমি।'

—'সে কী, কেন মহারানি?'

—'তুমি কি জানো, ওখানা কার ছবি?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, মহারানি!'

—'ওর তলায় কী লেখা ছিল, দেখেছ?'

লক্ষ্মী ঘাড় নেড়ে জানালে, হ্যাঁ।

—'আমাকে জয়গড়ের মহারানি বলার চেয়ে বড়ো অপমান আর নেই।'

লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ বদলে বললে, 'মহারানি, আপনার চা।'

সে টেবিলের উপরে 'ট্রে' রাখলে। সুমিত্রা খাবারের দিকে হাত বাড়ালেন বিনাবাক্যব্যয়ে।

চা-পান শেষ হলে পর লক্ষ্মী রৌপ্যখচিত চিরুনি নিয়ে সুমিত্রার কেশ-প্রসাধনে নিযুক্ত হল।

—'লক্ষ্মী, তোমাদের এই রাজা চন্দ্র সিংহ কী-রকম মানুষ?'

—'আমরা—জয়গড়ের প্রজারা তাঁকে দেবতা বলে মনে করি।'

—'কিন্তু আমি তাঁকে কী মনে করি জানো? একটি প্রকাণ্ড দানব!'

—'মহারানি!'

—'তিনি মহিলার সম্মান জানেন না, তিনি কপট, নিষ্ঠুর, দস্যু!'

পাছে রাজার নামে আরও কিছু শুনতে হয়, যেন এই ভয়েই তাড়াতাড়ি চিরুনি ফেলে লক্ষ্মী ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল।

সুমিত্রাও ধীরে ধীরে পাশের বসবার ঘরে গিয়ে দাঁড়ালেন। দুজন ভৃত্য নীরবে ঘর পরিষ্কার করছে। বাইরে যাবার দরজা খোলা।

সুমিত্রা বেরিয়ে গেলেন। কেউ বাধা দিলে না। সিঁড়ি দিয়ে তিনি সোজা নেমে গেলেন। নীচের দালানে সিঁড়ির দু-পাশে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে চারজন বর্শাধারী সেপাই। তারা যেন তাঁকে দেখতেই পেলে না।

কিন্তু সুমিত্রা সিঁড়ির শেষ-ধাপে নামামাত্র দু-দিক থেকে দুটো বর্শার দণ্ড নত হয়ে তাঁর গতিরোধ করলে।

সুমিত্রা বললেন, 'আমাকে যেতে দাও।'

একজন সেপাই সেলাম করে নতমুখে বললে, 'এখান দিয়ে কারুর যাবার হুকুম নেই মহারানি!'

—'কিন্তু আমি যাব, আমি প্রতাপপুরের মহারানি!'

—'আমরা প্রতাপপুরের প্রজা নই। কিন্তু আপনি যখন আমাদের মহারানি হবেন, তখন দরকার হলে আপনার জন্যে আমরা প্রাণ দিতেও কাতর হব না।'

—'সেপাই, তোমাদের এই অত্যাচারী রাজাকে হত্যা করো! আমি তোমাদের লক্ষপতি করতে রাজি। ভেবে দ্যাখো।'

কেউ কিছু ভাবলে বলে মনে হল না। কেউ একটা জবাব পর্যন্ত দিলে না।

সুমিত্রা আবার উপরে উঠে গেলেন।

সেপাইরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে।

একজন বললে, 'রূপসী বটে, কিন্তু শক্ত মেয়ে। আমাদের রাজার বরাত ভালো নয়!'

॥ সপ্তম পরিচ্ছেদ ॥

রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি

সকালে ওদিকে ঘুম থেকে উঠেই মন্ত্রীমশাই দেখলেন, টেবিলের উপরে চাকর এসে চায়ের 'ট্রে' নামিয়ে রাখলে।

মন্ত্রী বললেন, 'ট্রে নিয়ে যাও। ও-সব বিলিতি নেশা আমি করি না।'

মুখ হাত ধুয়ে তিনি পোশাক পরে বাইরে বেরিয়ে এলেন। তারপর অন্দর-মহলের দিকে যাত্রা করলেন, রানিজির খোঁজ নেবার জন্যে।

কিন্তু সদর-মহল পার হবার আগেই বন্দুকধারী সেপাই গম্ভীর স্বরে বললে, 'এখান থেকে কারুর বেরুবার হুকুম নেই।'

মন্ত্রী বিস্মিত স্বরে বললেন, 'বেরুবার হুকুম নেই! কেন?'

—'জানি না। রাজাবাহাদুরের হুকুম।'

—'কিন্তু আমি হচ্ছি প্রতাপপুরের মন্ত্রী।'

—'কারুর বেরুবার হুকুম নেই।'

মন্ত্রী ভাবতে ভাবতে ও পাকা দাড়ির ভিতরে আঙুল চালাতে চালাতে ফিরে চললেন। একেবারে প্রতাপপুরের সেনাপতির ঘরে।

সেনাপতি সূরযমল তখন একখানা হাত-আয়নার সাহায্যে নিজের গোঁফের পাকা চুল সযত্নে উৎপাটন করছিলেন।

—'ও সূরযমল! শুনেছ?'

—'আমি কিছু শুনিনি। আমার মন খারাপ হয়ে গেছে।'

—'কিছু শোনোনি, তবু মন খারাপ?'

—'হ্যাঁ মন্ত্রীমশাই। আমার গোঁফের পাকাচুল হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে!'

—'আরে রাখো তোমার গোঁফের পাকাচুল! ওদিকে ব্যাপার যে সঙিন!'

—'ব্যাপার মোটেই সঙিন নয়। ভোরবেলায় উঠেই খেয়েছি একপেট খাবার। প্রতাপপুরে এত খাবার কেউ আমাকে কখনো খেতে দেয়নি।'

—'ওহে উদরপিশাচ, ইতিমধ্যে একবার বাইরে যাবার চেষ্টা করেছিলে কি?'

—'না। দরকার হয়নি।'

—'দরকার হলেও এ-মহল ছেড়ে আর বেরুতে পারবে না।'

—'মানে?'

—'মানেটা ভালো নয়। আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে।'

পঙ্ক-গুম্ফ-ট্রাজেডির কথা ভুলে সূরযমল উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'একটু পরিষ্কার করে বলুন। বুঝতে পারছি না।'

—'আমিও বুঝতে পারছি না। কিন্তু আমাদের বাইরে যাওয়া নিষেধ। রাজার হুকুম।'

সূরযমল বিস্মিত ভাবে বললেন, 'আপনি কি বলতে চান, আমরা বন্দি?'

—'ঠিক বন্দি না হতেও পারি। কিন্তু আমাদের বাইরে যাওয়া নিষেধ। এ মহল ছেড়ে এক পা বেরুতে পারব না।' মন্ত্রী সব খুলে বললেন।

—'তার মানেই তো আমরা বন্দি!'

—'মানে কী হয়, ভেবে দ্যাখো। আমি তো গতিক সুবিধার বুঝছি না। সঙ্গে পাগলি রানি, তার ওপরে এই বুনো রাজা।' মন্ত্রীমশাই হতাশ ভাবে ধুপ করে বসে পড়লেন।

সূরযমল হচ্ছেন আধুনিক করদ রাজ্যের সেনাপতি। জীবনে কখনো যুদ্ধ দেখেননি এবং ভবিষ্যতেও যুদ্ধক্ষেত্রের গোলা-গুলির গোলমাল শোনার আগেই যে তিনি পেনশন নিতে পারবেন, এমন বিশ্বাস তাঁর আছে। তবু হাজার হোক তিনি হচ্ছেন সেনাপতি, মেজাজটা তাঁর রীতিমতো 'মিলিটারি'। অতএব ক্রুদ্ধস্বরে

চিৎকার করে বললেন, 'রাজার কাছ থেকে আমি এখনই এর কৈফিয়ত দাবি করব!'

—'আমি হাজির, সেনাপতি! কী কৈফিয়ত আপনি চান?'

মন্ত্রী ও সূরযমল দুজনেই চমকে ফিরে দেখলেন, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছেন স্বয়ং রাজা চন্দ্র সিংহ! তাঁর ওষ্ঠে মৃদু হাস্যলীলা, দুই চোখ নাচছে সকৌতুকে।

সেনাপতি যেমন দপ করে জ্বলে উঠেছিলেন, তেমনি দপ করে নিবে গেলেন। মন্ত্রী মুখ নামিয়ে নিলেন লজ্জায়। তারপর দুজনেই একসঙ্গে রাজাকে অভিবাদন করলেন।

চন্দ্র সিংহ জোরে জোরে পা ফেলে এগিয়ে এলেন। একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বললেন, 'সেনাপতি, কৈফিয়ত দিতে আমি রাজি।'

সূরযমলের আর কৈফিয়ত দাবি করবার কোনো উৎসাহই দেখা গেল না।

মন্ত্রী কিঞ্চিৎ ইতস্তত করে, দু-এক বার কেশে নিয়ে বললেন, 'রাজাবাহাদুর, সেপাই আমাদের এ মহল থেকে বেরুতে দিলে না।'

—'সেপাই আমারই হুকুম তামিল করেছে।'

—'তাহলে আমরা কি বন্দি?'

রাজা উত্তর না দিয়ে পকেট থেকে একটা সোনার সিগারেট কেস বার করে খুলে মন্ত্রীর সামনে ধরলেন।

মন্ত্রী বললেন, 'ক্ষমা করবেন। কখনো ধূমপানের চেষ্টা করিনি।'

—'সেনাপতির কি ধোঁয়া খাওয়ার অভ্যাস আছে?'

সেনাপতির অভ্যাস ছিল, কিন্তু রাজার সামনে ধূম্র ভক্ষণ করবার সাহস হল না। তিনি হাতজোড় করে নিজের অক্ষমতা জানালেন।

চন্দ্র সিংহ একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে দু-চার বার টান মেরে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, 'সিগারেট বড়ো ভালো জিনিস, মন্ত্রীমশাই! যাকে বলে নিখুঁত আনন্দ! এক কল্কে তামাক শেষ করতে গেলে শ্রান্ত হয়ে পড়তে হয়। একটা সিগার পুড়িয়ে ছাই করতে একবেলা কেটে যায়। ও-সব হচ্ছে নিম্নশ্রেণির একঘেয়ে নেশা। দুনিয়ার কোনো ভালো জিনিসেরই পরমায়ু বেশি নয়। সিগারেট হচ্ছে চুম্বনের মতো—অল্পক্ষণ স্থায়ী, কিন্তু মহিমময়! আকাঙ্ক্ষা মেটায় না, অবসাদ আনে না, অথচ পরম উপভোগ্য! পৃথিবীতে এই অপূর্ব আনন্দের উৎপত্তি কোন শুভদিনে, জানেন কি মন্ত্রীমশাই?'

মন্ত্রী অন্যমনস্কের মতো ঘাড় নেড়ে জানালেন, না। তখন তিনি মনে মনে ভাবছিলেন, রাজার উদ্দেশ্য কী?

চন্দ্র সিংহ হুস করে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে দিলেন। ধোঁয়া চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে উপরে উঠতে লাগল, ঊর্ধ্বনেত্রে তাই দেখতে দেখতে তিনি বললেন, 'ধূম্রের এই জন্মদাতা জন্মেছিলেন ক্রিমিয়া যুদ্ধের সময়ে, রুশিয়ায়। সেনাপতি, ক্রিমিয়া যুদ্ধের তারিখ কত?'

সূরযমল বলতে পারলেন না।

—'আমার বোধ হয় ১৮৫৪—৫৬ খ্রিস্টাব্দ। এটা হচ্ছে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ। অতএব সিগারেটের বয়স এখনও একশো বছর হতে দেরি আছে। সিগারেট হচ্ছে মন্ত্রীমশাইয়েরই মতো আধুনিক!'

এখনও রাজার উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে মন্ত্রীর মাথা ক্রমেই বেশি গুলিয়ে যাচ্ছিল।

চন্দ্র সিংহ হঠাৎ অর্ধদগ্ধ সিগারেটটা 'অ্যাস-ট্রে'র উপরে নিক্ষেপ করে গম্ভীর স্বরে বললেন, 'হ্যাঁ, কী জানতে চাইছিলেন? আপনারা বন্দি কি না? না, আপনাদের বন্দি বলতে পারি না, তবে হপ্তাখানেক আপনারা আমার অতিথি হলে আমি আনন্দিত হব।'

মন্ত্রীমশাই বললেন, 'আপনার অতিথি হওয়া ভাগ্যের কথা, কিন্তু আজই যে আমাদের রাজনগরে না গেলে চলবে না?'

—'চলবে না? কেন চলবে না?'

—'রাজনগরের যুবরাজের আমন্ত্রণ।'

—'রাজনগরের যুবরাজের আমন্ত্রণ কি আমার আমন্ত্রণেরও চেয়ে বড়ো? যুবরাজের সম্মান বেশি, না রাজার সম্মান বেশি?'

এইখানে মন্ত্রী পড়লেন বিপদে। তিনি এমন একটা যুতসই জবাব খুঁজতে লাগলেন যাতে শ্যাম আর কুল দুইই রক্ষা পায়—যা বন্য রাজা, চটলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা!

ওদিকে সূরযমল মনে মনে হাসছেন আর ভাবছেন, বুড়ো মন্ত্রী রাজনৈতিক চালে ভারী ওস্তাদ, রাজা-রাজড়াদের মন রেখে রেখে মাথার চুল পাকিয়ে ফেলেছে। আজ কী করে লাঠি না ভেঙে সাপ মারে, দেখা যাক!

মন্ত্রী মনের মতো জবাব না পেয়ে রাজার জিজ্ঞাসা এড়িয়ে বললেন, 'আজ্ঞে,

আপনি তো জানেন, রাজনগরের যুবরাজ হচ্ছেন প্রতাপপুরের মহারানির ভাবী স্বামী!'

চন্দ্র সিংহ ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, 'কে ভাবী-স্বামী? আমি, না রাজনগরের যুবরাজ?'

এতক্ষণে অন্ধকারে আলো দেখে মন্ত্রী মনে মনে চমকে উঠলেন। প্রমাদ গুণে ভয়ে ভয়ে বললেন, 'আজ্ঞে, রাজাবাহাদুর—'

বাধা দিয়ে চন্দ্র সিংহ বললেন, 'প্রতাপপুরের মহারানির কাছে কে আগে বিবাহের প্রস্তাব করেছিল? আমি, না রাজনগরের যুবরাজ?'

—'আজ্ঞে, আমাদের মহারানি যে রাজনগরের যুবরাজকেই স্বামী বলে নির্বাচন করেছেন!'

—'আপনাদের মহারানির নির্বাচন করবার কোনো অধিকার নেই, তিনি এখনও সাবালিকা হননি। আমিই তাঁকে আমার ভাবী পত্নী বলে নির্বাচন করেছি, সুতরাং তাঁর উপরে আমারই অধিকার বেশি!'

এই আশ্চর্য যুক্তি শুনে মন্ত্রী হতভম্ব হয়ে গেলেন।

সেনাপতি ভাবতে লাগলেন, রাজার মেজাজ দেখছি আমারও চেয়ে মিলিটারি। উনি গায়ের জোরে নারীর হৃদয়-দুর্গ জয় করতে চান!

চন্দ্র সিংহ আবার একটা নূতন সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'মন্ত্রীমশাই, আমার যুক্তি কিছু নতুন ধরনের, না? স্বীকার করি। নতুন ধরনের যুক্তির একটা সুবিধা কী জানেন? প্রতিপক্ষকে খানিকক্ষণের জন্যে নির্বাক করে দেওয়া যায়।'

মন্ত্রী বললেন, 'তবে কার্যোদ্ধার হয় কি না, সন্দেহ আছে।'

চন্দ্র সিংহ হাসতে হাসতে বললেন, 'আপনারা যদি হপ্তাখানেক নির্বাক আর নিশ্চল হয়ে থাকেন, তাহলে নিশ্চয়ই আমি কার্যোদ্ধার করতে পারব!'

—'অর্থাৎ?'

—'সুমিত্রাদেবী হবেন জয়গড়ের মহারানি।'

—'জয়গড় আর প্রতাপপুরের?'

—'ঠিক।'

—'কিন্তু একহপ্তা ধরে আমরা যদি এখানে নির্বাক আর নিশ্চল হয়ে বসে থাকি, তাহলে ভারত জুড়ে কী কোলাহল উঠবে, আপনি কি সেটা ধারণা করতে পারছেন না? প্রতাপপুরের মহারানি অজ্ঞাতকুলশীল নন, আজকেই যে তাঁর অন্তর্ধানে চারিদিকে হইচই পড়ে যাবে!'

—'সে সব কিছুই হবে না। আমার দূত এতক্ষণে প্রতাপপুরে গিয়ে পৌঁছেছে। সেখানকার সবাই জেনেছে, মহারানি সুমিত্রা দেবীর শরীর হঠাৎ কিছু অসুস্থ হয়ে পড়েছে বলে সপ্তাহ-খানেকের জন্যে তিনি সদলবলে জয়গড়ের আতিথ্য স্বীকার করেছেন।'

রাজার সাহস দেখে মন্ত্রী স্তম্ভিত হয়ে গেলেন!

—'মন্ত্রীমশাই, আপনার ভাববার কোনো কারণ নেই। ধরণী হচ্ছে বীরভোগ্যা। আমরা হচ্ছি ক্ষত্রিয়বংশধর। ক্ষত্রিয়রা আগে চিরকালই বাহুবলে নারীকে অধিকার করত। সেই প্রথা আমি আবার ফিরিয়ে আনতে চাই। সুমিত্রা দেবীকে আমার গলায় মাল্য দিতে আমি বাধ্য করব।'

সেনাপতি ভাবলেন, রাজা তাহলে আমাদের রানিটিকে চেনেন না!

মন্ত্রী বললেন, 'তারপর যখন সবাই ভিতরের কথা জানতে পারবে, তখন?'

দুই আঙুলের মাঝখানে সিগারেটটি ধরে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করতে করতে চন্দ্র সিংহ বললেন, 'তখন কিছুই হবে না, কারণ আমাদের বিবাহ হবে হিন্দু আইন অনুসারে। এ বিবাহ-বন্ধন থেকে মুক্ত হবার আর কোনো উপায় নেই। তখন অন্তত মানরক্ষার জন্যে আপনারা মৌনব্রত অবলম্বন করতে বাধ্য হবেন। সুমিত্রাদেবী হয়তো রাগ করে কিছুকাল আমার সঙ্গে কোনোই সম্পর্ক রাখতে চাইবেন না। তারপর? সময়ে সবই সয়ে যায়। আর যে কোনো বুদ্ধিমান পুরুষই জানে, নারীর মানভঙ্গ করা দুর্যোধনের উরুভঙ্গের মতো গুরুতর ব্যাপার নয়। আমি তার সহজ পদ্ধতি জানি মন্ত্রী, জানি!'

—'আর এক হপ্তার ভিতরে আমাদের মহারানিকে যদি আপনি বাধ্য করতে না পারেন?'

—'তাহলে আমি আপনাদের সবাইকে মুক্তি দেব, কিন্তু এক শর্তে।'

—'শর্তটা শুনে রাখা ভালো।'

—'আপনাদের প্রতিজ্ঞা করতে হবে, এখান থেকে বিদায় নিয়ে কেউ আসল কথা প্রকাশ করতে পারবেন না।'

—'পরে যদি আমরা প্রতিজ্ঞা রক্ষা না করি?'

—'নিজেদেরই অনিষ্ট করবেন। পৃথিবী জানবে যে, প্রতাপপুরের যুবতী আর কুমারী মহারানি রাজগড়ের নির্জন শৈলপ্রাসাদে যুবক রাজার শয়নগৃহে সাত দিন সাত রাত্রি যাপন করে এসেছেন। ত্রেতা যুগের সতী সীতাও লোকের কানাঘুষাকে নীরব করতে পারেননি। মন্ত্রী, মানুষের চরিত্র আজও বদলায়নি জানবেন। তার

উপরে ত্রেতাযুগে বিষাক্ত সংবাদপত্র ছিল না। আপনারা প্রতিজ্ঞারক্ষা না করলে ভারতের সমস্ত সংবাদপত্রে প্রতাপপুরের মহারানিকে নিয়ে যাতে দীর্ঘকাল ধরে নানা কৌতুককর টীকা-টিপ্পনী প্রকাশিত হয়, সে ব্যবস্থা আমি করব। তার ফল কী হবে, অনুমান করতে পারছেন?'

—'আপনারও অবস্থা বিশেষ আশাপ্রদ হবে বলে বোধ হচ্ছে না।'

আচম্বিতে গাত্রোত্থান করে চন্দ্র সিংহ উত্তেজিত স্বরে বললেন, 'আমার অবস্থা? কী হবে আমার? ইংরেজ-সরকারের বিধানে বড়োজোর আমি রাজ্যচ্যুত হব! এই ক্ষুদ্র জয়গড় থেকে যদি বঞ্চিত হই, আমার কোনো দুঃখই নেই। প্রতাপপুরকে হস্তগত করে হয় আমি শ্রেষ্ঠ হব, নয় এই তুচ্ছ জয়গড় ত্যাগ করে যেখানে খুশি চলে যাব! বুঝেছেন? হয় শ্রেষ্ঠ হব নয় লুপ্ত হব! পাশার এই শেষ চালে আমি আমার সর্বস্ব পণ করলুম! কিন্তু মন্ত্রী, আমার বিশ্বাস, আপনারা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবেন', বলেই তিনি দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর আবার ফিরে দাঁড়িয়ে শান্ত স্বরে বললেন, 'মনে রাখবেন, এক সপ্তাহ আপনারা আমার আদরের অতিথি। কিন্তু এখান থেকে বেরুবার বা মহারানির সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করবেন না। আমার প্রহরীরা সতর্ক আর বিশ্বস্ত!' চন্দ্র সিংহ দ্রুতপদে প্রস্থান করলেন।

সূরযমল হা হা করে হেসে উঠলেন।

মন্ত্রী খাপ্পা হয়ে বললেন, 'হাসছ বড়ো যে? এই কি হাসির সময়?'

—'ওরে বাবা, হাসব না মন্ত্রীমশাই? রাজাবাহাদুর উপন্যাসের যে চমৎকার প্লট বেঁধেছেন, তার মধ্যে তো এক ফোঁটাও অশ্রুর চিহ্ন নেই! আমি বলছি মন্ত্রীমশাই, এ উপন্যাস হবে মিলনান্ত! আমাদের মহারানি যদি বুদ্ধিমতী হন, অন্তত লোকলজ্জার ভয়েও রাজাকে স্বামী বলে মানতে বাধ্য হবেন!'

মন্ত্রী ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন, 'তুমি একটি সুবৃহৎ গরু! আমাদের পাগলি রানিকে তুমিও চেনো না, লোকলজ্জা তাঁর কাছে তুচ্ছ!'

॥ অষ্টম পরিচ্ছেদ ॥

লূতা-জাল

একখানা চেয়ারের উপরে সুমিত্রা চুপ করে বসেছিলেন।

তাঁর চোখ গেল দেওয়ালের দিকে। সেখানে দুই দেওয়ালের সংযোগস্থলে রয়েছে একটি মাকড়সার জাল।

এমন সাজানো গুছানো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরে মাকড়সা জাল বুনেছে সকলের অগোচরে!

ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন চন্দ্র সিংহ। সুমিত্রা তাঁকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন না, চেয়ারের উপরে কেবল একটু ফিরে বসলেন।

চন্দ্র সিংহের মুখ গম্ভীর। বোধহয় কালকের রাতের অপমানের কথা এখনও তিনি ভুলতে পারেননি। কিন্তু চন্দ্র সিংহ হচ্ছেন নিপুণ অভিনেতা, এ গাম্ভীর্য কি সত্যিকার?

ভাবতে ভাবতে সুমিত্রা আবার চোখ তুলে তাকালেন দেওয়ালের দিকে। মাকড়সার জাল বোনা তখনও সমাপ্ত হয়নি, তখনও সে ব্যস্তভাবে এধারে-ওধারে আনাগোনা করে জাল বুনছে আর জাল বুনছেই!

গাম্ভীর্যের মুখোশ ভেদ করে চন্দ্র সিংহের ব্যঙ্গভরা কণ্ঠস্বর জাগল, 'মহারানি, এই জ্যান্ত মানুষটার চেয়ে ওই জড় দেওয়ালটা কি এতই বেশি চিত্তাকর্ষক?'

সুমিত্রা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, আজ কিছুতেই তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেলবেন না। অভিনয়-বিদ্যা যে চন্দ্র সিংহেরই একচেটিয়া নয়, এইটেই বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। অত্যন্ত শান্ত স্বরে সুমিত্রা বললেন, 'রাজা, আমি ওই মাকড়সার জালটা দেখছিলুম। ওটা কি চিত্তাকর্ষক নয়?'

বিস্মিত ভাবে চন্দ্র সিংহ বললেন, 'এ ঘরে মাকড়সার জাল!' মুখ ফিরিয়ে দেখেই তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে ভৃত্যকে ডাকবার উপক্রম করলেন।

সুমিত্রা বললেন, 'স্থির হোন রাজা! রাগ করে চাকর ডাকবার দরকার নেই!'

—'নিশ্চয়ই দরকার আছে! এ ঘরে মাকড়সার জাল!'

—'আশ্চর্য হচ্ছেন কেন? এই ঘরেই কি মানুষ-উর্ণনাভ ওর চেয়ে বড়ো জাল পাতেনি?'

চন্দ্র সিংহের ভাবভঙ্গি তৎক্ষণাৎ শান্ত হয়ে এল। ধীরে ধীরে তিনি বললেন, 'মহারানির লক্ষ আবার জ্যান্ত মানুষের দিকে ফিরে এসেছে দেখে ধন্য হলুম।'

—'কিন্তু আমি আমার প্রশ্নের উত্তর পেলুম না!'

—'অনেকে উত্তর কি হবে জেনেও প্রশ্ন করে। এ-রকম প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বাহুল্য মনে করি।'

—'কেন না, উত্তর দেওয়া নিরাপদ নয়? জানি রাজা, জানি! আর এও জানি যে, দেওয়ালের ওই মাকড়সাকে দেখলেই চেনা যায়, কিন্তু মানুষ-মাকড়সা হচ্ছে

বহুরূপী, তার পাল্লায় না পড়লে তাকে চেনা যায় না। আপনার কী মত রাজা?'

মুখ টিপে হাসতে হাসতে চন্দ্র সিংহ বললেন, 'আমিও আপনার মতে সায় দি। জাল পাতাই হচ্ছে মানুষের স্বধর্ম। বাপ-মা পাতেন স্নেহজাল, ছেলেমেয়ে পাতে মায়াজাল, তরুণীরা পাতে রূপের জাল—'

বাধা দিয়ে সুমিত্রা বললেন, 'তাহলে আপনি কি নিজেকে রূপের জালে বন্দি বলে মনে করছেন?'

—'মোটেই নয় মহারানি, মোটেই নয়! আমি স্নেহের জালে, মায়ার জালে বন্দি হতে পারি, কিন্তু আমাকে বন্দি করতে পারে এমন রূপের জাল এখনও বোনা হয়নি।'

—'তাহলে আজ আমি এখানে কেন?'

—'আমার লাভের জন্যে। আমাকে যতটা কপট ভাবছেন, আমি ততটা নই। আমি অত্যন্ত সরল ভাবে বলছি, আপনার রূপে আমার মন একটুও টলেনি। অবশ্য এ-কথা শুনলে আপনি হয়তো খুশি হবেন না।'

—'না রাজা, আমি খুব খুশি হয়েছি। কারণ এটা এখন স্পষ্ট বোঝা গেল, লাভের লোভেই আপনি আমাকে চুরি করেছেন। খবরের কাগজে পড়েছি, আমেরিকায় হামেশাই মানুষ-চুরি 'র‍্যানসাম' বা নিষ্ক্রয় আদায়ের জন্যে। ...বেশ। প্রতাপপুরের বাৎসরিক রাজস্বের পরিমাণ হচ্ছে এক কোটি টাকা। তাদের মহারানির মুক্তির জন্যে প্রতাপপুরের প্রজাদের কত টাকা দিতে হবে?'

চন্দ্র সিংহের মুখ স্থির, কিন্তু তাঁর মনের উত্তাপ ফুটল দুই চোখে। আধ মিনিট তিনি স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

সামনের টেবিলের উপর থেকে একখানা ছবির বই তুলে নিয়ে সুমিত্রা যেন অন্যমনস্কের মতো তার পাতা ওলটাতে লাগলেন। কিন্তু তার মধ্যেই তাঁর চোখ দু-তিন বার চুরি করে দেখে নিলে, চন্দ্র সিংহের মনের উপরে কথাগুলো কতখানি কাজ করেছে?

অবশেষে চন্দ্র সিংহ বললেন, 'মহারানি, আপনাকে নিষ্ক্রয়ের টাকা দিতে হবে না।'

—'দিতে হবে না? ভাবছেন, আমি নিজেকে খুব সস্তা মনে করব? মোটেই নয়! ধরুন, যদি বলি আমার দেহের মূল্যস্বরূপ আমি পঁচিশ লাখ টাকা দিতে রাজি?'

চন্দ্র সিংহের মুখ লাল হয়ে উঠল অপমানে। কিন্তু সহজ স্বরেই তিনি বললেন, 'মহারানি, আমি ডাকাতও নই, চোরও নই, ভিখারিও নই। আমি চাই খালি প্রতাপপুরের দর্পচূর্ণ আর জয়গড়কে উন্নত করতে। আপনাকে লাভ করলেই আমার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। আমার আর কোনো শর্ত নেই।'

বহুকষ্টে রাগ সামলে সুমিত্রা বললেন, 'আপনি যদি মনে করে থাকেন যে, আমাকে বন্দি করলেই আমাকে লাভ করবেন, তাহলে সে আশায় জলাঞ্জলি দিন।'

—'তবে কী উপায়ে আপনাকে লাভ করতে পারব, সেটা আপনি নিজে বলে দিলেই আমার কর্তব্য অনেকটা সহজ হয়ে আসে।'

—'বিধাতার বিধান হচ্ছে, জয়গড় কোনোদিনই আমাকে লাভ করতে পারবে না।'

—'কিন্তু আমি আপনাকে লাভ করবই।'

—'অসম্ভব! তার আগে আমি আত্মহত্যা করব!'

চন্দ্র সিংহ হো হো করে হেসে উঠে বললেন, 'মহারানি, আত্মহত্যার দ্বারা বিপদ থেকে মুক্তিলাভ করার প্রথাটা হচ্ছে অত্যন্ত সেকেলে। আপনার মতো আধুনিক মহিলা যে এতটা পুরাতন প্রথা অবলম্বন করবেন আমার তা বিশ্বাস হয় না।'

সুমিত্রা বললেন, 'তার মানে, আপনি বোধহয় ভাবছেন, আত্মহত্যা করবার সাহস আমার নেই?'

—'না, তা ভাবছি না। কারণ বিপদে পড়ে যারা আত্মহত্যা করে, ভীরু মনে করি আমি তাদেরই। আসল সাহসী বলি তাদেরই, ঘোরতর দুর্ভাগ্যের মধ্যেও আত্মহত্যা না করার মতো সাহস থেকে যারা বঞ্চিত নয়।'

সুমিত্রা জবাব না দিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নীরব হয়ে রইলেন।

চন্দ্র সিংহ বললেন, 'মহারানি, আশা করি আপনার খাওয়া-দাওয়ার কোনো অসুবিধা হয়নি।'

সুমিত্রা নীরব।

চন্দ্র সিংহ বললেন, 'আচ্ছা, আপনি এখন চিন্তা করুন, আবার আমি আপনার সঙ্গে দেখা করব।'

পদশব্দ ঘরের বাইরে চলে গেল।

সুমিত্রা মুখ তুলে দেখলেন, মাকড়সার জালের কাছে উড়ে বেড়াচ্ছে একটা মাছি।

তিনি তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে বস্ত্রাঞ্চল সঞ্চালন করে তাড়িয়ে দিলেন মাছিটাকে।

মনে মনে ভাবলেন, মাকড়সার কবল থেকে মাছিকে আমি তো উদ্ধার করলুম। কিন্তু মাকড়সার কবল থেকে আমাকে উদ্ধার করে কে?

কারুকার্য করা ছোট্ট একটা দামি ঘড়ি টুং টুং করে দশ বার বাজল।

স্নানের সময় উপস্থিত দেখে সুমিত্রা ধীরে ধীরে 'বাথরুমে' গিয়ে ঢুকলেন।

প্রথমেই তাঁর নজরে পড়ল, স্নানাগারের দুটো উঁচু উঁচু গবাক্ষের দিকে। তার কোনোটাতেই গরাদ নেই।

গবাক্ষের নীচে পর্যন্ত তাঁর মাথা পৌঁছায় না। তিনি আবার বসবার ঘরে ফিরে এসে একখানা উঁচু চেয়ার টানতে টানতে স্নানাগারের দিকে নিয়ে চললেন। চেয়ারখানা গবাক্ষের নিম্নদেশে রেখে তার উপরে উঠে দাঁড়ালেন।

বাইরের দৃশ্যটা তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল ছবির মতো।

পাহাড়ের একটা উপত্যকা ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে নীচের দিকে। শ্যামল উপত্যকা—বড়ো বড়ো গাছের মর্মর সংগীতে পরিপূর্ণ। আরও দূরে রয়েছে পরে পরে চারটে পাহাড়ের শিখর। তাদের পরে কী আছে, দেখা যায় না। কোথাও জনপ্রাণীর দেখা নেই, মানুষের সাড়াশব্দও নেই। এ যেন বিজনতার স্বদেশ!

সুমিত্রা বুঝলেন, তিনি যেখানে আছেন সেটা হচ্ছে শৈলপ্রাসাদের একটা প্রান্ত। বোধহয় এদিকটা পর্বতের দ্বারা সুরক্ষিত বলে এখানে কোনো প্রাচীর নেই।

দেখে তাঁর আনন্দ হল বটে, কিন্তু ক্ষণিকের জন্যে! কারণ পরমুহূর্তেই গবাক্ষ পথে মুখ বাড়িয়েই সুমিত্রার মাথা যেন ঘুরে গেল! প্রায় পঞ্চাশ-ষাট ফুট নীচে রয়েছে পাহাড়ের কঠিন পৃষ্ঠদেশ! এখান থেকে নীচে নামবার কোনো উপায় নেই, এখান থেকে লম্ফত্যাগ করলে মৃত্যু অনিবার্য!

হতাশ ভাবে চেয়ার ছেড়ে নেমে পড়বেন, এমন সময়ে হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি উঠল চমকে!

উপত্যকার একটা গাছের গুড়িতে ঠেস দিয়ে, ঘাসের উপরে দুই পা ছড়িয়ে বসে আছে এক নিষ্পন্দ মনুষ্য-মূর্তি!

তার এলোমেলো ও সাধারণ কাপড়-চোপড় দেখেই বোঝা গেল, সে এই শৈল

প্রাসাদের বাসিন্দা নয়। তার মুখ দেখা যাচ্ছিল না, কারণ সে হেঁটমুখে তাকিয়েছিল মাটির দিকে।

কিন্তু সে কে, তা জানবার দরকার নেই। সে যে প্রাসাদের বাসিন্দা নয়, সুমিত্রার পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট!

সুমিত্রার ইচ্ছা হল, তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন! কিন্তু কী উপায়ে? চেঁচিয়ে ডাকা নিরাপদ নয়! প্রাসাদের লোক শুনতে পাবে—চারিদিকে সতর্ক প্রহরী!

ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করেও যে বিশেষ কোনো উপকার হবে, সুমিত্রার সে-আশাও ছিল না! এই জয়গড়ে তাঁর কোনো বন্ধু থাকার সম্ভাবনা নেই—এ হচ্ছে তাঁর শত্রুর রাজ্য! কিন্তু তবু একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী, জলে ডুবলে লোকে যে খড়কুটোও ধরবার চেষ্টা করে!

সুমিত্রা চেয়ার থেকে নেমে পড়ে আবার বসবার ঘরে গেলেন। সেখানে এখানে-ওখানে ছোটো-বড়ো খানকয় বাঁধানো বই পড়েছিল। একখানা বই তুলে নিয়ে ফের তিনি যথাস্থানে এসে দাঁড়ালেন। তারপর লক্ষ স্থির করে বইখানা ছুড়লেন সেই স্থির মূর্তির দিকে! বইখানা পড়ল গিয়ে তার পায়ের তলায়।

লোকটা চমকে উঠে মুখ তুলে চারিদিকে তাকাতে লাগল। তারপর গবাক্ষের ফাঁকে সুমিত্রাকে দেখেই সে তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠল—তার মুখে-চোখে বিস্ময়ের আভাস! শীর্ণ, দীর্ঘ মূর্তি!

সুমিত্রা নিজের ঠোঁটের উপরে আঙুল রেখে লোকটাকে সাবধান করে দিলেন।

মূর্তি পায়ে পায়ে আরও কাছে এগিয়ে এল।

সুমিত্রা তার মুখের দিকে তাকিয়েই তাকে চিনতে পারলেন। রাজনগরে যাবার পথে একবার এবং এই শৈলপ্রাসাদে আসবার পথে আর একবার এই মুখখানাকেই তিনি যে কাল রাতে দেখেছিলেন ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মতো! এ মুখ তিনি ভোলেননি!

॥ নবম পরিচ্ছেদ ॥

পত্র-বিনিময়

কোনো সন্দেহ নেই! সেই মূর্তিই বটে। যদিও দিনের আলো তার ভীষণতাকে বিলুপ্ত করে দিয়েছে!

কে এই ব্যক্তি? নিশীথ-রাতে দুরারোহ গিরিপথে, অন্ধকার ঝোপে-ঝাপে, বিজন উপত্যকায় ছায়ামূর্তির মতো কে এ ভেসে ভেসে বেড়ায়? এ কি উদাসী, এ কি পাগল?

সুমিত্রার মনের ভিতরে জাগতে লাগল এমনই সব প্রশ্ন।

কিন্তু চন্দ্র সিংহ একেবারেই অসহনীয়! যেমন করে হোক তার এই সোনার খাঁচার বাইরে যেতেই হবে! হয় মুক্তি, নয় মৃত্যু—সুমিত্রার যুক্তি হচ্ছে এই।

তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লোকটাকে লক্ষ করতে লাগলেন। সে-ও স্থির দৃষ্টিতে সুমিত্রার মুখের পানে তাকিয়ে রইল।

কেন তিনি জানেন না, কিন্তু সুমিত্রার মনে হল, গাছের পাখির পানে ক্ষুধার্ত সাপ হয়তো এই ভাবেই তাকিয়ে থাকে!

তারপরেই সুমিত্রা মনে মনে হেসে ভাবলেন, এমন সন্দেহের মানে হয় না! যাকে জীবনে আগে কখনো দেখিনি, যার সঙ্গে কোনো আলাপ পরিচয়ই নেই, সে আমার অনিষ্ট চিন্তা করবে কেন?

তিনি সমস্ত দুর্ভাবনা মন থেকে মুছে ফেলে হাত নেড়ে লোকটাকে সেইখানে অপেক্ষা করতে বললেন। তারপর চেয়ার থেকে নেমে পড়ে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

টেবিলের উপরে লেখার সরঞ্জাম ছিল। উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে সুমিত্রা এই চিঠিখানি লিখলেন:

'মহাশয়,

আপনি কে তা জানি না, কিন্তু আপনি কি একটি অসহায়া নারীকে সাহায্য করতে পারবেন?

আমি এখানে বন্দিনী। আপনি কি আমার মুক্তির উপায় করে দিতে পারবেন? যদি পারেন, যে কোনো পুরস্কার দিতে আমি নারাজ হব না। হ্যাঁ, যে কোনো পুরস্কার!

বিস্মিত হবেন না, বা অবিশ্বাস করবেন না। এখান থেকে বাইরে বেরুলে আমি আপনাকে লক্ষপতি করে দিতে পারি!

আমার প্রস্তাবে যদি সম্মত হন, তাহলে আসছে কাল সন্ধ্যার পর—অর্থাৎ সাতটা থেকে আটটার ভিতরে একটি দড়ির সিঁড়ি নিয়ে ঠিক এই জানলার তলায় অপেক্ষা করতে পারবেন? তারপর আমি সেটা তুলে নেবার ব্যবস্থা করব।

আর এক প্রার্থনা। জয়গড়ের চাষার মেয়েরা যে-রকম পোশাক পরে, আমি তেমনই একটি পোশাকও চাই।'

সুমিত্রা চিঠিখানি খামের ভিতরে পুরে তার সঙ্গে ছোটো একটি কাগজ-চাপাও রেখে দিলেন—ভার বাড়াবার জন্যে।

তারপর আবার ভাবতে লাগলেন, ও-লোকটা জয়গড়ের প্রজা হওয়াই সম্ভব। ও যদি এই চিঠিখানা চন্দ্র সিংহের হাতে দেয়, তাহলে?...

তাহলে কী-ই বা আর হবে? আমার অবস্থা এর চেয়ে বেশি খারাপ হওয়া অসম্ভব! আমাকে বন্দি করবার অধিকার চন্দ্র সিংহের নেই, কিন্তু এই বন্দিশালা থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টা করবার অধিকার নিশ্চয়ই আমার আছে!

আচ্ছা, চিঠিতে আর একটা অনুরোধ করলে কেমন হয়? ও-লোকটা যদি চিঠিখানা নিয়ে সুন্দর সিংহের কাছে যায়, তাহলে আমাকে উদ্ধার করবার জন্যে নিশ্চয়ই তিনি ক্রুদ্ধ সিংহের মতন এখানে ছুটে আসবেন?

তারপর যে-দৃশ্যের অবতারণা হবে, তার মধ্যে যে রোমান্সের দেখা পাওয়া যাবে বিস্ময়কর রূপে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই কিছুমাত্র! কিন্তু এখান থেকে রাজনগর যে অনেকদূর! নির্দয় বাস্তবের কবলে পড়েছি, রোমান্সের জন্যে অপেক্ষা করবার সময় কোথায়?

সুন্দর সিংহ, সুন্দর সিংহ, সুন্দর সিংহ! তোমার প্রত্যেক চাহনি, তোমার প্রত্যেক কথা, তোমার প্রত্যেক ভঙ্গি গানের মতো বাজছে আমার স্মৃতির গ্রামোফোনে, তুমি যদি খবর পেয়ে আজ আমাকে উদ্ধার করতে আসতে পারতে, তাহলে আমার যে কী আনন্দই হত! সৌভাগ্যের যথার্থ মূল্য আমরা তখনই দিতে পারি, চরম দুর্ভাগ্যের মধ্যে যখন তাকে লাভ করা যায়! কিন্তু সময় নেই, সময় নেই!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুমিত্রা উঠে আবার স্নানের ঘরে ঢুকে গবাক্ষের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

সেই শীর্ণ, দীর্ঘ মূর্তি পাথরের পুতুলের মতন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কাগজ-চাপা সুদ্ধ খামখানা তার কাছে গিয়ে পড়বামাত্র পাথরের পুতুল জ্যান্ত হয়ে উঠল!

খাম ছিঁড়ে চিঠি বার করে সে পড়তে লাগল। একবার মুখ তুলে সুমিত্রার দিকে তাকিয়ে যেন একটু হাসবার চেষ্টা করলে।

সুমিত্রা মনে মনে বললেন, 'হাসবার চেষ্টা কোরো না, ও-মুখে হাসি মানায় না। বরং ভাববার চেষ্টা করো।'

লোকটা কিছু ভাবলে কি না বোঝা গেল না, কিন্তু তখনই সে জামার ভিতরে হাত চালিয়ে বার করলে একখানা পকেট-বুক!

সুমিত্রা আশ্চর্য হয়ে মনে মনে বললেন, 'বটে? তোমার চেহারা চাষাড়ে বটে, কিন্তু পকেট-বুক রাখার অভ্যাস তোমার আছে? ও-রকম কাপড়-চোপড়ের ভিতর থেকে পকেট-বুকের আবির্ভাব এই প্রথম দেখলুম! তবে কি তুমি ছদ্মবেশী চর? ...কাগজ-পেনসিল নিয়ে তুমি কী লিখছ? তুমিও আমাকে কোনো চিঠি দেবে নাকি?'

লোকটা কাগজ-চাপার উপরে কাগজখানা জড়িয়ে গবাক্ষ লক্ষ্য করে ছুড়লে। কিন্তু কাগজখানা এত উঁচুতে উঠল না।

সুমিত্রাকে আবার পাশের ঘরে যেতে হল। খানিক খোঁজাখুঁজির পর একটা লাল ফিতার বান্ডিল আবিষ্কার করে আবার তিনি ফিরে এলেন যথাস্থানে। বান্ডিলের ফিতা নীচের দিকে ঝুলিয়ে চিঠিখানা তিনি টেনে তুললেন।

চিঠিতে লেখা ছিল:

'আপনি কে, আমি তা জানি।

আমি আপনার কথামতো কাজ করব। কাল সন্ধ্যার পর যথাসময়ে আমি এই জানলার তলায় হাজির থাকব। ওখান থেকে নেমে যান। কেউ যেন আপনার উপরে সন্দেহ করতে না পারে। আমার চিঠি ছিঁড়ে ফেলুন।'

চিঠি পড়ে সুমিত্রা মুখ তুলে দেখলেন,—মূর্তি কখন সরে গেছে, মায়া-ছায়ার মতো!

পাশের ঘর গিয়ে দেখলেন, লক্ষ্মী দাঁড়িয়ে আছে।

লক্ষ্মী বললে, 'মহারানি, এখনও আপনার স্নান হয়নি?'

—'না লক্ষ্মী, আমি স্নান করব না। শরীর ভালো নেই।'

লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে সুমিত্রার কপালের উপরে হাত রেখে তাঁর দেহের উত্তাপ পরীক্ষা করে বললে, 'না, জ্বর-টর হয়নি। কিন্তু আপনার দেহ এত ঠান্ডা কেন? এ তো ভালো লক্ষণ নয়!'

লক্ষ্মী জানে না সুমিত্রা এতক্ষণ গবাক্ষের ধারে দাঁড়িয়েছিলেন, কনকনে পাহাড়ে-শীতের বাতাস লেগে তাঁর দেহের তাপ নেমে গিয়েছে!

সুমিত্রা বললেন, 'লক্ষ্মী, আমি এখন বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করব। দাঁড়িয়ে থাকতে আমার কষ্ট হচ্ছে।'

—'কেন মহারানি, যৌবন কি কষ্টসহ নয়?'

লক্ষ্মী সসম্ভ্রমে পিছিয়ে গেল। সুমিত্রা ফিরে দেখলেন চন্দ্র সিংহকে।

—'রাজা, কষ্ট সইতে পারে কেবল সুখী যৌবন। দুঃখিত যৌবন বার্ধক্যের চেয়েও দুর্বল।'

—'স্বীকার করি মহারানি। কিন্তু যার সামনে রয়েছে সুখের সাগর, সে যদি তাকে ফেলে খোঁজে দুঃখের মরু, তাহলে ভগবানও তাকে সাহায্য করতে পারেন কি?'

—'সুখের সাগরেও ডুবে মরবার ভয় নেই নাকি?'

—'আছে। তাই সাঁতার শেখা দরকার।'

—'শিখছি রাজা, শিখছি। ডুব-সাঁতার দিয়ে আমি সুখ-সাগর পেরিয়ে যেতে চাই।'

—'আপত্তি নেই। কারণ আমিও আপনার অনুসরণ করব।'

—'তাহলে সেই শুভ দিনের জন্যে অপেক্ষা করুন রাজা! কিন্তু এটাও যেন ভুলবেন না যে, আপনাকে ফাঁকি দেবার শক্তি আমার আছে!'

কথাবার্তার ধরন দেখে লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি সরে পড়ল।

চন্দ্র সিংহ আরও দুই পা এগিয়ে এলেন। ধীরে ধীরে বললেন, 'মহারানি, অকারণে কথা-কাটাকাটি করে আমরা কি মূল্যবান সময় নষ্ট করছি না?'

—'আমিও আপনাকে ঠিক এই প্রশ্নই করতে পারি।'

—'না, তা পারেন না। কারণ প্রশ্নের উত্তর আছে আপনারই কাছে।'

—'কিন্তু উত্তর তো আমি আগেই দিয়েছি!'

—'উত্তর দেননি মহারানি, প্রতিবাদ করেছেন।'

—'আপনার মনের মতো উত্তর না হলেই সেটা যদি প্রতিবাদ হয় তাহলে আমি নিরুপায়। কিন্তু জেনে রাখুন রাজা, প্রতাপপুরে আমি ফিরে যাবই।'

—'নিশ্চয়ই। কিন্তু তার আগে আপনাকে জয়গড়ের সিংহাসনে আমার বাম পার্শ্ব অধিকার করতে হবে।'

—'জয়গড়ের সিংহাসন? প্রতাপপুরের আঘাতে তা চূর্ণ হয়ে যাবে।'

—'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! আমারও তাতে আপত্তি নেই।'

সুমিত্রা বিস্মিত চোখ তুলে চন্দ্র সিংহের মুখের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'এটা কি ব্যঙ্গ?'

চন্দ্র সিংহ বিষম গম্ভীর হয়ে বললেন, 'না। প্রতাপপুরের মহারানিকে লাভ করলে জয়গড়ের সিংহাসনের দিকে আমি ফিরেও তাকাব না।'

সুমিত্রা বিরক্ত স্বরে বললেন, 'রাজা, শিশুরা একই গল্প বারবার শুনতে চায় বটে, কিন্তু আমি শিশু নই। আমার শরীর শুধু শ্রান্ত নয়, অসুস্থ। আজ আমাকে একেবারে একলা থাকতে দিন।'

—'যথা আজ্ঞা, মহারানি! একলা থাকলে চিন্তা করবার সুবিধা হয়। আমার খালি এই অনুরোধ, এখান থেকে পালাবার চিন্তা করবেন না, কারণ সেটা অসম্ভব। এই ঘরটা মাটি থেকে ষাট ফুট উঁচু। তার পরে আছে উপত্যকা। সেখানে ঢোকবার বা সেখান থেকে বেরুবার পথ বাইরের কেউ জানে না।'

ধাঁ করে সুমিত্রার মনে এক সন্দেহ খেলে গেল। সেই অপরিচিত ব্যক্তিকে লেখা পত্রখানা এরই মধ্যে চন্দ্র সিংহের হস্তগত হয়েছে নাকি? কিন্তু তাঁর মুখ দেখে কিছুই জানা যায় না। সে মুখ হয়েছে আবার মুখোশের মতো।

চন্দ্র সিংহ বললেন, 'জয়গড়ের সমস্ত প্রজা আমার সঙ্গে একমত। তারা আমার বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্রেই যোগ দেবে না। তারা সতর্ক আর বিশ্বাসী।'

সুমিত্রা তিক্ত কণ্ঠে বললেন, 'রাজা, আপনার এই প্রাসাদের দেওয়ালের ভিতরে আপনি আমার মনকেও বন্দি করে রাখতে চান নাকি?'

—'না মহারানি। মনকে বন্দি করতে পারে এমন দেওয়াল আজও তৈরি হয়নি। কিন্তু আমি আপনার মনকে চাই না, চাই খালি আপনার দেহকে। দেহকে বন্দি করা আর লাভ করা কঠিন নয়।'

উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করেই চন্দ্র সিংহ ঘরের বাইরে চলে গেলেন।

॥ দশম পরিচ্ছেদ ॥

লীলাময়ী

পরদিন সকালবেলায় লক্ষ্মী এসে দেখলে, একখানা দামি 'রাগ' দিয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে সুমিত্রা শুয়ে আছেন।

—'মহারানি, আপনার চা প্রস্তুত।'

—'রাগে'র ভিতর থেকে জবাব এল, 'আমি চা খাব না।'

—'সে কী মহারানি, কাল সারাদিন রাতে আপনি যে কিছুই খাননি!'

—'আমার অসুখ হয়েছে। আমি কিছু খাব না।'

—'মহারানি, এমন অবুঝ হবেন না। এ-রকম একগুঁয়েমি করে লাভ নেই। আমাদের মহারাজার কথা শুনুন, আপনার ভালো হবে—তাঁর মতো সাধু আর ভদ্রলোক দুর্লভ।'

'রাগে'র একপ্রান্ত সরিয়ে মুখ বার করে সুমিত্রা তিক্তস্বরে বললেন, 'লক্ষ্মী, প্রতাপপুরে আমরা সাধু আর ভদ্রলোক বলতে অন্যরকম মানুষ বুঝি। সেখানে যারা নারীহরণ করে তারা থাকে জেলখানার ভিতরে।'

সুমিত্রার কথা যেন শুনতে পায়নি এমনি ভাব দেখিয়ে লক্ষ্মী ঘরের এটা-ওটা-সেটা গুছিয়ে রাখতে লাগল।

—'বলতে পারো লক্ষ্মী, আমার সঙ্গের লোকজনেরা কোথায়?'

—'তাঁরাও মহারাজার আতিথ্য স্বীকার করে এইখানেই আছেন।'

—'ও, তাঁরাও তাহলে আমার মতোই বন্দি?'

—'মহারানি, এটা হচ্ছে রাজপ্রাসাদ, বন্দিশালা নয়।'

—'তাহলে তোমাদের মহারাজার কাছে গিয়ে জানাও যে, আমাদের মন্ত্রীমশাইয়ের সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই।'

—'মহারাজা বলে রেখেছেন, আপনি তাঁর প্রস্তাবে রাজি হলেই মন্ত্রীমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন।'

—'তোমাদের মহারাজাকে ধন্যবাদ! সেক্ষেত্রে মন্ত্রীমশাইয়ের সঙ্গে দেখা না করলেও আমার চলবে।'

—'বেলা বাড়ছে মহারানি!'

—'সেজন্যে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। আপাতত তুমি এখান থেকে সরে পড়ো দিকি, কারুর সঙ্গে কথা কইতে আমার ভালো লাগছে না। ঘরের দরজা আমি ভিতর থেকে বন্ধ করে দিতে চাই।'

সুমিত্রা 'রাগ' ফেলে বিছানার উপরে উঠে বসলেন।

লক্ষ্মী কী বলবার উপক্রম করতেই সুমিত্রা রাজ্ঞী-মহিমায় দ্বারের দিকে করলেন অঙ্গুলি নির্দেশ।

তাঁর মুখ চোখের ভাব দেখে লক্ষ্মী আর কিছু না বলে বাইরে বেরিয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে শুনলে, পিছনে দরজা বন্ধ হওয়ার ও খিল লাগানোর শব্দ।

ঠিক সেই মুহূর্তেই সেখানে এসে দাঁড়ালেন চন্দ্র সিংহ।

—'আজকের খবর কী?'

—'মহারানির শরীর খারাপ। আজও তিনি উপবাস করতে চান।'

—'অসুখ-বিসুখ কিছু নয়। এ সবই ভাণ। আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা।'

—'হতে পারে মহারাজ! কিন্তু দিনের পর দিন উপবাস সোমত্ত মেয়ের দেহে সইবে কেন?'

—'এ উপবাস ভঙ্গ করতেই হবে।'—চন্দ্র সিংহ এগিয়ে গিয়ে বন্ধ দরজার উপরে করাঘাত করলেন।

একবার, দুইবার, তিনবার—বহুবার করাঘাতের ও ডাকাডাকির পরেও দরজাও খুলল না, সাড়াও পাওয়া গেল না।

এবং দরজা বন্ধ রইলই সারাদিন। সন্ধ্যার সময়েও আর-একবার চন্দ্র সিংহের আবির্ভাব। এবং আবার ডাকাডাকি, সাধাসাধি ও দরজা ঠেলাঠেলির পালা। দ্বার মুক্ত হল না এবং দরজার ওপাশে কোনো মানুষ আছে বলেও জানা গেল না।

—'লক্ষ্মী!'

—'মহারাজ!'

—'জয়গড়কে ভয় দেখাবার জন্যে প্রতাপপুর নতুন কৌশল অবলম্বন করেছে!'

লক্ষ্মী চুপ।

—'সত্যিকথা বলতে কী লক্ষ্মী, আমার মনে আশঙ্কার উদয় হয়েছে। প্রতাপপুরের মহারানি যদি জয়গড়ের প্রাসাদে বন্দিনী অবস্থায় প্রায়োপবেশন করে প্রাণত্যাগ করেন, তাহলে সারা পৃথিবী আমাকে অভিনন্দন দেবে না।'

—'কিন্তু উপায় কী মহারাজ?'

—'একমাত্রা উপায় হচ্ছে দরজা ভেঙে ফেলা।'

—'তারপর কী করবেন? দরজা ভেঙে ফেললেই কি মহারানির খাবার ইচ্ছা হবে?'

শুকনো হাসি হেসে চন্দ্র সিংহ বললেন, 'ইনি সে শ্রেণির মহারানি নন।'

—'তবে কি ওঁকে আমাদের জোর করে খাওয়াতে হবে?'

—'সম্ভ্রান্ত-সমাজে ও-রকম প্রথার চলন নেই। দরজা ভাঙবার পর বোঝা

যাবে, কী করা উচিত। আপাতত তুমি রীতিমতো চেঁচিয়ে জানিয়ে দাও যে, রাত দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে আমরা দরজা ভাঙতে বাধ্য হব!'

লক্ষ্মী আদেশ পালন করলে। দরজা ভেদ করে সে কথাগুলো সুমিত্রার কাণ পর্যন্ত পৌঁছল। তিনি তখন বিছানায় বসে কাঁচি নিয়ে জানলার একটা রেশমি পর্দা লম্বালম্বি ভাবে কেটে ফেলছিলেন। লক্ষ্মীর কথা শুনে তাঁর কিছুমাত্র ভাবান্তর হল না। একমনে নিজের কাজেই তিনি নিযুক্ত হয়ে রইলেন। খানিকক্ষণ পরে পর্দার কাটা অংশগুলো পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে একগাছা খুব লম্বা দড়ি তৈরি করলেন। তারপর ঘড়ির দিকে তাকালেন। সাতটা বেজে বিশ মিনিট।

সময় হয়েছে! কিন্তু সুমিত্রার মন দুলছে সন্দেহ দোলায়! কালকের সেই লোকটা কি কথামতো কাজ করবে—কিংবা করতে পারবে? চন্দ্র সিংহ হয়তো সব জেনেছেন, তার ষড়যন্ত্র ধরা পড়েছে, লোকটাও বন্দি হয়েছে! ...কিন্তু তবু, তবু...একবার উঠে গিয়ে দেখেই আসা যাক না!

সুমিত্রা উঠে দাঁড়ালেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাথা ঘুরতে লাগল।

মনে মনে ভাবলেন, মানুষের দেহ কী তুচ্ছ! দু-দিনের উপবাসেই সে পঙ্গু হয়ে পড়তে চায়! হাজার হাজার দিন ধরে রাজভোগ খাইয়ে কত যত্নে যাকে গড়ে তোলা হয়েছে, মাত্র দু-দিনের উপবাস সে সহ্য করতে পারে না! মানুষের মন মানুষকে ভগবানের মতো সর্বশক্তিমান, অজর ও অমর করে তুলতে চায়, কিন্তু তাকে বাধা দেয় তার এই দেহ—এই পেটুক, দুর্বল, ভঙ্গুর দেহ! সাধনার দ্বারা মানুষ কি কোনোদিন দেহহীন, মনোময় হতে পারবে না?

সুমিত্রা ধীরে ধীরে স্নানঘরে গিয়ে ঢুকলেন। একখানা চেয়ার আগেই গবাক্ষের তলায় টেনে নিয়ে গিয়ে রাখা হয়েছিল। তার উপরে উঠে দাঁড়িয়ে সুমিত্রা উঁকি মেরে দেখলেন, বনমর্মরের দ্বারা ছন্দিত নিরন্ধ্র অন্ধকার গ্রাস করে ফেলেছে বিশ্বের সব দৃশ্য! ফেলুক গ্রাস করে! আজ অন্ধকার দেখে আমি ভয় পাব না। আজ যত অন্ধকার, তত ভালো!

...কিন্তু যার ভরসা করছি, সে কি এখানে এসেছে?

সুমিত্রা নিজের হাতে তৈরি করা সেই রেশমি দড়ি নীচের দিকে ঝুলিয়ে দিলেন উদ্বেগ-ভরা বুকে, কম্পিত হস্তে।

খানিকক্ষণ পরে নীচে থেকে দড়িতে টান পড়ল।

সুমিত্রার দেহের ভিতর দিয়ে একটা বিপুল আনন্দ ও উত্তেজনার ঢেউ বয়ে গেল! তাহলে এসেছে—সে এসেছে!

দড়িতে আবার ঘন ঘন টান! বোধহয় তাকে দড়িটা আবার উপরে টেনে তোলবার জন্যে সঙ্কেত করা হচ্ছে!

সুমিত্রা দড়ি টানতে লাগলেন। বেশ বোঝা গেল, তার অপর প্রান্তে কিছু বাঁধা আছে!

দড়ির অপর প্রান্তে ছিল একটি পোঁটলা। তার মধ্যে ছিল একটি দড়ির সিঁড়ি, একটি চাষার মেয়ের পোশাক ও একখানি চিঠি।

চিঠিখানি এই:

'মহারানি,

রাত বারোটার আগে নীচে নামবার চেষ্টা করবেন না। আমি এইখানেই অপেক্ষা করছি।'

সুমিত্রার মনে আবার প্রশ্ন জাগল, কে এই ব্যক্তি? একে অবলম্বন করার অর্থই হচ্ছে, অনিশ্চিতের কবলে আত্মসমর্পণ করা—আমার জন্যে কোনো গুরুতর বিপদ নীচে অপেক্ষা করে নেই তো?

তাঁর মাথা আবার ঘুরতে লাগল। ভবিষ্যতের ভাবনা ভুলে তিনি স্থির করলেন, আগে উপবাস ভঙ্গ করা যাক! এমন দুর্বল দেহ আমার কোনো কাজেই লাগবে না।

সন্দেহজনক সমস্ত জিনিস চোখের আড়ালে লুকিয়ে রেখে সুমিত্রা খুলে দিলেন ঘরের বন্ধ দরজা।

লক্ষ্মীর দেখা পেতে দেরি লাগল না।

—'লক্ষ্মী!'

—'মহারানি!'

—'আমার অসুখ আর নেই। আমার বড়ো খিধে পেয়েছে।'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ মহারানি, ক্ষুধার অপরাধ নেই। দয়া করে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করুন, আমি এখনই খাবার-দাবার নিয়ে আসছি।'—লক্ষ্মী যেতে যেতে মনে মনে বললে, 'মহারানি হলেও তুমি নারী ছাড়া আর কিছু নও! মহারাজা ঠিক বলেছেন। তোমার এই অসুখ আর উপোস হচ্ছে যৌবনের লীলাখেলা। যাক, বাগ যে মানলে, এই ঢের!'

খানিক পরে সুমিত্রা খেতে খেতে মুখ তুলে দেখলেন, একটু তফাতে দাঁড়িয়ে চন্দ্র সিংহ মুখ টিপে হাসছেন।

—'রাজা, আমার আহারের দৃশ্যটা বোধহয় হাস্যকর?'

—'মোটেই নয় মহারানি, মোটেই নয়। আমি হাসছি অন্য কথা ভেবে। এই মেঘ, এই রোদ। এ আমার খুব ভালো লাগে। ছায়া না থাকলে আলোর শোভা হয় না।'

সুমিত্রার ইচ্ছা হল না এখন কোনো বাদানুবাদে যোগ দেবার জন্যে। নীরবে নতমুখে তাড়াতাড়ি আহার করতে লাগলেন।

—'মহারানি, শিশুরা চিত্তাকর্ষক কেন? তারা বিচিত্র! তাদের ভাবভঙ্গি সর্বদাই পরিবর্তনশীল। তারা এই হাসে এই কাঁদে, এই রাগে এই খেলা করে। তাই তো তাদের দিকে আকৃষ্ট হই।'

আহার শেষে জলপান করে সুমিত্রা বললেন, 'রাজা, শিশুর সঙ্গে কার তুলনা করতে চান?'

—'যৌবনের। ওর মধ্যেও আছে প্রচুর শিশুত্ব, তাই তো সে এত লোভনীয়! যৌবনের প্রধান সৌন্দর্যই হচ্ছে শিশুত্ব। তাকে ধরতে গেলে সে ছুটে পালায়, তাকে ত্যাগ করলে সে পিছু নিতে চায়।'

—'রাজা এখন কী করতে চান? আমাকে ধরতে?'

—'সেই চেষ্টাই তো করছি!'

—'তাহলে এই আমি ছুটে পালালুম'—সুমিত্রা খিল খিল করে হেসে উঠে দ্রুতপদে শোবার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

বন্ধ দ্বারের দিকে তাকিয়ে চন্দ্র সিংহ মনে মনে বললেন, 'মহারানি, তোমার লীলা দেখে আমার মনে আশার সঞ্চার হচ্ছে। লীলাময়ী, তুমি আমারই হবে!'

॥ একাদশ পরিচ্ছেদ ॥

লীলাময়ীর নব লীলা

পরের দিন সকালবেলা। চন্দ্র সিংহ তাঁর বৈঠকখানায় ঢুকে দেখলেন, সুমিত্রার ঘরের দরজা তখনও খোলেনি।

একখানা সোফার উপরে বসে পড়ে তিনি সিগারেট-কেস বার করলেন। একটি সিগারেট বেছে নিয়ে অগ্নিসংযোগ করে শুনলেন, দালানে ঝোলানো

খাঁচায় বসে কেনারি পাখিরা এই শীত-প্রভাতের তপ্ত সূর্যকরের সঙ্গে নিজেদের মধুর সুরলহরী মিলিয়ে দেবার চেষ্টা করছে।

চন্দ্র সিংহ মনে মনে বললেন, 'বুনো পাখিরাও খাঁচায় এসে পোষ মানে, প্রাণের গান গায়। সভ্য মানুষ পোষ মানবে না কেন?'

ঘড়িতে নয়টা বাজল। লক্ষ্মী এল ঘরের ভিতরে।

—'লক্ষ্মী, প্রতাপপুরের মহারানি বিছানাকে বড়ো বেশি ভালোবাসেন দেখছি।'

—'মহারাজ, এর আগে আমি দু-বার এসে ওঁর ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করেছি।'

—'এত বেশিক্ষণ ঘুমোতে পারে খুব-অলস আর খুব-সুখীরা। প্রতাপপুরের মহারানিকে দেখলে তো এর কোনোটাই মনে হয় না!'

—'মহারাজ, খুব দুঃখেও মানুষ যখন ভেঙে পড়ে, তখনও সে শয্যা ছেড়ে উঠতে চায় না।'

—'শয্যা ছেড়ে উঠতে না-চাওয়ার মানে বেলা ন-টা পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকা নয়। দুঃখে মানুষ শয্যাশায়ী হতে পারে, কিন্তু তার ঘুম হয় না।'

—'কিন্তু মহারানিকে দেখে কাল তো দুঃখী বলে মনে হয়নি! বরং খেয়ে দেয়ে ঘরে ফিরে গিয়ে কাল রাত্রে 'অর্গ্যান' বাজিয়ে তিনি তিনটে গান গেয়েছিলেন।'

—'কী গান?'

—'ধর্মসংগীত নয় মহারাজ!'

—'বুঝেছি। সুলক্ষণ। তাহলে তুমি আর-একবার দরজায় ধাক্কা মারতে পারো। বোধ হয় উনি জেগে আছেন, দুষ্টুমি করে সাড়া দিচ্ছেন না।'

লক্ষ্মী এগিয়ে গিয়ে সুমিত্রার দরজায় ধাক্কা মারতে লাগল বারংবার। সাড়া নেই। দরজাও খুলল না।

চন্দ্র সিংহ মনে মনে হেসে ভাবলেন। 'লীলাময়ী, এ আবার তোমার কী নূতন লীলা? তোমার আলেয়ার ভূমিকায় এ-অভিনয় ক্রমেই একঘেয়ে হয়ে আসছে! তার চেয়ে বন্যার ভূমিকা গ্রহণ করো। বিপুল বেগে ছুটে এগিয়ে এসো—আমাকে আক্রমণ করো, আমাকে আচ্ছন্ন করে দাও। আমি সম্মুখ-যুদ্ধ ভালোবাসি!'

একজন ভৃত্য এসে জানালে, প্রাসাদ-রক্ষক মহারাজের দর্শন-প্রার্থনা করছে। অত্যন্ত জরুরি সংবাদ।

প্রাসাদ-রক্ষককে সেইখানে পাঠিয়ে দেবার হুকুম হল।

চন্দ্র সিংহ বললেন, 'লক্ষ্মী, মহারানির এই ব্যবহার ভারী বাড়াবাড়ি বলে বোধ হচ্ছে। তাঁকে কি আবার দরজা ভাঙব বলে শাসাতে হবে?'

লক্ষ্মী মনে মনে হেসে মুখে বললে, 'মহারানি বোধহয় মহারাজার সঙ্গে কৌতুক করছেন!'

চন্দ্র সিংহ প্রকাশ্যেই হেসে ফেলে বললেন, 'তুমি কি তাই মনে করো লক্ষ্মী? তাহলে সেটা তো আমার পক্ষে আশার কথা! মানুষ যাকে ঘৃণা করে তার সঙ্গে কৌতুক করে না—কী বলো?'

লক্ষ্মী মতপ্রকাশ করবার আগেই প্রাসাদ-রক্ষক ঘরে ঢুকে অভিবাদন করলে।

চন্দ্র সিংহ তার দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, 'ইন্দ্রলাল, তোমার মুখখানাকে ঠিক ফেটে যাবার আগে রবারের ফানুসের মতো দেখাচ্ছে কেন!'

—'মহারাজ, এইমাত্র আমি প্রাসাদের চারিদিকটা ঘুরে দেখে এলুম।'

—'সেটা তো অভূতপূর্ব ব্যাপার নয়। এজন্যে তোমার মুখ ফানুসের মতো হবে কেন?'

—'মহারাজ, আমার মুখ কেমন দেখাচ্ছে আমি তা জানি না। কিন্তু আপনার স্নানঘরের গবাক্ষ দিয়ে ঝুলছে একটা দড়ির সিঁড়ি।'

চন্দ্র সিংহ মনে মনে বিস্মিত ও চমকিত হলেন, কিন্তু তাঁর মুখের কোনোই ভাবান্তর হল না। মুহূর্তকাল স্তব্ধ থেকে বললেন, 'ইন্দ্রলাল, তুমি কি ঠিক দেখেছ? তুমি তো জানো, দড়ির সিঁড়ি বয়ে ওঠা-নামা করার অভ্যাস আমার নেই?'

—'কিন্তু মহারাজ, আজকাল ও-স্নানঘর তো আপনি নিজে ব্যবহার করেন না!'

—'তুমি যা বলতে চাও, বুঝেছি। কিন্তু প্রতাপপুরের মহারানি যে 'স্যুট-কেসে'র মধ্যে দড়ির সিঁড়ি নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন, এ কথা বিশ্বাস করতে আমি প্রস্তুত নই। ও সিঁড়ি সরবরাহ করেছে অন্য কেউ।'

—'হুজুর, আমারও তাই মনে হয়। কিন্তু অন্য কে হতে পারে? প্রাসাদের ভিতরে কেউ বিশ্বাসঘাতক নয়!'

—'এখনই সেটা বোঝা যাবে।' চন্দ্র সিংহ উঠে দাঁড়িয়ে একবার বদ্ধ দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। তারপর বললেন, 'ইন্দ্রলাল, লোক ডাকো। ওই দরজাটা ভেঙে ফেলতে হবে।'

ইন্দ্রলাল বেরিয়ে গেল।

চন্দ্র সিংহ অন্যমনার মতো বললেন, 'লক্ষ্মী, তুমি কী মনে করো? ওই দরজা ভাঙলে আমরা কি প্রতাপপুরের মহারানিকে দেখতে পাব?'

—'মহারাজ, অত উঁচু থেকে মহারানি দড়ির সিঁড়ি বয়ে কখনো নীচে নেমে বন-পাহাড় ভেঙে পালাতে পারেননি! মাগো, ভাবতেও আমার গায়ে কাঁটা দেয়!'

—'লক্ষ্মী, লক্ষ্মী, তোমাদের নারী-জাতি হচ্ছে অদ্ভুত জাতি। বাহির থেকে নারীকে দেখি আমরা নরম, ঠান্ডা, সুন্দর ফুলটি যেন! কিন্তু ভিতরে হাত দিতে গেলেই হাত পুড়ে যায়, সেখানে আছে আগ্নেয়গিরির তপ্ত, কঠিন, জ্বালাময় পাথর। তপ্ততা দূর করে তাকে গলিয়ে কোমল করে আনতে গিয়ে বহু রাজ্য হয়েছে আজ শ্মশান। এখন জয়গড়ের অবস্থা কী হবে তাই ভাবছি।' চন্দ্র সিংহ আবার একটি সিগারেট বাহির করলেন। সিগারেটটি দুই আঙুলের মধ্যে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অকারণেই দেখতে লাগলেন। তারপর একটি নিশ্বাস ফেলে সিগারেটটি ধরিয়ে যখন উঠে দাঁড়ালেন, তখন লোকজন এসে সুমিত্রার ঘরের দরজা ভেঙে ফেলেছে।

চন্দ্র সিংহ ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন—পিছনে পিছনে লক্ষ্মী ও ইন্দ্রলাল।

সুমিত্রার বিছানার উপরে কেউ নেই। তার অবস্থা দেখে বোঝা গেল, সেখানে রাত্রে কেউ শয়ন করেনি। বালিশ বিদ্ধস্ত নয়, চাদরে কুঞ্চন-রেখা নেই।

কক্ষতল থেকে কতকগুলো জামা-কাপড় কুড়িয়ে নিয়ে লক্ষ্মী বললে, 'মহারানি কাল এগুলো পরেছিলেন।'

চন্দ্র সিংহ বললেন, 'তাহলে রাত্রে তিনি বেশ-পরিবর্তন করেছিলেন!'

স্নানের ঘরে ঢুকে দেখা গেল, গবাক্ষের তলায় রয়েছে একখানা উঁচু চেয়ার।

চন্দ্র সিংহ তার উপরে উঠে দাঁড়ালেন। মুখ বাড়িয়ে দেখলেন, একটা দড়ির সিঁড়ি সোজা মাটি পর্যন্ত নেমে গিয়েছে।

ইন্দ্রলালও মেঝে থেকে একটা জিনিস কুড়িয়ে পেলে। একখানা চিঠি। এ হচ্ছে সেই অপরিচিত ব্যক্তির শেষ পত্র।

চন্দ্র সিংহ চিঠিখানা নিয়ে পড়লেন। তখনও তাঁর মুখের ভাব বদলাল না। তিনি নীরবে আর-একবার বাইরের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। গবাক্ষের ষাট ফুট নীচে রয়েছে অঙ্গন। তাকালেও মাথা ঘোরে। আঁধার রাত্রে, এই তুচ্ছ দড়ির

সিঁড়িকে অন্ধের মতো দুইহাতে জড়িয়ে, আন্দাজে ধাপে ধাপে পা দিয়ে শূন্যে দুলতে দুলতে পৃথিবীর মাটিতে অবতীর্ণ হতে পারে যে নারী, তিনি প্রতাপপুরের মহারানি না হলেও, চন্দ্র সিংহ নতমস্তকে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করতেন। কেবল তাঁর দেহ নয়, তাঁর মন পর্যন্ত যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল! মনের ভিতর দিয়ে তাঁর ছুটল উদ্দাম, বন্য চিন্তার ধারা!—'আশ্চর্য নারী, আশ্চর্য নারী! মহিমময়ী, তুমি-আমি একসঙ্গে থাকলে বিশ্বজয় করতে পারতুম অনায়াসে! আগে যদি তোমার প্রকৃতি জানতুম, তাহলে আমি এ পন্থা কখনোই অবলম্বন করতুম না!... কিন্তু শীতার্ত ভয়াল রাত, দৃষ্টি অন্ধ করা নিবিড় অন্ধকার, পথহীন অপরিচিত পর্বত ও উপত্যকা, হিংস্র নিষ্ঠুর অরণ্য, এর মধ্য দিয়ে কার হাত ধরে তুমি কোথায় যাত্রা করলে?... হ্যাঁ, তুমি বেশ জানো, আশাতীত পুরস্কারের লোভে তোমার পথপ্রদর্শক তোমাকে নিয়ে যথাস্থানে গিয়েই হাজির হবে!... কিন্তু দুনিয়ায় তো অর্থের চেয়েও রড়ো লোভ আছে! যদি তুমি যথাস্থানে গিয়ে পৌঁছতে না পারো? যদি তুমি গুরুতর কোনো বিপদে পড়ো? তার জন্যে যে দায়ী হব আমিই!'

চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল। ইন্দ্রলাল ডাকলে, 'মহারাজ!'

চন্দ্র সিংহ চেয়ার থেকে নেমে পড়ে বললেন, 'কী বলছ?'

—'একটা কথা মনে পড়ছে।'

চন্দ্র সিংহ কিছু বললেন না, জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইলেন।

ইন্দ্রলাল বললে, 'এই চিঠিখানা দেখেই বেশ বোঝা যাচ্ছে, কোনো বাইরের লোক এসে মহারানিকে সাহায্য করেছে। কিন্তু আমি সমস্ত সেপাই-শান্ত্রীকে প্রশ্ন করে জেনেছি, আজ পনেরো দিনের মধ্যে কোনো বাইরের লোককে কেউ এখানে দেখেনি—কেবল একজন ছাড়া।'

—'কে সেই একজন?'

—'একটা আধপাগলা চাষা। এই বনের ভেতরেই কোথায় তার বাসা। সে আজ আট-দশ দিন থেকে কিছু কিছু ভিক্ষা চাইবার জন্যে রোজ এখানে আসা-যাওয়া করেছিল। চাকরদের মহলে বসে গান-টান শোনাত, গল্প-গুজব করত। কিন্তু এখানে মহারানির পদার্পণের পরদিন থেকে আর তার দেখা পাওয়া যাচ্ছে না।'

চন্দ্র সিংহ ভাবতে ভাবতে বললেন, 'সে আজ আট-দশ দিন ধরে এখানে

আসছে? হুঁ, তাহলে মহারানিকে এখানে আনবার জন্যে আমরা যে-সব আয়োজন করেছিলুম সে-সমস্তই সে দেখেছে?'

—'হয়তো দেখেছে, হয়তো দেখেও কিছু বোঝেনি। তবে এও শুনলুম যে, আমাদের লোকেরা যখন পাথর টেনে এনে রাজনগরে যাবার পথটা বন্ধ করে দিচ্ছিল, তখন সেখানে সে-ও উপস্থিত ছিল।'

চন্দ্র সিংহ ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, 'অথচ কেউ তাকে তাড়িয়ে দেয়নি!'

—'হুজুর, সে নাকি আধপাগলা। অকারণেই হাসত, নাচত, গান গাইত আর এলোমেলো কথা কইত। কেউ তাকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনেনি।'

—'কিন্তু মহারানি আসবার পর থেকেই সে অদৃশ্য হয়েছে! ইন্দ্রলাল, একদল মূর্খের মধ্যে আমি বাস করছি! এখনই আমার সুমুখ থেকে বিদায় হও!'

ইন্দ্রলাল কাঁচুমাচু মুখে বিদায় হল। চন্দ্র সিংহ হেঁটমুখে ঘরের ভিতরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

একজন পরিচারক এসে দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে বললে, 'কুমার সুন্দর সিংহ মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে চান।'

চন্দ্র সিংহ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর মুখে-চোখে ফুটে উঠল বিস্ময় রেখা। বললেন, 'কে দেখা করতে চান?'

—'রাজনগরের কুমার সুন্দর সিংহ।'

॥ দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ॥

কুমারসাহেবের সংসারধর্ম

'রাজনগরের যুবরাজ সুন্দর সিংহ! এই শৈল-প্রাসাদে হঠাৎ এমন অনাহুত অতিথির আবির্ভাব কেন? তবে কি সুমিত্রাদেবীর অন্তর্ধানের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক আছে?' চন্দ্র সিংহ ভাবতে লাগলেন।

মিনিট-দুয়েক চিন্তার পর তিনি পরিচারককে বললেন, 'যাও, যুবরাজসাহেবকে নীচের বৈঠকখানায় বসাতে বলো গে। আমার নীচে যেতে মিনিট দশ-পনেরো দেরি হবে। আর এক কাজ করো। প্রতাপপুরের মন্ত্রী আর সেনাপতি মশাইকে এখনই এখানে নিয়ে এসো।'

পরিচারক প্রস্থান করলে। চন্দ্র সিংহ আবার হেঁটমুখে ঘরের ভিতরে পায়চারি করতে লাগলেন—তাঁর কপালে চিন্তার রেখা।

'সুমিত্রাদেবীর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই সুন্দর সিংহের আবির্ভাব—এর মধ্যে কি যোগাযোগ থাকতে পারে? সুন্দর সিংহ কেন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে? আমাকে শাসাতে, ভয় দেখাতে? বড়োই গোলমেলে ব্যাপার, আর এ বিশ্রী গোলমাল আমারই সৃষ্টি! দেখছি নিজেকে আমি যতটা চালাক ভাবি, আমি ততটা চালাক নই! বরং কেউ আমাকে বোকা বলে ডাকলেও আমি বিস্মিত হব না। হ্যাঁ, আমাকে বোকা বলেই ডাকা উচিত, কারণ বোকামির প্রধান লক্ষণই রয়েছে আমার মনের ভিতরে। পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো বোকাই নিজেকে সবচেয়ে বড়ো চালাক বলে সন্দেহ করে। ...হ্যাঁ মন্ত্রীমশাই, হ্যাঁ সেনাপতি, দুনিয়ার আমার চেয়ে মস্ত বোকা আর নেই!'

মন্ত্রীর পিছনে পিছনে সূরযমল তখন সবে ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়িয়েছেন, হঠাৎ চন্দ্র সিংহের এতটা আত্মলাঞ্ছনার কারণ অনুমান করতে না পেরে একেবারে থ হয়ে গেলেন।

চন্দ্র সিংহ বললেন, 'কী মুশকিল, কী মুশকিল! আপনাদের একেবারে যে আমার স্নানঘরে নিয়ে এসেছে! বোকা মনিবের চাকর-বাকর দেখছি আরও বেশি বোকা হয়! এই জন্যেই কথায় বলে, যেমন মনিব তেমনি কুকুর! ...এখন কোথায় আপনাদের বসতে দি বলুন দেখি?'

মন্ত্রী বললেন, 'থাক থাক, ব্যস্ত হবেন না, আমরা দাঁড়িয়ে থাকতে পারব।'

—'পারবেন? শুনে আশ্বস্ত হলুম। ...সেনাপতি, আপনার অমন সম্ভ্রান্ত জাঁদরেলি গোঁফে যে বড়ো বেশি পাক ধরেছে, কলপ লাগান না কেন?'

ওই মস্ত গোঁফটিকে সূরযমল নিজের মুখের প্রধান অলংকার বলে মনে করতেন। ওর অকালপক্কতার জন্যে তাঁর আপশোশের অবধি নেই। তাঁর পাক ধরা গোঁফ রাজদৃষ্টি আকৃষ্ট করেছে দেখে তিনি নিতান্ত ম্রিয়মান হয়ে পড়লেন।

মন্ত্রী তখন ভাবছেন, 'এই অদ্ভুত রাজার কথাবার্তার গতি সাপের চেয়েও আঁকাবাঁকা। ইনি মনে যখন এক কথা ভাবেন, মুখে বলেন আর এক কথা। আমার বিশ্বাস, উনি হাসতে হাসতেই ফাঁসির হুকুম দিতে পারেন। আজ ওঁর গৌরচন্দ্রিকার ধরন দেখে আমার আশঙ্কা হচ্ছে। খবর নিশ্চয়ই শুভ নয়!'

চন্দ্র সিংহ বললেন, 'আপনাদের কেউ রাজনগরের কুমার সুন্দর সিংহের হাতের লেখা চেনেন?'

মন্ত্রী অবাক হয়ে গেলেন। কী কথা হতে হতে হঠাৎ আবার এ কী প্রশ্ন?

সূরযমল বললেন, 'আমি চিনি। খুব ভালো করেই চিনি। কারণ রাজনগর স্টেটে আমি অনেক দিন কাজ করেছি।'

—'সুসংবাদ! তাহলে এটা কার হাতের লেখা দেখুন দেখি!' চন্দ্র সিংহ সেই অপরিচিত হাতে সুমিত্রাকে লেখা পত্রখানি সূরযমলের হাতে অর্পণ করলেন।

মন্ত্রীও সাগ্রহে সূরযমলের কাঁধের উপরে মুখ বাড়িয়ে পত্রখানি পড়ে নিলেন।

সূরযমল মাথা নেড়ে বললেন, 'এ লেখা আমি চিনতে পারছি না।'

—'এ লেখা কুমার সুন্দর সিংহের নয়?'

—'না।'

মন্ত্রী বললেন, 'এ যে রহস্যময় পত্র! এর অর্থ কী?'

চন্দ্র সিংহ একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'পত্রের অর্থ জানতে চান? তাহলে পাশের ওই ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখুন। ওই বিছানায় প্রতাপপুরের মহারানি শয়ন করতেন।'

—'করতেন?'

—'হ্যাঁ, করতেন। 'করেন' বা 'করবেন' বলতে পারলুম না।'

—'মহারাজ, মহারাজ!'

—'মাভৈ মন্ত্রী, মাভৈ! আগে সব শুনুন। প্রতাপপুরের মহারানি কাল রাত্রে ও বিছানায় শয়ন করেননি। বিছানার তলায় ওই যে পোশাক পড়ে রয়েছে দেখছেন, ও হচ্ছে মহারানিরই পোশাক। তিনি কাল রাত্রে কখন সকলের অগোচরে পোশাক ছেড়ে খুব সম্ভব ছদ্মবেশ পরে আমাদের প্রাসাদের বাইরে বায়ুসেবন করতে গিয়েছেন, এখনও ফেরেননি।'

মন্ত্রী হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'অসম্ভব! এত সেপাই-শান্ত্রীর পাহারা এড়িয়ে—'

বাধা দিয়ে চন্দ্র সিংহ বললেন, 'ঠিক তাই। আমার সেপাই-শান্ত্রীরা আমার চেয়েও বোকা বনে গেছে। কারণ সুমিত্রাদেবী বাইরে বেড়াতে যাবার একটি নূতন পথ আবিষ্কার করেছেন। তিনি বাইরে বেড়াতে গিয়েছেন ওই গবাক্ষ-পথ দিয়ে'—বলেই গবাক্ষের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করলেন।

মন্ত্রী ও সেনাপতি দুইজনেরই মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল।

চন্দ্র সিংহ হাস্য করে বললেন, 'আবার বলছি—মাভৈ! আত্মহত্যা করে

লোক হাসাবার মেয়ে সুমিত্রাদেবী নন। তিনি এ গবাক্ষ থেকে ঝাঁপ খাননি। মন্ত্রীমশাই, এই চেয়ারে উঠে দাঁড়িয়ে গবাক্ষ দিয়ে একবার বাইরের দিকটায় চোখ বুলিয়ে নিন। তাহলেই সব জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

মন্ত্রী চেয়ারে উঠে মুখ বাড়িয়ে দড়ির সিঁড়িটা দেখেই আর্তনাদের মতো শব্দ করলেন।

সূরযমল কৌতূহলী স্বরে বললেন, 'কী, কী, ব্যাপার কী?'

মন্ত্রী নেমে পড়ে গম্ভীর মুখে বললেন, 'চেয়ারে উঠে নিজেই দ্যাখো না!'

সূরযমল দেখলেন। বিপুল বিস্ময়ে তাঁর জাঁদরেলি গোঁফ যেন ফুলে উঠল। রাজা চন্দ্র সিংহের অস্তিত্বের কথা তিনি ভুলে গেলেন। চিৎকার করে বললেন, 'হতে পারে না, হতে পারে না—এ কখনোই হতে পারে না!'

চন্দ্র সিংহ হুস করে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'কী হতে পারে না সেনাপতি?'

—'বাব্বা, এই সিঁড়ি দিয়ে নামতে গেলে আমিই মাথা ঘুরে হব পপাত ধরণীতলে! এইখান দিয়ে নেমেছেন আমাদের মহারানি? অসম্ভব!'

—'মন্ত্রীমশাইও কি তাই মনে করেন?' চন্দ্র সিংহ হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন।

মন্ত্রী কিছু বললেন না, অত্যন্ত সন্দেহ ভরা চোখে রাজার দিকে চেয়ে রইলেন।

—'আপনার চোখ দেখে মনের কথা বোঝা শক্ত নয়। ভাবছেন, প্রতাপপুরের মহারানিকে গুম করে রেখে, দড়ির সিঁড়ি দেখিয়ে আমি লোক ভোলাবার চেষ্টা করছি, না মন্ত্রীমশাই? আমি চেষ্টা করলেও কখনো অমন প্রথম শ্রেণির দুরাত্মায় পরিণত হতে পারব না!'

মন্ত্রী বললেন, 'মহারাজ, আপনি কি বলতে চান, আমাদের মহারানি ওই দড়ির সিঁড়ি সঙ্গে করে এখানে এসেছেন?'

—'না। ইতিহাসে কুবিখ্যাত কোনো মহারানিও দড়ির সিঁড়ি বহন করেছেন বলে শোনা যায়নি। আমার মত হচ্ছে, যার চিঠি আপনারা পড়লেন, ওই দড়ির সিঁড়ির মালিক বা বাহন হচ্ছে সেইই।'

—'কে সে?'

—'আমিও তাই জানতে চাই। সে যেইই হোক, এই জয়গড়ের কেউ নয়। এতক্ষণ আমার সন্দেহ ছিল রাজনগরের কুমার সুন্দর সিংহই এই পত্রের লেখক। কিন্তু সেনাপতি বলছেন চিঠির লেখা সুন্দর সিংহের নয়!'

মন্ত্রী বললেন, 'মহারাজের সন্দেহ করবার ক্ষমতা দেখে বিস্মিত হচ্ছি।'

—'বিস্মিত হচ্ছেন? তাহলে আর একটা কথা শুনলে বোধহয় আরও বেশি বিস্মিত হবেন? জানেন, আমার নীচের বৈঠকখানায় এখন সুন্দর সিংহ বসে আছেন? হঠাৎ এখানে তাঁর আগমন কেন?'

মন্ত্রী একেবারে বোবা! সেনাপতির দুই চক্ষু বিস্ফারিত!

চন্দ্র সিংহ শয়নগৃহের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হতে হতে বললেন, 'আসুন আপনারা। আমি যাই এখন সুন্দর সিংহের সঙ্গে দেখা করতে। আপনারাও স্বস্থানে ফিরে যান। কিন্তু সাবধান, এখনও আপনাদের পালাবার সময় হয়নি!'

সকলে বসবার ঘরে এসে দাঁড়ালেন।

মন্ত্রী উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, 'কিন্তু মহারাজ, আমাদের মহারানি কোথায় গেলেন? তাঁর খোঁজ করবে কে?'

চন্দ্র সিংহ পূর্ণস্বরে বললেন, 'তাঁর খোঁজ করব আমি নিজে! আমার মান-মর্যাদা, জয়গড়ের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এখন সুমিত্রাদেবীর উপরেই! আমার প্রতিজ্ঞা, তিনি প্রতাপপুরে পৌঁছবার আগেই আমি তাঁকে আবার খুঁজে বার করব! এখনই চারিদিকের পথ-ঘাট আগলাবার জন্যে জয়গড়ের সমস্ত শক্তি নিযুক্ত হবে, আপনাদের কোনো চিন্তা নেই!' তারপর একটু থেমে, স্বর নামিয়ে ধীরে ধীরে আবার বললেন, 'আর একটা কথা শুনে রাখুন। সুমিত্রাদেবীকে আমি চিনতে পারিনি। তিনি অতুলনীয়া, তিনি আমার জীবনের মূর্তিমান বিস্ময়-প্রতিমা! তাঁর উপরে আমার আর কোনো দাবি নেই। স্বীকার করছি, আমি পরাজিত!' বলেই তিনি দ্রুতপদে প্রস্থান করলেন।

মন্ত্রী ঘাড় নাড়তে লাগলেন। হতভম্ব হলেই এইভাবে ঘাড় নাড়া তাঁর স্বভাব।

সেনাপতি খুব জোরে ঘন ঘন গোঁফে চাড়া দিতে লাগলেন। অভিভূত হলেই তিনি সজোরে গোঁফে চাড়া না দিয়ে থাকতে পারেন না।

মন্ত্রী হতাশভাবে বললেন, 'রাজাকে কিচ্ছু বোঝা যায় না।...সূরযমল, তুমি কিছু বুঝলে কি?'

সেনাপতি বললেন, 'উঁহুঁ! মানুষকে আমি বোঝবার চেষ্টা করি না। কারণ কোনো মানুষকেই বোঝা যায় না।'

চন্দ্র সিংহ নীচের বৈঠকখানায় প্রবেশ করে দেখলেন, সুন্দর সিংহ অত্যন্ত অধীরের মতো ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

প্রথমে অভিবাদনের পালা শেষ হল।

তারপর সুন্দর সিংহ ক্ষুব্ধ স্বরে বললেন, 'রাজাসাহেব, আমি এখানে একযুগ ধরে একলা বসে আছি!'

চন্দ্র সিংহ দুই ভুরু তুলে বললেন, 'ক্ষমা করবেন কুমারসাহেব, ক্ষমা করবেন! বিশেষ কারণে আমার আসতে একটু দেরি হয়েছে! আমার লোকজনরা দেখছি অত্যন্ত অসভ্য হয়ে উঠেছে! আপনাকে এখানে একলা বসিয়ে রেখে গিয়েছে, তিন-চারটে 'পেগ' পর্যন্ত দিয়ে যায়নি? কী অন্যায়, কী অন্যায়! কী আনাব কুমার সাহেব? ব্রান্ডি, না হুইস্কি?'

সুন্দর সিংহ মুখ রক্তবর্ণ করে বললেন, 'না, ধন্যবাদ! সকালে আমি ও-সব খাই না।'

—'খান না? এ কু-অভ্যাস আপনার কবে থেকে হল? আমি তো জানতুম, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নেও আপনার 'পেগ' খাওয়ার অভ্যাস আছে!'

—'রাজাসাহেব, আপনার মুখরতা সুবিখ্যাত, সে জন্যে প্রতিবাদ করতে চাই না। কিন্তু দয়া করে মনে রাখবেন, আপনার বাক্যবাণে আহত হবার জন্যে আজ আমি এখানে আসিনি। আমি এসেছি প্রতাপপুরের মহারানির সঙ্গে দেখা করতে।'

ওদিকে চন্দ্র সিংহ যেন কিছুই শুনতে পাননি, এইভাবেই সমানে বলে চলেছেন, 'শুনেছি, সুরাদেবী নাকি মায়াময়ী! তাঁর মহিমায় মানুষদের চরিত্র নাকি আশ্চর্য সব ডিগবাজি খায়! ভীরু হয় সাহসী, বুদ্ধিমান হয় বোকা, সাধু হয় পাপী, পণ্ডিত হয় মূর্খ, রুগ্ন হয় বলী, দুঃখী হয় সুখী। এ সব কথা কি সত্য কুমারসাহেব?'

সুন্দর সিংহ ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, 'সুরার গুণাগুণের কথা জানতে চান তো শুঁড়ির কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন। আমি প্রতাপপুরের মহারানির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছি।'

—'ওঃ, তাই বলুন! কিন্তু মহারানির সঙ্গে তো আপনার দেখা হবে না!'

দুই ভুরু কুচকে সুন্দর সিংহ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন?'

—'তিনি কাল রাতে এখান থেকে বেরিয়ে বেড়াতে গিয়েছেন, আর বোধহয় ফিরবেন না।'

—'কোথায় গিয়েছেন? রাজনগরে?'

—'কোথায় গিয়েছেন জানি না, তবে রাজনগরে নিশ্চয়ই নয়!'

সুন্দর সিংহ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। চন্দ্র সিংহ সিগারেট কেস বার করে

তাঁর দিকে এগিয়ে দিলেন, তিনি গ্রহণ করলেন না। চন্দ্র সিংহ নিজেই একটি সিগারেট নিয়ে ধরিয়ে ফেললেন।

অবশেষে সুন্দর সিংহ বললেন, 'রাজাসাহেব, আমার বিশ্বাস আমি যাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই, তিনি এখানেই আছেন।'

—'তাই নাকি কুমারসাহেব, তাই নাকি? আচ্ছা, তাহলে দেখা যাক, আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় কি না!' চন্দ্র সিংহ ঘরের একদিকে অগ্রসর হয়ে একটা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর পর্দা তুলে বললেন, 'আসুন দেবী! কুমারসাহেব আপনাকে স্মরণ করেছেন।'

ঘরের ভিতর থেকে বাধো বাধো পায়ে জড়োসড়ো হয়ে বেরিয়ে এল একটি অবগুণ্ঠনবতী নারী মূর্তি।

সুন্দর সিংহ সাগ্রহে এগিয়ে আসছিলেন, কিন্তু হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সবিস্ময়ে বললেন, 'ইনি কে রাজাসাহেব? ইনি তো মহারানি নন!'

চন্দ্র সিংহ হো হো করে হেসে উঠলেন। তারপর অর্ধদগ্ধ সিগারেটটা একটা ভস্মাধারে নিক্ষেপ করে বললেন, 'না কুমারসাহেব, ইনি প্রতাপপুরের মহারানি নন। আপনি যাঁকে গোপনে বিবাহ করে আবার ত্যাগ করেছেন, এই অভাগিনি হচ্ছে সেই যমুনা বাই। এঁকে এখানে দেখে অবাক হবেন না, কারণ কাল রাতে আমিই এঁকে এখানে আমন্ত্রণ করে আনিয়েছি। কেন জানেন? মহারানি সুমিত্রাদেবী এঁর অস্তিত্বের কথা বিশ্বাস করতে রাজি নন, তাই তাঁর সঙ্গে এঁর পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছিলুম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমার সে চেষ্টা আর সফল হবার নয়, কারণ সুমিত্রাদেবী এখানে নেই।'

সুন্দর সিংহ বিষম রাগে নির্বাক হয়ে একবার যমুনার দিকে, আর একবার চন্দ্র সিংহের দিকে তাকাতে লাগলেন। ইতিমধ্যে পাশের ঘর থেকে তিনটি বালক ও দুটি বালিকাও সানন্দে 'বাবা, বাবা!' বলে ডাকতে ডাকতে তাঁর কাছে ছুটে এল—কেউ তাঁর পা জড়িয়ে ধরলে, কেউ তাঁর কোলে উঠবার চেষ্টা করতে লাগল!

দৃশ্যটা হাস্যমুখে উপভোগ করতে করতে চন্দ্র সিংহ বললেন, 'এই পুনর্মিলনের বিমল আনন্দের মধ্যিখানে আমি আর চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি কেন? কুমারসাহেব, আপনি একমনে সংসারধর্ম পালন করতে থাকুন—আমি এখন সুড়সুড় করে সরে পড়ি! আমার হাতে অনেক কাজ। নমস্কার!'

॥ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ॥

কটাহ থেকে অগ্নিকুণ্ডে

যাঁরা এই গল্প পড়ছেন তাঁদের মধ্যে কেউ কি কখনো দড়ির সিঁড়ি বয়ে নীচে নামবার চেষ্টা করেছেন? চেষ্টা করলে দেখবেন, নামে সিঁড়ি বটে, কিন্তু তাকে ধরে নামা কত কঠিন, কত ভয়াবহ!

দড়ির সিঁড়ি অবলম্বন করে সে-রাত্রের সেই অবতরণের কথাটা সুমিত্রার স্মৃতিতে চিরদিনই জেগে থাকবে ভীষণ এক দুঃস্বপ্নের মতো। এ সিঁড়ি যে কী চিজ আগে তা জানা থাকলে কখনোই সে তাকে অবলম্বন করতে পারত না।

এক ধাপ থেকে আর এক ধাপে পা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয়, এই বুঝি জীবনের শেষমুহূর্ত! বরফে ভেজা দমকা ঝোড়ো হাওয়া এসে ধাক্কা মারে, অন্ধকার রাত্রে দুই চক্ষুই অন্ধ, প্রতি পদেই সিঁড়ি দুলে দুলে ঝাঁকানি মেরে ফেলে দেবার চেষ্টা করে,—বারংবার শিউরে শিউরে সুমিত্রার প্রাণ প্রায় মূর্ছিত হয়ে পড়ল! অসাধারণ তার মনের জোর, তাই শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে ভেঙে পড়ল না সে।

এত বড়ো বিপদেও আর একটা মস্ত দুশ্চিন্তা প্রতি পলকে তাকে পীড়া দিতে লাগল। নীচের ঘন অন্ধকারে তার অপেক্ষায় যে দাঁড়িয়ে আছে, সে কীরকম মানুষ? প্রতাপপুরের মানমর্যাদা সে কি এক অজানা পথের ভিখারির হাতে সমর্পণ করতে উদ্যত হয়নি? টাকার লোভে হয়তো ওই অপরিচিত ভালো ব্যবহারই করবে, কিন্তু না করতেও পারে তো? তখন কী হবে? নিশুতি কালো রাতে, অতি নির্জন বন-পাহাড়ের মধ্যে কেমন করে সে আত্মরক্ষা করবে?

অবশেষে! হ্যাঁ, অবশেষে—যেন কত ঘণ্টা ধরে দারুণ দুর্বিসহ নরকযন্ত্রণা ভোগবার পরে পায়ের তলায় সে অনুভব করলে মা পৃথিবীর ঠান্ডা বুক। — সঙ্গে সঙ্গে একটা কাতর দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুমিত্রা সেইখানেই বসে পড়ল একেবারে বিবশ হয়ে।

অন্ধকারের ভিতর থেকে একটা কালো ছায়া এগিয়ে এল। নীরস নির্মম স্বরে বললে, 'উঠুন রানিজি! এখন হাঁপ ছাড়বার সময় নেই। শান্ত্রীরা পাহারা দিতে ক্রমাগত আনাগোনা করছে—ওই তাদের পায়ের শব্দ!' লোকটা তার হাত ধরে জোরে টানলে!

তাকে উঠতেই হল—যদিও তার হাত ধরে এই টানাটানিটা সে মোটেই পছন্দ করলে না। লোকটার সঙ্গে সঙ্গে সে একরকম দৌড়েই প্রাসাদের সীমানা ছাড়িয়ে উপত্যকার ভিতরে গিয়ে পড়ল।

লোকটা যেন আপন মনেই বললে, 'এই শীতে, সন্ধেবেলায় আবার বৃষ্টি পড়েছে! মাটিতে নিশ্চয় আমাদের পায়ের ছাপ উঠছে—কিন্তু উপায় নেই!'

সুমিত্রা বললেন, 'আপনাকে ধন্যবাদ!'

লোকটা নিম্ন অথচ ক্রুদ্ধ স্বরে বললে, 'চুপ! অত চেঁচিয়ে কথা কইবেন না।'

লোকটা তখনও তার হাত চেপে ধরেই দ্রুতপদে অগ্রসর হচ্ছিল। সুমিত্রা নিজের হাতটা টেনে নিতে গেলেন। মুষ্টি আরও দৃঢ় করে অপরিচিত বললে, 'হাত ছাড়াবার চেষ্টা করবেন না। দুর্গম অন্ধকার পথ, হারিয়ে যাবেন—পড়ে যেতেও পারেন।'

উপত্যকার পর বন। রাত্রির কালিমা সেখানে আরও ঘন। এক হাত পরে চোখ অচল। কিন্তু লোকটা সুমিত্রাকে নিয়ে দৃঢ়পদে বেশ নিশ্চিত ভাবেই এগিয়ে যেতে লাগল—যেন সেখানকার পথঘাট তার নখদর্পণে!

সুমিত্রা বললেন, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

অপরিচিত বললে, 'আপাতত আমরা বনের ভেতরেই থাকব। সকাল হলে বন থেকে বেরিয়ে পথ ধরবার চেষ্টা করব।'

—'এখন রাত ক-টা হবে?'

—'বোধহয় একটা-দেড়টা। সকাল হতে অনেক দেরি। কিন্তু ভোর হবার আগেই আমরা অনেক দূরে গিয়ে পড়তে পারব।'

কোত্থেকে যে তাঁর এত পথ হাঁটবার শক্তি হল, সুমিত্রা নিজেই সেটা বুঝতে পারলেন না। কিন্তু বনের পর বন পেরিয়ে সমান তিনি এগিয়ে চললেন। ঘোর-কালো বনের কোনো বিভীষিকাই আজ তাঁকে বাধা দিতে পারলে না।

হঠাৎ দূরে গর্জন শোনা গেল।

অপরিচিত বললে, 'বাঘের ডাক। এ বনে অনেক বাঘ আছে।'

সুমিত্রার বুকটা কেঁপে উঠল, কিন্তু তিনি মুখে কিছু বললেন না।

ঘণ্টা তিনেক চলবার পর অপরিচিত বললে, 'আমরা অনেক দূরে এসে পড়েছি। এইবার এই গাছতলায় বসে আপনি বিশ্রাম করে নিন। ঘণ্টা-খানেক পরেই সকাল হবে।'

আকাশের অন্ধকার তখনই পাতলা হয়ে এসেছিল। বনের দৃশ্য দেখাচ্ছিল অস্পষ্ট ছায়াছবির মতো।

সুমিত্রা বসে পড়ে শীতে কাঁপতে লাগলেন।

অপরিচিতও তার সামনে এসে বসল। কিন্তু সে কথা কইবার চেষ্টা করলে না দেখে সুমিত্রা কতকটা আশ্বস্ত হলেন। এখনও পর্যন্ত এর ব্যবহার সন্দেহজনক নয়। কেবল মাঝে মাঝে হুকুম দেওয়ার গলায় কথা কয়। এইটেই ভালো লাগে না। মহারানির সঙ্গে কেমন করে কথা কইতে হয়, লোকটা তা জানে না।

প্রথম প্রভাতের নরম আলো বনভূমির উপরে এসে পড়ল মধুর আশীর্বাদের মতো। শিশিরে ভেজা ডাল-পাতা থেকে মুক্তার মতো ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছে। পাখিদের কণ্ঠে জাগছে আসন্ন সূর্যোদয়ের স্তব। চারিদিক যেন দৃশ্যমান সংগীত।

সুমিত্রা অপরিচিতকে ভালো করে দেখতে লাগল।

এটা বেশ বোঝা যায়, অপরিচিত চাষাভুষোর মতো নিম্নশ্রেণির লোক নয়—যদিও তার সাজগোছ ছন্নছাড়ার মতো। বোধহয় তার মতো সে-ও ছদ্মবেশ পরেছে। যারা খেটে খায় তাদের হাতের আঙুলে ও চেটোয় থাকে পরিশ্রমের চিহ্ন। এর হাতের চামড়া মসৃণ।

অপরিচিতের ভাবভঙ্গি দেখলে সন্দেহ হয়, যেন সে মনে মনে কী ভাবছে! সে একবারও চোখ তুলে সুমিত্রার দিকে তাকালে না। তার দৃষ্টি মাটির দিকে।

সুমিত্রা শুধোলেন, 'আপনি কি জয়গড়েই থাকেন?'

—'আমার বাড়ি রাজনগরে।'

সুমিত্রা চমকে উঠলেন। অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বললেন, 'আশ্চর্য! এখানে কী জন্যে এসেছেন?'

—'আপনার জন্যে।'

—'আমার জন্যে?'

—'হ্যাঁ। প্রতাপপুরের মহারানি যে জয়গড়ে বেড়াতে আসবেন, এ খবর আমি আগেই পেয়েছিলুম।'

—'আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।'

—'এখন বোঝবার দরকার নেই।'

—'আপনি যুবরাজ সুন্দর সিংহকে চেনেন?'

উত্তরে সে কঠোর স্বরে অট্টাহাস্য করে উঠল! সে হাসি শুনলে প্রাণ কাঁপে।

অপরিচিত এতক্ষণ পরে একবার সুমিত্রার দিকে ফিরে তাকালে—ক্ষণিকের জন্যে। তার দৃষ্টি উদ্ভ্রান্তের মতো। তীব্র, নির্দয়!

সুমিত্রার বুক দুপ দুপ করতে লাগল। কোনো সহজ মানুষের চোখে সে এ-রকম দৃষ্টি দেখেনি।

লোকটা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'এখানে বাঘের পায়ের দাগ রয়েছে। চলুন, আর বিশ্রাম নয়।'

তারা আবার অগ্রসর হতে লাগল। আগে আগে লোকটা, পিছনে পিছনে সুমিত্রা।

খানিকক্ষণ পরে সুমিত্রা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রতাপপুর কোন দিকে?'

—'উত্তর দিকে।'

—'কিন্তু আমরা দক্ষিণ দিকে যাচ্ছি কেন?'

—'একটু ঘুরে না গেলে ধরা পড়বার সম্ভাবনা আছে।'

আধঘণ্টা পরে তারা দুটো পাহাড়ের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। নীচেকার জমিও পাথুরে, একগাছা ঘাস নেই। এখানেও দুই পাহাড়ের মাঝখানে একটা সংকীর্ণ উপত্যকার ঢালু গা। তারা আবার উপরদিকে উঠতে লাগল।

সন্দিগ্ধস্বরে সুমিত্রা বললেন, 'এ আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

—এতক্ষণে আপনাকে খোঁজবার জন্যে বনে বনে সেপাই বেরিয়েছে। তাদের চোখে ধুলো দেবার জন্যে আমাদের কিছুক্ষণ একটা গুপ্তস্থানে লুকিয়ে থাকতে হবে।'

—'এখানে পাথরের গায়ে জলের দাগ কেন?'

—'বর্ষাকালে এই উপত্যকাটা হয় প্রপাতের মতো। তখন এখান দিয়ে হাঁটবার উপায় থাকে না।'

—'ঝরনার শব্দ শুনছি না?'

—'হ্যাঁ। এই হচ্ছে উপত্যকার প্রান্ত। আমাদের মাথার উপরে এই যে সমতল পাহাড়টা রয়েছে, ওইখান দিয়ে ঝরনা বয়ে যাচ্ছে। বর্ষাকালে ওই ঝরনাটাই পাহাড় উপছে এই উপত্যকাটা ভাসিয়ে দেয়।'

—'আপনি রাজনগরের লোক হয়ে এখানকার এত খবর জানলেন কেমন করে?'

সে কথার জবাব না দিয়ে লোকটা বললে, 'পাহাড়ের গায়ে এই গুহাটা দেখছেন?'

সুমিত্রা হেঁট হয়ে দেখলেন, একটা কূপের মতো গুহা। অন্ধকার। উপরে পাহাড়ের ছাদ।

—'বর্ষার উপত্যকার সঙ্গে এই গুহাটাও জলে ভরে যায়। এখন এর ভেতরটা শুকনো। এর ছাদের উপরেই ঝরনা। খুব পাতলা পাথরের ছাদ, অনায়াসেই ফুটো করে দেওয়া যায়। ফুটো করে দিলেই এই গুহাটা জলে ভরে যাবে।'

—'আমাদের এখানে আসার উদ্দেশ্য কী?'

—'উদ্দেশ্য? হা হা হা হা হা হা!' লোকটা হাসতে হাসতে বন্য চোখে সুমিত্রার দিকে তাকালে।

সুমিত্রা ভয়ে ভয়ে পিছোতে পিছোতে বললেন, 'আপনি হাসছেন কেন?'

লোকটা জ্বলন্ত চোখে এগুতে এগুতে বললে, 'পিছিয়ে যাচ্ছ কোথায়? তোমায় যে এখন ওই গুহার ভেতরে নামতে হবে।'

—'না, না! আমি ওখানে নামতে পারব না!'

—'নামবে না কী, নামতেই হবে!' সে লাফ মেরে দুই বজ্রমুষ্টিতে সুমিত্রার দুখানা হাতই চেপে ধরলে!

তার গায়ে অসুরের মতো জোর! সুমিত্রা টানাটানি করেও হাত ছাড়াতে পারলেন না। তিনি প্রাণপণে চিৎকারের পর চিৎকার করতে লাগলেন।

—'নামো ওই গুহার ভেতরে!' সে এক হ্যাঁচকা মেরে সুমিত্রাকে গুহার ভিতরে ঝুলিয়ে হাত ছেড়ে দিলে। সুমিত্রা ধুপ করে পাথরের কঠিন গায়ের উপরে গিয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে লোকটাও নীচে লাফিয়ে পড়ল। তারপর গুহাতল থেকে একগাছা মোটা লম্বা দড়ি তুলে নিয়ে সে সুমিত্রার হাত-পা বেঁধে ফেললে। সুমিত্রা অনেক বাধা দিলেন, কোনোই ফল হল না।

লোকটা ভীষণ ভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে খানিকক্ষণ সুমিত্রাকে দেখলে, নীরবে। তারপরে কর্কশ স্বরে বললে, 'সুন্দর সিংহ কে জানো? আমার ভগ্নীপতি!'

গুহার আবছা আলোয় সুমিত্রা বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে লোকটার মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন।

—'হ্যাঁ, সুন্দর সিংহ আমার বোন যমুনাকে বিবাহ করে আবার ত্যাগ করেছে। সে আমার বোনকে ত্যাগ করেছে তোমার জন্যেই। যমুনাকে সে তাড়িয়ে দিয়েছে—পাঁচটি ছেলেমেয়ে নিয়ে আমার বোন এখন পথে বসেছে, আর আসলে এর জন্যে দায়ী হচ্ছ তুমিই। তাই আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, এ পৃথিবী থেকে তোমাকে

সরিয়ে দেব। রাজনগরে যাবার পথেই আমি তোমাকে হত্যা করতুম, কিন্তু সুযোগ পাইনি।'

তার চোখ-মুখ দেখেই সুমিত্রা বেশ বুঝলেন, তিনি পাগলের পাল্লায় পড়েছেন।

—'আমার দিকে তুমি অমন করে তাকিয়ে আছ কেন? ভাবছ আমি পাগল? হ্যাঁ, লোকে বলে বটে যে, মাঝে মাঝে আমার মাথায় নাকি পাগলামি চাপে! কিন্তু লোকের কথায় আমি বিশ্বাস করি না! আমি পাগল নই। পাগল হলে এত মাথা খাটিয়ে তোমায় আমি ধরতে পারতুম না।'

সুমিত্রা নিরুত্তর হয়ে রইলেন—তাঁর কথা বলবারও শক্তি ছিল না।

লোকটা খানিকক্ষণ নীরবে গুহার ছাদের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে রইল। তারপর বললে, 'এখন তোমার কী ব্যবস্থা করেছি, শুনবে?' বলেই হা হা করে হেসে উঠল। সুমিত্রার মুখের খুব কাছে নিজের মুখ এনে বললে, 'একটু আগেই বলছিলুম না, এই গুহার ছাদটা খুব পাতলা, আর উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ঝরনার জল? ওই ছাদটা ফুটো করবার সব তোড়জোড় আমি করে রেখেছি! তারপর কী হবে জানো? ঝরনার জল ঝরতে থাকবে এই গুহার ভেতরে! আমি খুব ছোট্ট একটা ফুটো করে দেব, যাতে আস্তে আস্তে জল ঝরে! তখন ধীরে ধীরে এই গুহাকূপ পূর্ণ হয়ে উঠবে! হয়তো গুহার ভেতরে ডুবে মরবার মতো জল আজ এখনই আসবে না। হয়তো তিলে তিলে মরবার জন্যে তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত! তারপর? সুন্দর সিংহের স্বপ্ন দেখতে দেখতে তোমার শেষ-নিশ্বাস মিলিয়ে যাবে কালো জলের তলায়—দুনিয়ায় তোমার মাংসহীন কঙ্কাল পর্যন্ত আর কেউ দেখতে পাবে না! প্রতিহিংসার এমন চমৎকার ফন্দি যে বার করতে পারে, তাকে কি তোমার পাগল বলে মনে হয়? হা হা হা হা! প্রতাপপুরের মহারানির সলিল সমাধি! কী মেলো-ড্রামাটিক পরিণাম!'

এই নিষ্ঠুর উন্মত্তের কাছে দয়া প্রার্থনা করে বা যুক্তি দেখিয়ে কোনোই লাভ নেই। সুমিত্রা চুপ করে শুনতে লাগলেন।

—'বিদায় মহারানি, বিদায়! এই বিজন স্থানে চিৎকার করা বৃথা! এখানে শ্রোতা হতে পারে কেবল বনের বাঘ! চিৎকার শুনে বাঘ যদি আসে, তাহলে তোমার মৃত্যু হবে আরও ভয়ানক, বুঝলে?—হা হা হা হা!' লোকটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠল এবং পরমুহূর্তেই গুহার পাঁচিলের উপর দিকটা ধরে লাফ মেরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুমিত্রার মনের ভিতরটা স্তম্ভিত হয়ে আছে, ভয় পাবার বা চিন্তা করার অবস্থাও তাঁর নেই। গুহামুখ দিয়ে প্রবেশ করেছে একটা সূর্যরশ্মিরেখা, সুমিত্রা শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তার দিকে।

খানিকক্ষণ পরে গুহার ছাদের উপরে শব্দ জাগল ঠক ঠক ঠক!

সুমিত্রা সে শব্দের কারণ বোঝবারও চেষ্টা করলেন না।

ঠক ঠক ঠক, ঠক ঠক ঠক, ঠক ঠক ঠক! মিনিট পনেরো ধরে সে শব্দ শোনা যেতে লাগল।

আচম্বিতে সুমিত্রার গায়ের উপরে এসে পড়ল কনকনে জলের একটি অতি শীর্ণ ধারা!

॥ চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ॥

সুন্দর সিংহ

সুন্দর সিংহকে সংসারধর্ম পালন করবার জন্যে উপদেশ দিয়ে চন্দ্র সিংহ তো সরে পড়লেন, তারপর কী হল এখনও দেখা হয়নি।

ছেলেমেয়েদের আদর ভরা সম্বোধন শুনেও সুন্দর সিংহ তাদের কারুর দিকে ফিরে তাকালেন না। বিষম ক্রোধ ও প্রবল উত্তেজনায় সুন্দর সিংহের সুন্দর মুখকে তখন মোটেই সুন্দর দেখাচ্ছিল না।

তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে যমুনাও মৌনমুখ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সব-ছোটো মেয়েটা তখনও সুন্দর সিংহের হাঁটু ছাড়েনি। ঊর্ধ্বমুখে আবদারের স্বরে বললে, 'বাবা, কোলে!'

জোরে পা নেড়ে সুন্দর সিংহ মেয়ের আলিঙ্গন থেকে বিপদগ্রস্ত হাঁটুটাকে মুক্ত করে নিলেন। ঝাঁকানি সইতে না পেরে শিশু দড়াম করে মেঝের উপরে আছাড় খেয়ে তারস্বরে আর্তনাদ করে উঠল।

যমুনা তাড়াতাড়ি তাকে কোলে তুলে নিয়ে তার বাক্‌যন্ত্রকে আবার স্তব্ধ করবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু চিৎকার থামল না, আরও বেড়ে উঠল। বাপের মেজাজ দেখে বাকি ছেলেমেয়েগুলো নিরাপদ ব্যবধানে সরে দাঁড়াল।

সুন্দর সিংহ যমুনার দিকে চেয়ে দুই চোখে আর একবার অগ্নিবৃষ্টি করে দরজার দিকে অগ্রসর হলেন।

যমুনা বললে, 'দাঁড়ান যুবরাজ, যাবেন না।'

কিন্তু সুন্দর সিংহ ফিরলেন না।

—'দাঁড়ান যুবরাজ, দয়া করে একবার দাঁড়ান। নইলে আমিও আপনার সঙ্গে সঙ্গে যেতে বাধ্য হব।'

সুন্দর সিংহের গতিরোধ হল। ক্রুদ্ধ স্বরে তিনি বললেন, 'আমার সঙ্গে আসবে মানে?'

—'আপনি আমার স্বামী। আপনার সঙ্গে যাব না তো কার সঙ্গে যাব?'

—'কী স্বামী-ভক্তি! কিন্তু পতিব্রতা, তুমি কি আমার সঙ্গেই এখানে এসেছ?'

—'আপনার সঙ্গে আসিনি বটে, কিন্তু আপনার জন্যেই আমি এখানে এসেছি।'

—'আমার জন্যে, না চন্দ্র সিংহের জন্যে?'

এ টিটকারি শুনে যমুনার মুখে ফুটল ম্লান হাসি। সহজ স্বরেই সে বললে, 'যুবরাজ, আমার মন এখন পাথর। আপনি আঘাত করলেও আমি আহত হব না। রাজা চন্দ্র সিংহ লোক পাঠিয়ে আমাকে জানিয়েছিলেন, 'আপনার স্বামীকে যদি আবার ফিরে পেতে চান, তাহলে অবিলম্বে জয়গড়ে চলে আসুন।'

ব্যঙ্গের স্বরে সুন্দর সিংহ বললেন, 'আর তুমি অমনি সুড় সুড় করে জয়গড়ে এসে হাজির হলে! একবারও ভেবে দেখলে না যে, চন্দ্র সিংহের জামার বুক পকেটের ভিতরে তোমার স্বামী বাস করে না!'

—'হতে পারে আমার ভুল হয়েছে। কিন্তু এ-রকম ভুল হওয়া স্বাভাবিক।'

—'স্বাভাবিক!'

—'হ্যাঁ। স্বামী হারালে নারীর মাথার ঠিক থাকে না।'

—'তারপর?'

—'তারপর আজ পাশের ঘর থেকে আপনাদের কথাবার্তা শুনে বুঝেছি, আমাকে কোন কারণে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে! আপনি মিছরি পেয়ে মুড়িকে ত্যাগ করেছিলেন। রাজা চন্দ্র সিংহ চেয়েছিলেন আমাকে আনিয়ে সেই মিছরিকে বিষাক্ত করে তুলতে। ফলে কী দাঁড়াত বুঝেছেন?'

—'তুমিই বুঝিয়ে দাও।'

—'প্রতাপপুরী মিছরি বিষাক্ত হলে আর আপনার ভোগে আসত না। তাহলে রাজনগরের মুড়ির দিকে হয়তো আবার যুবরাজের নজর পড়লেও পড়তে পারত।'

—'বেশ, তবে তুমি সেই আশার স্বপন দ্যাখো, আমি চললুম।'

—'এই কি আপনার শেষ কথা?'

—'শেষ কথা নয়, সর্বশেষ কথা। যে নারী পরপুরুষের আশ্রয় নেয়, তাকে আমি ধর্মত ত্যাগ করতে বাধ্য।'

বড়ো দুঃখেও যমুনা আবার হেসে উঠল। বললে, 'যুবরাজ, আমাকে ত্যাগ করবার জন্যে আবার নতুন কোনো ওজর আবিষ্কারের চেষ্টা করবেন না। আপনি আমাকে ত্যাগ করবার পরেই আমি এখানে এসেছি।'

—'না, এর আগে তোমাকে আমি ত্যাগ করিনি। আমার দেখা না পেলেও তুমি মাসোহারা পেতে।'

—'যুবরাজ, নারী কি পুরুষকে বিবাহ করে মাসোহারা পাওয়ার জন্যে?'

—'নারী কেন বিবাহ করে তা নিয়ে আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করতে প্রস্তুত নই। কিন্তু এইটুকু জেনে রাখো, আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক রইল না। এমনকি, আর মাসোহারার আশাও কোরো না।'

—'ধন্যবাদ যুবরাজ, ধন্যবাদ! আজ দু-মাস আপনি অদৃশ্য হয়েছেন। এর মধ্যে আপনার কাছ থেকে কোনো মাসোহারাও পাইনি, সে আশাও আমি রাখি না। কিন্তু এই ছেয়েমেয়েগুলো কী হবে? এদের দেহে আছে রাজনগরের রাজরক্ত, সেটাও কি আপনি ভুলে যাবেন?'

তাচ্ছিল্য ভরে সুন্দর সিংহ বললেন, 'ভয় কী, জয়গড়ের রাজা হয়েছেন ওদের অভিভাবক!'

যমুনা তিক্ত হাসি হেসে বললে, 'অপূর্ব পিতৃস্নেহ যুবরাজ, বিচিত্র মনুষ্যত্ব! আমি কোনো প্রতিবাদ করব না—আপনি আমাকে জানেন, কোনো কারণেই কখনো প্রতিবাদ করা আমার স্বভাব না! আপনি আমাকে বিবাহ করেছেন—আপনি আমাকে ত্যাগ করেছেন, এই নিষ্ঠুর সত্যটাই আমার কাছে বড়ো হয়ে থাক, আর আমার কোনো অভিযোগ নেই। ত্রেতায় শ্রীরামচন্দ্র নির্দোষ সীতাকে গর্ভবতী জেনেও বনবাসে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সেই গহন বনেও যখন লব-কুশের ক্ষুধার অন্ন জুটেছিল, তখন আমার ছেলেমেয়েরাও হয়তো অন্নাভাবে মারা পড়বে না। যুবরাজ, আপনার মঙ্গল হোক'—বলতে বলতে তার হাসিমাখা মুখের উপর দিয়ে ঝরতে লাগল ঝর ঝর করে চোখের জল!

—'যমুনা, তোমার এ কাঁদুনি আমার ভালো লাগছে না!'

—'আমি কাঁদছি না যুবরাজ, আমি হাসছি! নারীর চোখ হচ্ছে নির্বোধ—তার মুখ যখন হাসে, তার চোখ তখন করে অশ্রুবৃষ্টি! এ অশ্রুর কোনো মূল্য নেই, আপনি নিশ্চিন্ত হোন।'

—'বেশ, তোমার ছেলেমেয়েদের জন্যে না হয় কিছু কিছু মাসোহারার ব্যবস্থা করা যাবে।'

—'প্রভু, আর দয়া দেখিয়ে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে না দিলেও চলবে। আবার মাসোহারার কথা উঠলে হয়তো আমি আর সহ্য করতে পারব না!'

—'বেশ, আমি তবে চললুম।'

—'না, আর একটা কথা শুনে যান। আমার ভাই আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

—'চন্দন সিং? তার সঙ্গে আমার আবার সম্পর্ক কী?'

—'সম্পর্ক যে নেই, সেটা বলবার দরকার করে না। কিন্তু আপনি জানেন তো, চন্দন মাঝে মাঝে পাগল হয়ে যায়?'

—'হুঁ।'

—'চন্দনের মাথায় আবার পাগলামি চেপেছে। আজ ক-দিন হল তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

—'তা আমাকে এ খবর দেবার কারণ কী? আমি কি তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করব?'

—'আপনাকে অতটা বদান্য হতে বলি না। কিন্তু একটু সাবধানে থাকবেন।'

—'চন্দনের মাথায় পাগলামি চেপেছে বলে আমাকে সাবধান হতে হবে!'

—'হ্যাঁ যুবরাজ। যাবার সময়ে সে বলে গেছে, রাজনগরের যুবরাজ আর প্রতাপপুরের মহারানিকে খুন না করে সে বাড়ি ফিরবে না!'

সুন্দর সিংহ হো হো করে হেসে উঠে বললেন, 'রাজনগরের যুবরাজ আর প্রতাপপুরের মহারানি পথের খোলামকুচি নয় যে, পাগল বা ছাগল তাদের পায়ে মাড়িয়ে যাবে!'

—'জানি যুবরাজ, জানি। তবু সাবধান করে দিলুম, পাগলে কী না করতে পারে?'

—'পাগলাকে নিয়ে এখন আমার মাথা ঘামাবার সময় নেই', বলতে বলতে সুন্দর সিংহ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন দ্রুতপদে।

শূন্যদৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে যমুনা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

ছোটো মেয়েটা আবার 'বাবা বাবা' বলে কান্না শুরু করে দিলে! যমুনা তাড়াতাড়ি তাকে বুকের ভিতর চেপে ধরে নিজেও কেঁদে ফেললে।

ওদিকে বাইরে উঠানের উপরে গিয়েই সুন্দর সিংহ দেখলেন, প্রতাপপুরের মন্ত্রী ও সেনাপতি অবাক হয়ে উঠানের ওপাশে দাঁড়িয়ে আছেন।

সুন্দর সিংহ তাড়াতাড়ি এগুতে এগুতে বললেন, 'এই যে মন্ত্রীমশাই! আরে আরে, সূরযমল যে! রাজনগরের কাজ ছেড়ে প্রতাপপুরে এসে বহরে তুমি যে দস্তুরমতো বেড়ে উঠেছ দেখছি!'

সূরযমল বললেন, 'আমি এখন আমার বহরের কথা ভাবছি না যুবরাজ! আমি ভাবছি, ও ঘরে হঠাৎ খোকা না খুকি কাঁদে কেন?'

—'কান্নাই যে খোকাখুকিদের অস্ত্র! কিন্তু ও কথা যাক। বলতে পারো সূরযমল, তোমাদের মহারানির ব্যাপার কী? তোমরা রইলে এখানে, আর তিনি গেলেন চলে!'

সূরযমল উত্তর দেবার জন্যে মুখব্যাদান করবামাত্র মন্ত্রীমশাই তাঁর পিছনে হাত চালিয়ে গা টিপে দিলেন। সূরযমল কিছু না বলে বিরক্ত মুখে মন্ত্রীর কাছ থেকে সরে দাঁড়ালেন।

মন্ত্রী বললেন, 'একটা জরুরি কাজের জন্যে আমাদের এখানেই থেকে যেতে হয়েছে।'

সুন্দর সিংহ বললেন, 'মন্ত্রীমশাই আপনি ভারী বোকার মতো সূরযমলের গা টিপলেন, কারণ আমি দেখতে পেয়েছি। কিন্তু এই টেপাটিপি আর লুকোচুরি অর্থ কী?'

মন্ত্রী অপ্রতিভ ভাবে কাশতে কাশতে নিজের লজ্জা সামলাবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

সূরযমল ডানহাতে গোঁফের এক প্রান্ত টানতে টানতে মনে মনে বললেন, 'মন্ত্রী নিজেকে চালাক শিরোমণি বলে মনে করে। এখন সামলাক ঠেলা! ...উঃ, এত জোরে টিপেছে যে এখনও জ্বলছে!'

সুন্দর সিংহ একটুকু থেমে আবার বললেন, 'আমি বেশ বুঝতে পারছি, ভিতরে কী একটা রহস্য রয়েছে! আমি সেটা জানতে চাই। আমার জানবার দাবি আছে, কারণ দু-দিন পরে প্রতাপপুরের মহারানি হবেন আমারই স্ত্রী!'

মন্ত্রী বললেন, 'যুবরাজ, কোনোই রহস্য নেই! মহারানি আগে গিয়েছেন, আমরা পরে যাব।'

—'মহারানি কি রাজনগরে গিয়েছেন?'

—'পাহাড় ধসে পড়ে রাজনগরে যাবার পথ বন্ধ হয়ে গেছে।'

—'রাজনগরে যাবার অন্য পথও আছে—একটু ঘুরে যেতে হবে, এই যা!'

—'কিন্তু শুনেছেন বোধহয়, মহারানির শরীর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে?'

—'মন্ত্রীমশাই, আপনি এখনও লুকোবার চেষ্টা করছেন। অসুস্থ শরীর নিয়ে মহারানি এখান থেকে বেরুলেন কেন?'

মন্ত্রী এইবারে নাচার হয়ে বললেন, 'যুবরাজ, মহারানির সঙ্গে দেখা হলে এ কথা আপনি তাঁকেই জিজ্ঞাসা করবেন!'

সুন্দর সিংহ ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, 'আমি রাজা চন্দ্র সিংহের সঙ্গে আর একবার দেখা করতে চাই।'

সূরযমল বললেন, 'একটা মস্ত বড়ো হাউন্ড কুকুর নিয়ে রাজা বেরিয়ে গিয়েছেন।'

—'কতক্ষণ?'

—'প্রায় আধঘণ্টা আগে। ...কী বিপদ, মন্ত্রীমশাই! খোকা না খুকিটা এখনও কাঁদছে যে! হঠাৎ এ কান্না এখানে এল কোত্থেকে? কাল তো শুনিনি—পরশুও শুনিনি!'

মন্ত্রী নিরুপায়ের মতো ঘাড় নাড়তে লাগলেন।

সুন্দর সিংহ একবার তীক্ষ্ণ চোখে দুজনের মুখ দেখে নিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, আমি এখন চললুম।' তারপরেই প্রস্থান করলেন।

মন্ত্রী বললেন, 'সূরযমল, বড়োই বিপদ!'

সূরযমল বললেন, 'বলা বাহুল্য।'

॥ পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ॥

গুহা-কূপে

ঝর ঝর ঝর ঝর ঝর ঝর! জল ঝরছে ঝরছে ঝরছেই!

ফুটো পাহাড়ের ছাদ দিয়ে জলের একটি শীর্ণ ধারা গুহাতলের উপরে এসে পড়ছে সশব্দে এবং তারই ছিটে এসে লাগছে সুমিত্রার গায়ে।

কিন্তু সুমিত্রা ভাবছিল না তখন জলের কথা। ভুলে গিয়েছিল নিজের বিপদের কথাও। নিশ্চিত মৃত্যু যে এই জলধারার রূপ নিয়ে গুহার ভিতরে প্রবেশ করছে এটা বোঝবারও চেষ্টা করলে না সে।

তার মস্তিষ্কের মধ্যে জ্বলছে যেন জ্বালাময় অগ্নিশিখা। এ যেন তার রূপকথার রাজকুমারের চিতা—এ যেন তার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার চিতা! পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে তার জীবন-যৌবন, তার বর্তমান আর ভবিষ্যৎ, তার এত সাধে গড়া কল্পনার স্বপ্নসৌধ!

সুন্দর সিংহের সুন্দর মুখও মুখোশ ছাড়া আর কিছুই নয়? মুখোশের তলায় আছে যে কুৎসিত বীভৎসতা, সে আত্মসমর্পণ করতে উদ্যত হয়েছিল তারই কবলে?

রাজা চন্দ্র সিংহ কুচক্রী, অসভ্য, নির্দয় হতে পারেন, কিন্তু তাঁকে আর মিথ্যাবাদী বলা চলে না। যমুনা বাইয়ের অস্তিত্ব আছে!

রাজা তাকেও নিশ্চয় সাধারণ নারী বলেই সন্দেহ করেছিলেন। ভেবেছিলেন, সমস্ত জেনে-শুনেও কেবল রূপের মোহেই আমি বিবাহ করতে চাই সুন্দর সিংহকে। ভেবেছিলেন ছলে বলে কৌশলে এমন সাধারণ নারীর মন ফেরানো বিশেষ অসম্ভব নয়। ভেবেছিলেন রাজবংশে যে-রকম মেয়ে দেখা যায়—সংকীর্ণ মন, নির্বোধ, অর্ধ-জীবন্ত, গতানুগতিকতায় অন্ধ, আমিও হচ্ছি তাদেরই আর একটা দৃষ্টান্ত! সুন্দর সিংহের মতো দুরাত্মাকে যখন আমার পছন্দ হয়েছে, তখন তাঁকেই বা হবে না কেন? অন্যায় যুক্তি নয়।

কিন্তু, যদি রাজা জানতেন! যদি রাজা বুঝতেন যে কী ভাবে প্রবঞ্চিত হয়েছি আমি! বিংশ শতাব্দীর নারী আমি, উপকথার সেকেলে সুয়োরানির ভূমিকায় অভিনয় করব? অসম্ভব, অসম্ভব!

আমি চেয়েছিলুম নির্মল প্রেম, কিন্তু যাচ্ছিলুম হৃদয়হীন লম্পটের ক্ষুধার খোরাক হতে!

রাজা চন্দ্র সিংহও হৃদয়হীন, তিনিও প্রেমের মর্যাদা জানেন না, কিন্তু সুন্দর সিংহের চেয়ে তিনি উচ্চস্তরের মানুষ। তিনি আর যা হোন, কপট নন—নিজের চরিত্র লুকিয়ে আমার কাছে মৌখিক প্রেম নিবেদন করেননি। স্পষ্টই বলেছেন,

তিনি আমার প্রেম চান না—তিনি চান খালি প্রতাপপুরের মহারানিকে বিবাহ করে নিকৃষ্ট জয়গড়কে শ্রেষ্ঠ করে তুলতে। রাজাকে স্বদেশভক্তও বলতে পারি। কেবল বিবাহের জন্যে বিবাহই যদি করতে হয়, তবে সুন্দর সিংহের চেয়ে রাজা চন্দ্র সিংহ হচ্ছেন যোগ্য পাত্র!

দুই চোখ মুদে এমনি বিভিন্ন চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে সুমিত্রা কতক্ষণ যে কাটিয়ে দিলেন, নিজেই তা জানতে পারলেন না!

ওদিকে জল ঝরছে ঝর-ঝর ঝর-ঝর ঝর-ঝর! বদ্ধ গুহাতল দিয়ে গড়িয়ে বরফের মতো কনকনে জল সুমিত্রার গায়ে এসে লাগল—সঙ্গে সঙ্গে ছিঁড়ে গেল তাঁর চিন্তাসূত্র! তিনি শিউরে উঠলেন—এ যে মৃত্যুর ছোঁয়া! ঝরনা নেমেছে গুহার মধ্যে, গুহা হবে কূপের মতো এবং সেই কূপের মধ্যে সলিল সমাধি হবে সুমিত্রার!

উদ্ভ্রান্ত চোখে সুমিত্রা উপরদিকে তাকালেন। খানিকটা সূর্যকর-লেখা গুহার ভিতরে এসে পড়েছিল বটে, কিন্তু এখন সেটুকুও মুছে গিয়েছে। গুহার মুখ আলোকিত, কিন্তু তার আভা নীচে পর্যন্ত নেমে আসেনি। নীচের দিকে তাকিয়ে কিছু দেখা যায় না, কিন্তু বোঝা যায় সেখানে থই থই করছে জল!

তাহলে আজই আমাকে মরতে হবে? মিথ্যা এখন পৃথিবীর দীনতা হীনতা নিষ্ঠুরতার কথা ভাবা, এখন একমাত্র সত্য হচ্ছে মৃত্যুই? জীবন-প্রদীপের চির-নির্বাণ! গুহার বাইরে তপ্ত সূর্যালোকের মহোৎসব, বিহঙ্গদের আনন্দ-সংগীত, উদার আকাশের স্তব্ধ নীল হাস্য, আর গুহার ভিতরে এই সজল অন্ধকারের ভিতর দিয়ে আমাকে প্রবেশ করতে হবে আর এক অজানা চিরান্ধকারের রাজ্যে?

দারুণ আতঙ্কে সুমিত্রা প্রাণপণে চিৎকার করে উঠলেন, 'না, না, আমি মরতে পারব না—আমি এখনই মরতে পারব না!'

গুহার ভিতরে জল বাড়ছে, ধীরে ধীরে! সুমিত্রার দুই পা বাঁধা, দুই হাতও পিছমোড়া করে বাঁধা। এরই মধ্যে তাঁর আপাদমস্তক জলে ভিজে গেছে, আর কিছুক্ষণ পরেই জল উঠবে তাঁর দেহ ছাপিয়ে। এটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর শ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে এল, তিনি তাড়াতাড়ি কোনোরকমে উঠে বসলেন, সরে গিয়ে ঠেস দিলেন গুহার গায়ে।

দুর্দান্ত পাহাড়ে-শীত, সর্বাঙ্গ সিক্ত, তবু সুমিত্রার মুখ ও বুক ঘর্মাক্ত হয়ে উঠল। তিনি দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন, পারলেন না।

উপর থেকে জল ঝরছে, নীচে থেকে জল বাড়ছে, আরও বাড়ছে! সুমিত্রা আড়ষ্ট ও অভিভূত হয়ে বসে রইলেন অনেকক্ষণ। ...জল উঠেছে তাঁর কোমরের কাছে।

সুমিত্রা ভাবতে লাগলেন, আর কতক্ষণ সময় আছে? জল ক্রমে উঠবে আরও উপরে, এর কবল থেকে মুক্তি পাবার কোনো উপায় নেই—আমার বুক ডুবে যাবে, গলা ডুবে যাবে—তারপর! মাথাও ডুবে যাবে! তারপর আসলে শীতল মৃত্যু—চরম যন্ত্রণার ভিতর দিয়ে পরম শান্তি! কিন্তু সে কতক্ষণ—আর কতক্ষণ পরে? এ যে আর সহ্য হয় না—তিলে তিলে এই সাক্ষাৎ মৃত্যুর আস্বাদ! তার চেয়ে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ুক ওই গুহার ছাদ, মাথার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ুক সমস্ত ঝরনা—কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যাক আমার অস্তিত্ব!

সুমিত্রা শ্রান্ত হয়ে আবার চোখ মুদলেন, তাঁর মাথা এলিয়ে পড়ল গুহার দেওয়ালে। আবার অনেকক্ষণ তিনি অর্ধ অচেতনের মতো হয়ে রইলেন।...

হঠাৎ চমকে সভয়ে তিনি সোজা হয়ে বসলেন। জল তাঁর চিবুক স্পর্শ করেছে!

ঝর-ঝর ঝর-ঝর ঝর-ঝর—জলের উপরে জল পড়ার শব্দে সমস্ত গুহা পরিপূর্ণ আর সেই ভয়াবহ শব্দে পরিপূর্ণ সুমিত্রার সমস্ত মন-প্রাণ। একটু নড়লেই কালো গুহাকূপের চার দেওয়ালে ছলাৎ ছলাৎ বেজে ওঠে টলমলে জল—না, যেন কোনো জাগ্রত জীবন্ত ক্ষুধার্ত জলদানবের নিষ্ঠুর কণ্ঠ!

আত্মবিস্মৃত হয়ে শ্রান্ত সুমিত্রা আবার দেওয়ালের উপরে এলিয়ে পড়লেন, তৎক্ষণাৎ তাঁর কপাল পর্যন্ত গেল ডুবে এবং পরমুহূর্তেই তিনি আঁতকে হাঁপিয়ে উঠে সোজা হয়ে বসলেন!

বিস্ফারিত নেত্রে অন্ধকার মাখা জলের দিকে তাকিয়ে সুমিত্রা ভাবলেন, এই তো মৃত্যুর প্রথম আঘাত! চরম আক্রমণের আর দেরি নেই—হে ভগবান, আমাকে সহ্য করবার শক্তি দাও!

আচম্বিতে গুহার বাইরে জাগল ঘন ঘন কুকুরের চিৎকার!

এতক্ষণ পরে একটা ঘরোয়া জ্যান্ত প্রাণীর সাড়া পেয়ে সুমিত্রাও যত জোরে পারেন চেঁচিয়ে উঠলেন! একবার নয়, দুইবার নয়—বার বার, চিৎকারের পর চিৎকার! এই দীর্ঘকাল ধরে যে অমানুষিক যন্ত্রণা, যে অভাবিত বিভীষিকা, যে নিদারুণ নিরাশার কশাঘাতে সুমিত্রার মরণোন্মুখ জীবন একেবারে নেতিয়ে পড়েছিল,

এখন তীব্র আর্তনাদের মধ্য দিয়েই তার সমস্ত অভিব্যক্তি যেন ছড়িয়ে পড়তে চাইলে ধরণীর আকাশে বাতাসে!

কী আশার মোহ যে তাঁকে পেয়ে বসল তা তিনি জানেন না, কিন্তু হঠাৎ চাঙ্গা হয়ে সুমিত্রা ঊর্ধমুখে গুহামুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন—দুই চক্ষে তাঁর জ্বলন্ত আগ্রহের উত্তেজনা!

আচম্বিতে গুহামুখে জাগল একটা চঞ্চল অন্ধকার, তারপর দেখা গেল একটা প্রকাণ্ড কুকুরের মুখ, তারপর শোনা গেল যেন সমস্ত গুহা ফাটিয়ে আবার ঘেউ ঘেউ চিৎকার!

গুহার বাহির থেকে উচ্চৈস্বরে ও সাগ্রহে কে বললে, 'কী রে রোভার, ব্যাপার কী?'

—'ঘেউ, ঘেউ, ঘেউ!'

দ্রুত পাদুকার শব্দ,—চঞ্চল ছায়ার পাশে আর একটা চঞ্চল ছায়া!

—'এখানে কী আছে রে রোভার? ভেতরটা কিছুই দেখা যাচ্ছে না যে! তুই সরে যা—একটু আলো আসতে দে!'

সুমিত্রার চোখ তখন কি এক পুঞ্জীভূত অন্ধকারে অন্ধ—তিনি আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না, তবু আর একবার মর্মভেদী চিৎকার করে উঠলেন!

—'ভগবান, এ কী দৃশ্য! প্রতাপপুরের মহারানি! সুমিত্রা দেবী!'

এ হচ্ছে রাজা চন্দ্র সিংহের বিস্মিত কণ্ঠস্বর! কিন্তু সুমিত্রা কিছুই শুনতে পেলেন না—বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে একেবারে জলের তলায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন—কালো জলে ডুবে গেল যেন একটি ফোটা শ্বেতপদ্মফুল!

চোখের নিমেষে চন্দ্র সিংহ ঝাঁপ দিলেন গুহাকূপের মধ্যে। ততক্ষণে গুহার মধ্যে এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে তাঁর আরও কয়েকজন অনুচর সেপাই!

চন্দ্র সিংহ দুই হাত বাড়িয়ে জলগর্ভ থেকে উদ্ধার করলেন হাত-পা বাঁধা সুমিত্রার মূর্ছিত দেহ।

দুই হাতে দেহকে ঊর্ধে উত্থিত করে তিনি বললেন, 'তোমরা খুব সাবধানে মহারানিকে উপরে তুলে নাও! দ্যাখো, কঠিন পাথরে এঁর গায়ে যেন কোনো আঘাত না লাগে!'

সেপাইরা ধরাধরি করে সুমিত্রার দেহকে গুহার বাইরে নিয়ে গেল।

প্রায় এক কোমর জলে দাঁড়িয়ে চন্দ্র সিংহ পকেট থেকে দেশলাই বার করে একসঙ্গে চার-পাঁচটা কাঠি জ্বেলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাড়াতাড়ি গুহার চারিদিকটা

দেখে নিলেন। তারপর সবিস্ময়ে বললেন, 'এখানে নিশ্চয়ই ঝরনার জল আগে ছিল না, তাহলে এতক্ষণে গুহা ছাপিয়ে জল ছুটত বাইরে! এর মানে কী? ...হুঁ, বুঝেছি! কী ভয়ানক শয়তানি ফন্দি! আমার আসতে যদি আর একটু দেরি হত—উঃ, ভাবলেও বুক শিউরে ওঠে!'

গুহামুখ ধরে চন্দ্র সিংহ একলাফে উপরে উঠে এলেন।

সূর্য তখন মাঝ-আকাশ পার হয়েছে। রৌদ্রপ্লাবিত পাহাড়ের আদুর পাথুরে গায়ে শোয়ানো রয়েছে সুমিত্রার নিস্পন্দ মূর্তি। কুকুর রোভার বিপুল বিক্রমে লাঙ্গুল আস্ফালন করতে করতে একবার সুমিত্রার দেহ শুঁকে পরখ করছে, আর একবার সানন্দে ঘেউ ঘেউ রব তুলে ছুটে চারিদিক পরিক্রমণ করে আসছে। সুমিত্রার পদচিহ্নের আঘ্রাণ অনুসরণ করে সেইই সকলকে যথাস্থানে নিয়ে এসেছে এবং সে চেষ্টা সফল হয়েছে বলে তার যে খুশির সীমা নেই, এইটেই সে এখন ভালো করে জানিয়ে দিতে চায়!

চন্দ্র সিংহ নিষ্পলক চোখে সুমিত্রার দিকে তাকিয়ে আছেন।

সুমিত্রার ভিজে চুল এলোমেলো হয়ে মুখে চোখে বুকে কাঁধের উপরে এসে ছড়িয়ে পড়েছে, ধবধবে সাদা সদ্য ধোয়া মুখ, গলা, বুক ও বাহুর অনাবৃত অংশের উপর দিয়ে রোদের সোনালি আভা যেন গড়িয়ে পড়ছে। টানা টানা দুই চোখ মুদিত। নাসারন্ধ্র ফুলে ফুলে উঠছে। কমলানেবুর কোয়ার মতো ঠোঁট দু-খানি থেকে থেকে কাঁপছে। স্রস্তবাস পীবর বক্ষদেশও শ্বাস-প্রশ্বাসের ছন্দে একবার উঠছে, একবার নামছে। যেন মোমে গড়া নিটোল নধর বাহু দু-খানি অসহায় ভাবে দেহের দুই দিকে এলিয়ে পড়ে আছে। কর্কশ কালো পাথর পটে আঁকা যেন কমল-কোমল গৌরী প্রতিমা! সৌন্দর্যের সমস্ত ঐশ্বর্য যেন এইখানে পুঞ্জীভূত!

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে চন্দ্র সিংহ নিজের মনে মনেই বললেন, 'দেবী, এতদিন তুমি ছিলে গতির লীলায় চঞ্চলা, সামনে থেকেও তোমার রূপ ধরি ধরি করে ধরতে পারতুম না। আজ ভালো করে তোমাকে দেখছি, আর যতই দেখছি বিস্মিত হচ্ছি! তুমি অপূর্ব, তুমি অতুলনীয়া, তুমি কবিতাময়ী! কিন্তু হায় দুর্ভাগ্য, এ জীবনে ও কবিতা পাঠের সুযোগ আমার হবে না, সুতরাং তোমার পানে চেয়ে চেয়ে আর মনের ক্ষুধা বাড়িয়ে লাভ নেই। আমি পাপ করেছি, আমার দোষেই আজ তোমার এই দুর্দশা, এর জন্যে সারাজীবন আমাকে অনুতাপ করতে হবে! দেবী, আর কখনো তোমাকে আমি প্রার্থনা করব না।'

চন্দ্র সিংহ মুখ তুলে অনুচরদের ডেকে বললেন, 'মহারানির দেহের তলায় তোমরা হাত পেতে দাও। ওঁকে নিয়ে পাহাড় থেকে নীচে নামো!'

...সকলে পাহাড়ের উপর থেকে নীচে এসে দাঁড়িয়েছে।

মাঝখানে পথ। দুইধারে ঝোপঝাপ, জঙ্গল।

হঠাৎ দেখা গেল, খানিক তফাতে পথের উপরে এসে দাঁড়াল আর একদল লোক।

সর্বপ্রথমে যে লোকটি আসছে চন্দ্র সিংহ তাকে দেখেই চিনতে পারলেন। রাজনগরের যুবরাজ সুন্দর সিংহ!

॥ ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ ॥

আধুনিক মেলো-ড্রামা

অপূর্ব এক দৃশ্যের জন্যে চমৎকার পটভূমি তৈরি হয়েছে।

পাহাড়ের শিখরের উপরে যদি কোনো দর্শক থাকতে তাহলে নিশ্চয়ই মনে করতে পারত যে, এখানে চলচ্চিত্রের জন্যে কোনো চমকপ্রদ দৃশ্যের অভিনয় হচ্ছে।

দুই দিকে দুই দল এবং দুই দলেই রয়েছে কয়েকজন করে সৈনিক।

সুন্দর সিংহ দীর্ঘ দীর্ঘ পদক্ষেপ করে দ্রুত এগিয়ে এলেন। চন্দ্র সিংহ হাসিমুখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর পিছনে চারজন সৈনিকের বলিষ্ঠ বাহুর উপরে শায়িত সুমিত্রার অচেতন দেহ।

হাউন্ড রোভারের বোধহয় সুন্দর সিংহকে পছন্দ হল না। সে তাঁর অগ্রগতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্যে গর্জন করতে লাগল।

সুন্দর সিংহ দাঁড়িয়ে পড়লেন।

চন্দ্র সিংহ বললেন, 'রোভার, চুপ করো। তুমি সেলাম করতে জানো না বটে, কিন্তু রাজনগরের যুবরাজকে দেখে তোমার ধমক দেওয়া উচিত নয়।'

একজন সৈনিক গিয়ে রোভারকে বেঁধে ফেললে।

সুন্দর সিংহ আবার অগ্রসর হলেন। একেবারে চন্দ্র সিংহের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে মিনিট খানেক ধরে সুমিত্রার দেহের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'এ কী দেখছি?'

চন্দ্র সিংহ জবাব দিলেন না।

সুন্দর সিংহ ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, 'প্রতাপপুরের মহারানির এ অবস্থা কে করলে?'

চন্দ্র সিংহ বললেন, 'নিশ্চয়ই তাঁর কোনো শত্রু।'

—'শত্রু? এখানে মহারানির একমাত্র শত্রু হতে পারেন আপনি।'

চন্দ্র সিংহ একটুও বিচলিত না হয়ে সহজ স্বরেই বললেন, 'যুবরাজ, আমি মহারানির শত্রু নই। আমি মহারানিকে মৃত্যুমুখ থেকে উদ্ধার করেছি।'

—'আমার বিশ্বাস অন্যরকম। আপনি মহারানিকে বন্দি করেছিলেন, মহারানি কোনোরকমে পালিয়ে গিয়েছিলেন, আপনি আবার তাঁকে বন্দি করে নিয়ে যাচ্ছেন।'

—'আপনার এমন বিশ্বাসের কারণ কী?'

—'কারণ অবশ্যই আছে।'

সুমিত্রার দেহের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে চন্দ্র সিংহ বললেন, 'ওঁর হাত আর পায়ের উপরে ওই লাল দাগ দেখছেন?'

সুন্দর সিংহ হেঁট হয়ে দেখে বললেন, 'হুঁ। দড়ি দিয়ে বাঁধার দাগ!'

—'ওটাও কি আমার কীর্তি?'

—'কার কীর্তি সেটা মহারানির জ্ঞান হলেই টের পাওয়া যাবে।'

—'তাহলে ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। ওঁর মুখেই সব শোনা ভালো। আপাতত দয়া করে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ান, মহারানিকে নিয়ে আমরা অগ্রসর হই।'

—'কোথায়?'

—'জয়গড়ে। ইচ্ছা করলে আপনিও সঙ্গে আসতে পারেন।'

—'সে ইচ্ছা আমার নেই।'

—'তবে পথ ছেড়ে দিন।'

—'তাও দেব না।'

—'কেন?'

—'মহারানিকে নিয়ে আমি হয় প্রতাপপুরে নয় রাজনগরে ফিরে যাব।'

—'এঁর এই অবস্থায়?'

—'হ্যাঁ।'

—'তা হয় না।'

—'তাই-ই হবে।'

—'কেমন করে?'

—'গায়ের জোরে।'

—'কী করবেন? দ্বন্দ্বযুদ্ধ?'

—'দরকার হলে আমি তাতেও নারাজ নই।'

চন্দ্র সিংহ হো হো করে হেসে উঠলেন।

—'ও হাসির মানে কী?'

—'মানে, মধ্যযুগের নভেলের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে! আমরা এসে দাঁড়িয়েছি ঠিক সেইরকম চিত্তাকর্ষক আবহের মধ্যে! কে বলবে আজ ইলেকট্রিক জ্বলে, ট্রেন ছোটে, বেতারে খবর রটে?'

সুন্দর সিংহ অধীর স্বরে বললেন, 'রাজা, আপনার প্রলাপ বন্ধ করুন।'

চন্দ্র সিংহ সে কথায় কর্ণপাত না করে বললেন, 'দূরে বনের ভিতরে দেখা যাচ্ছে, আমার পূর্বপুরুষের গড়া মধ্যযুগের দুর্গ। ওই আকাশ, পাহাড়, নদী, আর বনস্পতিরাও মধ্যযুগের আগে থেকেই এখানে বিরাজ করছে। আজ নেই কেবল মধ্যযুগের মানুষরা, কিন্তু তাদের অভাব পূরণ করতে পারব আমরাই—কী বলেন যুবরাজ? বন্দিনী নায়িকার অচেতন দেহের পাশে দাঁড়িয়ে আমরা দুই প্রতিদ্বন্দ্বী মহাবীর, আর এখনই আরম্ভ হবে তুমূল দ্বন্দ্বযুদ্ধ! চমৎকার, চমৎকার! ডুয়েল যুগের নভেলের সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে! কিন্তু দুঃখের কথা কী জানেন যুবরাজ? আপনার সঙ্গে আমি যুদ্ধ করতে প্রস্তুত নই!'

অবহেলার হাসি হেসে সুন্দর সিংহ বললেন, 'এত ভয়!'

—'ভয়? হ্যাঁ, কতকটা তাই বটে। হাস্যাস্পদ হবার ভয়। ভুলতে পারব না আমি হচ্ছি বিশ শতাব্দীর মানুষ। আজ যদি প্রতাপপুরের মহারানির জন্যে আমরা দুজনে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হই, তবে কাল খবরের কাগজে বেরুবে তার উজ্জ্বল বর্ণনা। আর সেই বর্ণনা পড়ে বিপুলা ধরণী কী বিরাট কৌতুকে হাততালি দেবে, সেটা আন্দাজ করবার মতো বুদ্ধিও কি ভগবান আপনাকে দেননি? আরে ছি ছি, বলেন কী,—আপনার সঙ্গে ডুয়েল লড়ব? ও কথা ভুলে যান। তার চেয়ে আমার সঙ্গে জয়গড়ে চলুন, পেয়ালার উপরে পেয়ালা চড়ান, টলুন, পড়ুন, উঠুন, বাইজির নাচ দেখুন, বাহবা দিন, যমুনা দেবীর সঙ্গে ঝগড়া করুন—যা সাজে তাই ভালো!'

প্রচণ্ড রাগে সুন্দর সিংহের মুখ বিকৃত হয়ে গেল, কাঁপতে কাঁপতে তিনি

বললেন, 'রাজা, রাজা, আপনার বাক্য-বীরত্ব আর আমি সহ্য করব না! আমি এখনই আমার সেপাইদের হুকুম দেব—'

—'আমাদের আক্রমণ করবার জন্যে? কিন্তু আমরা হচ্ছি গান্ধীজির শিষ্য, কিছুতেই প্রতিআক্রমণ করব না!'

—'নারী হরণে যার লজ্জা নেই তার মুখে গান্ধীজির নাম ভালো শোনায় না।'

চন্দ্র সিংহ আবার হো হো করে হেসে উঠে এ টিটকারি উড়িয়ে দিলেন।

সুন্দর সিংহ বললেন, 'রাজা, জানেন প্রতাপপুরের মহারানির উপরে আমার দাবি আছে?'

—'দাবি? হ্যাঁ, জানি।' বলেই চন্দ্র সিংহ মুখ ফিরিয়ে নিষ্পলক চোখে কিছুক্ষণ একদিকে তাকিয়ে রইলেন।

ঝলমলে রোদে তখন দূরে একটি নদী পালিশ করা ইস্পাতের মতো চকচক করছে। উপত্যকার উপরে চলন্ত ছায়া লীলায়িত করে মাথার উপর দিয়ে একঝাঁক হাঁস সশব্দে উড়ে গেল। বহুদূরে পিরামিডের পর পিরামিডের মতো সারি সারি ছোটো পাহাড়। মাঝে মাঝে গাছদের শ্যামল সভা। একটা জঙ্গলের ভিতর থেকে একদল হরিণ বাইরে বেরিয়ে মানুষ দেখেই আবার আড়ালে অদৃশ্য হল।

চন্দ্র সিংহ ভারী গলায় থেমে থেমে বললেন, 'হ্যাঁ যুবরাজ, প্রতাপপুরের মহারানির উপরে আপনার দাবি আছে বটে। আমি মহারানির মন ফেরাবার চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু পারিনি।'

—'আপনি চেষ্টা করেছিলেন!'

—'হ্যাঁ। একটু পরেই মহারানির মুখেই আপনি যখন সব কথা শুনতে পাবেন, তখন আর লুকিয়ে কোনো লাভ নেই।'

সুন্দর সিংহ গম্ভীর স্বরে বললেন, 'হুঁ। এতক্ষণে সব বোঝা গেল!'

মাথা নেড়ে মৃদু হেসে চন্দ্র সিংহ বললেন, 'না যুবরাজ, আপনি কিছুই বোঝেননি। ব্যর্থ চেষ্টা ছেড়ে দিয়েই আজ আমি এখানে মহারানির সন্ধানে এসেছিলুম। ওঁকে আমি বন্দিনী করবার জন্যে ধরে নিয়ে যাচ্ছি না। জ্ঞানলাভ করে সুস্থ হয়ে উনি যেখানে খুশি যেতে পারবেন।'

সুন্দর সিংহ বললেন, 'মহারানির জন্যে আপনাকে আর চিন্তা করতে হবে না। আমি এখনই ওঁর ভার নিতে চাই।'

চন্দ্র সিংহ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শ্রান্ত স্বরে বললেন, 'বেশ, তাই হবে। ভেবেছিলুম সুমিত্রাদেবীকে অসাধারণ নারী। আমার সে ধারণা আর নেই। এমন এক সাধারণ নারীর জন্যে আপনার মতো মানুষের সঙ্গে আমি হাতাহাতি বা কথা কাটাকাটি করতে ইচ্ছুক নই। ওঁকে আপনিই নিয়ে যান। কিন্তু এক শর্ত। আমার সেপাইরা ওঁর সঙ্গে থাকবে আর মহারানিকে প্রতাপপুর ছাড়া অন্য কোথাও নিয়ে যাবে না।'

একটু ভেবে সুন্দর সিংহ বললেন, 'আচ্ছা, আমি রাজি।'

তিক্ত হাসি হেসে চন্দ্র সিংহ বললেন, 'পণ্ডিতরা চিরদিনই নারীদের মন নিয়ে বহু গবেষণা করে আসছেন, কিন্তু কিছুই মীমাংসা হয়নি। আমি কোনোদিন নারী চর্চা করিনি, নারীকে ঘনিষ্ঠ ভাবে জানবার চেষ্টা করেছিলুম এই প্রথম। কিন্তু এইটুকু মাত্র জানতে পেরেছি, নারী হচ্ছে অস্বাভাবিক জীব! যমুনা দেবীর অপদার্থ স্বামীকেও যে নিজের জীবনের সঙ্গী বলে নির্বাচিত করতে পারে,—'

বাধা দিয়ে কর্কশ কণ্ঠে সুন্দর সিংহ বললেন, 'চুপ করুন রাজা!'

চন্দ্র সিংহের দুই হস্ত একবার মুষ্টিবদ্ধ হল, চোখ দিয়ে একবার ঠিকরে গেল বিদ্যুতের ঝিলিক! তারপরেই শান্ত স্বরে হেসে বললেন, 'যুবরাজ, আমার একটিমাত্র মুষ্টিতে যে শক্তি আছে, তার আস্বাদ পেলে এই মুহূর্তেই আপনার অস্তিত্ব লুপ্ত হবে। কিন্তু তা আমি করব না, কারণ আপনার উপরে মুষ্টি ব্যবহার করা মুষ্টির অপব্যবহার মাত্র!' তারপর নিজের সৈনিকদের দিকে ফিরে গম্ভীর স্বরে বললেন, 'তোমাদের উপরে আমার এই হুকুম রইল, মহারানিকে তোমরা প্রতাপপুরে পৌঁছে দিয়ে আসবে। কেউ বাধা দেবার চেষ্টা করলে তোমরা অস্ত্র ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হোয়ো না!' বলেই তিনি হন হন করে একদিকে অগ্রসর হলেন।

দাঁত দাঁত চেপে সুন্দর সিংহ নিজের মনেই বললেন, 'দু-দিন অপেক্ষা করো রাজা! তোমার দর্প আমি চূর্ণ করব!' তারপর চেঁচিয়ে সৈনিকদের ডেকে বললেন, 'চলো তোমরা প্রতাপপুরের দিকে!'

মিনিট দুয়েক পরেই সে স্থানটা আবার জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ল। শব্দের মধ্যে শোনা যেতে লাগল কেবল ঘুঘুদের কান্না-সুরের সঙ্গে পাতায় পাতায় বনবাসী বাতাসের দীর্ঘশ্বাস।

আচম্বিতে একটা ঝোপ ভেদ করে আত্মপ্রকাশ করল এক লক্ষ্মীছাড়া, উদ্ভ্রান্ত, বন্য মূর্তি! দুই চক্ষে তীব্র অগ্নিশিখা, নাসারন্ধ্র স্ফীত, ওষ্ঠ ঠেলে বেরিয়ে আসছে হিংসাভরা নিষ্ঠুর দাঁতগুলো! চন্দন সিং—যমুনার উন্মত্ত ভাই!

ভীষণ স্বরে সে বললে, 'যাঃ, সব ভেস্তে গেল! সুমিত্রাকে তুলে দিলে সুন্দর সিংহের হাতে! জয়গড়ের রাজা, জয়গড়ের রাজা! এর জন্যে শাস্তি ভোগ করতে হবে তোমাকেই! প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা!' বলতে বলতে সে ছুটল যেদিকে চন্দ্র সিংহ গিয়েছিলেন সেইদিকেই।

॥ সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ॥

রক্তধারা

সুমিত্রার যখন জ্ঞান হল সকলে তখন বনের প্রান্তে এসে পড়েছে।

কিন্তু তখনও তাঁর জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে আছে ভয়াবহ মৃত্যুর দুঃস্বপ্ন। সেই অন্ধকূপ, সেই অশ্রান্ত জলের ঝরঝর, সেই সর্বাঙ্গে তুষারশীতল দংশন! জ্ঞান হারিয়ে জলের তলায় ডুবে গিয়েছিল, এটাও মনে পড়ল। কিন্তু এখনও সে বেঁচে আছে কেমন করে?...

তার বুকটা ধড়াস করে উঠল। এটা কি সম্ভব, এখন পৃথিবীতে নেই তার অস্তিত্ব—? সে কি এসেছে জীবনের পরপারে? এই কি মৃত্যুপুরী?

কিন্তু ওই নীলাকাশ, ওই বনমর্মর, ওই রৌদ্রময়ী দিবা এ সবই যে চিরপরিচিত পৃথিবীরই ঐশ্বর্য! মরণ কি তবে জীবনেরই নামান্তর?... এমনকি নিজের পুরাতন দেহও থাকে অবিকৃত?

মেঘান্ধকারের মধ্যে বিদ্যুতের ঝিলিকের মতো, কালো গুহার ভিতরে আর একটি মুখের অভাবিত আবির্ভাব, এও স্মরণ হল।

গায়ে এ কাদের হাতের ছোঁয়া? সুমিত্রা ভালো করে তাকিয়ে দেখলেন অপরিচিত সৈনিকদের গম্ভীর মুখ! এদের তো মৃত্যুলোকের বাসিন্দা বলে সন্দেহ হয় না!

শুনলেন এক পরিচিত কণ্ঠস্বর—'মহারানি, এখন কি নিজেকে একটু সুস্থ বোধ করছেন?' এ কণ্ঠস্বর কি মৃত্যুর পরেও তাঁর পিছনে তাড়া করে এসেছে?

না, না, এ মৃত্যু নয়, মৃত্যু নয়—আমি জীবিত!

এই সত্য উপলব্ধি প্রচণ্ড এক আনন্দের মতো সুমিত্রার চিত্তকে উচ্ছ্বসিত করে তুললে! এক মুহূর্তেই কেটে গেল তাঁর আচ্ছন্ন ভাবটা।

বললেন, 'আমি কোথায়? আমাকে ছেড়ে দাও।'

সৈনিকরা ধীরে ধীরে তাঁকে মাটির উপরে দাঁড় করিয়ে দিলে। সর্বপ্রথমেই তাঁর চোখ পড়ল সুন্দর সিংহের হাসিমুখের উপরে। এবং আবার সুমিত্রার সব গুলিয়ে যেতে লাগল। সেই জলপূর্ণ অন্ধকূপের মধ্যে মৃত্যুস্বপ্নের সঙ্গে এই আলোকমার্জিত পৃথিবীর সুন্দর শ্যামলতা একেবারে খাপ খায় না এবং তার উপরে আবার এই রাজনগরের দ্যাখনহাসি যুবরাজের উদয়—এ সবের একটুও মানে হয় না! ...গুহা কোথায় গেল? এখানে কেমন করে এলুম? এ সৈনিকরা কারা? দ্রুত প্রশ্নের পর প্রশ্নে সুমিত্রার মন হয়ে উঠল প্রশ্নময়!

—'মহারানি!'

সুমিত্রা সম্বোধন শুনে জিজ্ঞাসু চোখে সুন্দর সিংহের দিকে তাকালেন।

—'আপনার জ্ঞান হয়েছে দেখে আমার মনে যে কী আনন্দই হচ্ছে!'

—'আপনি এখানে কেন?'

—'আপনারই খোঁজে। অনেক কষ্টে আপনাকে পেয়েছি।'

—'তবে কি আপনিই আমাকে উদ্ধার করেছেন?'

—'হ্যাঁ মহারানি, ও সৌভাগ্যের দাবি আমি করতে পারি।'

—'ধন্যবাদ যুবরাজ। কিন্তু অনুগ্রহ করে ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলুন।'

সুন্দর সিংহ উৎসাহের সঙ্গে বললেন, 'আমি জয়গড়ে এসেছিলুম আপনাকে দেখতে। কিন্তু এখানে এসে শুনলুম, আপনি নাকি চলে গিয়েছেন। কথাটা আমার বিশ্বাস হল না। মনে হল ভিতরে কী যেন রহস্য আছে! আপনাদের মন্ত্রী আর সেনাপতির ব্যবহারে আমার সন্দেহ দৃঢ়তর হল। সেই সন্দেহ নিয়ে ফিরে যাচ্ছি, হঠাৎ বনের পথে এক কাঠুরের সঙ্গে দেখা। কাঠুরে বললে, বনের ভিতরে একজন পুরুষের সঙ্গে সে একটি মেয়েকে দেখেছে আর মেয়েটিকে তার খুব বড়ো ঘরের মেয়ে বলেই মনে হয়েছে। তার কাছে এই খবর পেয়ে আমি কৌতূহলী হয়ে এদিকে খোঁজাখুঁজি শুরু করলুম। তারপর হঠাৎ করলুম আপনাকে আবিষ্কার!'

—'গুহার ভিতরে?'

—'না, বনের ভিতরে।'

অতিশয় বিস্মিত স্বরে সুমিত্রা বললেন, 'আপনি কী বলছেন যুবরাজ? না, না, তা হতেই পারে না।'

—'হ্যাঁ মহারানি, আপনার দেখা পেয়েছি বনের ভিতরেই। কিন্তু তখন আপনার জ্ঞান ছিল না। জয়গড়ের এই সেপাইরা ধরাধরি করে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছিল।'

—'জয়গড়ের সেপাইরা? এরা জয়গড়ের সেপাই? আশ্চর্য! সবই অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে! আমি যেন Alice in Wonderland!'

—'এদের সঙ্গে ছিলেন রাজা চন্দ্র সিংহ।'

এক পলকে মিলিয়ে গেল সমস্ত স্বপ্নঘোর—সুমিত্রার অন্ধ চোখ দেখলে সূর্যালোক!

—'তাহলে—তাহলে আমাকে উদ্ধার করেছেন রাজা চন্দ্র সিংহ?'

সুন্দর সিংহ ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, 'উদ্ধার? না, তিনি আপনাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, আপনাকে তাঁর হাত থেকে উদ্ধার করেছি আমিই।'

সুন্দর সিংহের কথা যেন সুমিত্রার কানেই ঢুকল না। যেন নিজের মনে ভাবতে ভাবতেই তিনি বললেন, 'মৃত্যুমুখ থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন রাজা চন্দ্র সিংহ!'

ভ্রু-কুঞ্চিত করে সুন্দর সিংহ বললেন, 'মৃত্যুমুখ? হ্যাঁ, রাজা চন্দ্র সিংহ ওইরকম কী সব কথা বলছিলেন বটে, কিন্তু ও-সব কথায় আমি বিশ্বাস করি না।'

—'যুবরাজ, আপনার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের উপরে সত্যাসত্য নির্ভর করছে না। আমি যে কী বিপদে পড়েছিলুম সেটা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।'

—'মহারানির সে বিপদের জন্যে দায়ী কে?'

—'আমি।'

—'আপনি?'

—'হ্যাঁ। আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরছিলুম।'

—'কথাগুলো হেঁয়ালির মতো শোনাচ্ছে।'

—'তা শোনাবে। তবে একটুখানি স্পষ্ট করবার জন্যে বলতে পারি, বিপদকে বহন করে এনেছিল আপনারই এক কুটুম্ব।'

—'আমার কে?'

—'কুটুম্ব।'

—'হেঁয়ালিটা আরও জটিল হয়ে উঠল। কে আমার কুটুম্ব?'

—'চন্দন সিং!'

সচমকে সুন্দর সিংহ মাথা তুলে দেখলেন, সুমিত্রা মুখ টিপে হাসছেন। হতভম্বের মতো বললেন, 'চ-ন্দন—সিং!'

—'চন্দন সিং, যমুনাবাইয়ের ভাই। সে নিজে এই পরিচয় দিয়েছে। তবে কি সে আপনার কুটুম্ব নয়?'

এই প্রশ্নের সামনে সুন্দর সিংহ নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বলে মনে করলেন। কোনো জবাব তাঁর মুখে এল না।

—'যমুনাবাই আপনার কে হন?'

এ প্রশ্ন অধিকতর অস্বস্তিকর। সুন্দর সিংহ মাথা হেঁট করলেন।

নির্দয় আনন্দে সুমিত্রা বললেন, 'যুবরাজ, চুপ করে রইলেন কেন? আমি তো কঠিন প্রশ্ন করিনি! এর উত্তর খুব সহজ।'

সুন্দর সিংহ বাধ্য হয়ে মুখ তুলে বললেন, 'এক সময়ে যমুনাবাই ছিল আমার স্ত্রী।'

—'এক সময়ে?'

—'হ্যাঁ।'

—'এখন?'

—'এখন তাকে আমি স্ত্রী বলে মনে করি না।'

—'তার মানে?'

—'যমুনাবাইকে আমি ত্যাগ করেছি।'

—'রাজনগরের যুবরাজ, নারীদের আপনি কী মনে করেন? কাচের খেলনা? লোভ হলে হাতে তুলে নেবেন, লোভ মিটলেই ছুড়ে ভেঙে ফেলবেন?'

সুন্দর সিংহ নিরুত্তর।

সুমিত্রা আবার তীক্ষ্ণস্বরে বললেন, 'যুবরাজ, বিবাহ সম্বন্ধেই বা আপনার ধারণা কী রকম? বিবাহ কি নিত্য নূতন নারী লাভের জন্যে একটা আইনসঙ্গত প্রথা?'

সুন্দর সিংহ বললেন, 'মহারানি, এখানে কেবল আমরাই নেই। এ সব কথা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করতে পারব।'

সুমিত্রা খিল খিল করে হেসে উঠে বললেন, 'যুবরাজের লজ্জা হচ্ছে? কিন্তু আপনারা তো বলেন, লজ্জা হচ্ছে নারী জাতিরই একচেটে সম্পত্তি! বেশ, ও প্রসঙ্গে শিকেয় তোলা থাক। এখন রাজা চন্দ্র সিংহের কথা হোক। জয়গড়ের সেপাইরা ঘটনাস্থলে হাজির, কিন্তু জয়গড়ের রাজাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?'

প্রসঙ্গ বদলে গেল ভেবে হাঁপ ছেড়ে সুন্দর সিংহ বললেন, 'রাজা আমার হাতে আপনাকে সমর্পণ করে চলে গেছেন।'

—'আপনার হাতে আমাকে সমর্পণ করে চলে গেছেন? রাজা-বাহাদুরের

উদারতা বিস্ময়কর! হ্যাঁ সেপাই, তোমাদের রাজা কি এঁর হাতে আমাকে সমর্পণ করে চলে গিয়েছেন?'

একজন সৈনিক এগিয়ে এসে সেলাম করে বললে, 'মহারানিজি, আমরা হুকুম পেয়েছি, প্রতাপপুর ছাড়া আর কোথাও আপনাকে নিয়ে যেতে পারব না!'

আবার সকৌতুকে হেসে উঠে সুমিত্রা বললেন, 'দেখছেন যুবরাজ, জয়গড়ের রাজার বিশ্বাস, আমার পক্ষে আপনার হস্তের চেয়ে প্রতাপপুরই হচ্ছে বেশি নিরাপদ?'

এইবার অসন্তুষ্ট কণ্ঠে সুন্দর সিংহ বললেন, 'তবে কি বুঝব যে, মহারানি আমাকে বিদায় নিতে বলছেন?'

—'হ্যাঁ যুবরাজ।'

—'বড়োই দুঃখের বিষয় যে, পাগল চন্দন সিংহের অপরাধের জন্যে দায়ী হলুম আমি।'

—'না যুবরাজ, সে জন্যে দায়ী আমি নিজে, এ কথা আগেই তো বলেছি?'

—'তবে আমাকে চলে যেতে বলার অর্থ কী?'

—'অর্থ হচ্ছে এই যে, এক কাঁধে যমুনাবাইকে, আর এক কাঁধে প্রতাপপুরের মহারানিকে বহন করা আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না।'

—'মহারানি ভুলে যাচ্ছেন, রাজাদের বহু স্ত্রী গ্রহণ করবার অধিকার আছে।'

—'অধিকার নয় যুবরাজ, বর্বরতা। স্বীকার করি, এমন বর্বরতা সহ্য করার জন্যে বহু নারীর অভাব নেই। কিন্তু আপনি যদি আমাকে নিয়ে টানাটানি করতে চান, আমি বিষম আপত্তি করব।'

—'এই আপনার শেষ কথা?'

—'এই আমার শেষ কথা।'

সুন্দর সিংহ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'উত্তম। আপনার প্রত্যাখ্যান সহ্য করবার শক্তি আমার আছে। কিন্তু আপাতত আপনার ভার যখন নিয়েছি, তখন প্রতাপপুর পর্যন্ত আপনার সঙ্গে থাকতে আমি বাধ্য।'

—'ধন্য 'শিভালরি'! বেশ, অগ্রসর হন—আমিও আপনার অনুগমন করছি।'

সুন্দর সিংহ নিজের সৈনিকদের ইঙ্গিত করে হন হন করে এগিয়ে চললেন। খানিক দূর অগ্রসর হবার পর একবার দাঁড়িয়ে ফিরে দেখলেন, সুমিত্রাও পিছনে পিছনে আসছেন কি না।

আচম্বিতে একটা বড়ো গাছের আড়াল থেকে মূর্তিমান বন্য ঝড়ের মতো বেরিয়ে এল একটা মূর্তি, চকচকে ছোরা ধরা একখানা হাত বিদ্যুৎ গতিতে উপরে উঠল ও নীচে নামল এবং পরমুহূর্তে সুন্দর সিংহ লুটিয়ে পড়লেন মাটির উপরে!

মূর্তি তিরবেগে পালাবার চেষ্টা করলে—কিন্তু গর্জে উঠল এক সৈনিকের বন্দুক এবং সঙ্গে সঙ্গে সে-ও ঠিকরে পড়ল ভূমিতলে।

কিন্তু পড়েই মূর্তি উঠে বসল; তারপর হা হা হা হা রবে বিকট অট্টহাসি হেসে বললে, 'কেড়ে নিয়েছি—কেড়ে নিয়েছি মহারানির মুখের গ্রাস! ভেবেছিলুম চন্দ্র সিংহকেই বধ করব, কিন্তু তাতে বন্ধ হত না মহারানির বিবাহ—তাই আমার ছোরা করলে সুন্দরেরই রক্তপান! এসো মহারানি, তোমার বরকে দেখবে এসো—ওর রক্তে স্নান করবে এসো—হা হা হা হা হা হা!' হাসতে হাসতে চন্দন সিং আবার মাটির উপরে এলিয়ে পড়ে স্থির ও স্তব্ধ হয়ে রইল।

সৈনিকরা দৌড়ে সুন্দর সিংহের কাছে গেল। সকলে যখন যুবরাজের রক্তাক্ত দেহ তুলে ধরলে, তখন তাঁর প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছে।

সুমিত্রা এতক্ষণ আড়ষ্ট ভাবে দাঁড়িয়ে স্তম্ভিত নেত্রে তাকিয়েছিলেন। কিন্তু যখন দেখলেন সুন্দর সিংহের বক্ষ ভেদ করে হু হু করে বেরিয়ে আসছে রক্তধারা, তখন তাঁর পায়ের তলায় ঘুরতে লাগল যেন পৃথিবীটা! তীব্র এক আর্তনাদ করে অন্ধের মতো তিনি ছুটলেন বনের একদিকে।

॥ অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ॥

অশ্রু

সূরযমলের সামনে একখানা মস্ত থালার উপরে রয়েছে প্রায় এককাঁদি মর্তমান কলা। বৃহত্তর মানব-জাতীয় শত্রুর অভাবে সেনাপতি এই কদলীগুলোকেই আক্রমণ করেছেন অমিত বিক্রমে!

খানিক তফাতে বসে মন্ত্রীমশাই অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। তাঁর ভাব দেখলে মনে হয়, সেনাপতির ক্ষুধার প্রচণ্ডতা দর্শন করে তিনি রীতিমতো স্তম্ভিত হয়েছেন!

গুটি-বারো মর্তমান যখন সেনাপতির বদন-বিবরে অদৃশ্য হয়ে তাদের সরস

কদলী জীবন সাঙ্গ করলে, মন্ত্রীমশাই আর থাকতে না পেয়ে বলে উঠলেন, 'ক্ষান্ত হও সূরযমল, ক্ষান্ত হও!'

সেনাপতি আর একটি কলার খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে চোখ তুলে ভুরু কুঁচকে বললেন, 'ক্ষান্ত হব? কেন?'

—'বৈকালী চায়ের সঙ্গে তুমি যে খাবারগুলো খেয়েছিলে, তাই-ই দুজন লোকের পুরো এক দিনের খোরাক হতে পারত। তারপর ঘণ্টা খানেক যেতে না যেতেই আবার তুমি কলার কাঁদি নিয়ে যে অমানুষিক কাণ্ড আরম্ভ করেছ, ওটা দেখে আমার আশঙ্কা হচ্ছে।'

—'মন্ত্রীমশাই, আমার মন খারাপ হয়েছে!'

—'মন খারাপ হলে কারুর ক্ষুধা যে বাড়ে, এ কথা এই প্রথম শুনলুম!'

—'আমি অন্যমনস্ক হবার জন্যে কলা খাচ্ছি।'

—'এ ওজরটাও অদ্ভুত। কিন্তু তোমার মন খারাপ হবার কারণটা কী?'

—'কারণ? একটা নয়, কারণ অনেক। তবে প্রধান কারণ হচ্ছেন আমাদের মহারানি। তিনি কোথায় গেলেন? তাঁর সঙ্গে আছে কে?'

—'হুঁ'। আমিও তাই ভাবছি।'

—'রাজনগরের যুবরাজের ব্যাপারটাও কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না।'

মন্ত্রী হতাশ মুখে ঘাড় নাড়লেন।

—'সকালবেলায় রাজা চন্দ্র সিংহ একটা হাউন্ড নিয়ে যে ভাবে বেরিয়ে গিয়েছিলেন সেটাও সন্দেহজনক। বৈকালের আগেই তিনি প্রাসাদে ফিরে এসেছেন শুনেছি। তারপর আর কোনোই খবর নেই।'

—'না।'

—'এর পরেও মন খারাপ হবে না?'

—'হওয়া উচিত। কিন্তু মনকে চাঙ্গা করবার জন্যে তুমি যে উপায় অবলম্বন করেছ, ওটা আমার পছন্দ হচ্ছে না।'

সেনাপতি জবাব দিলেন না। তবে তাঁর হাত আর মুখ অলস হয়ে রইল না। দেখতে দেখতে কাঁদি সাবাড়, থালার উপরে পুঞ্জীভূত হয়ে রইল কেবল কলার খোসাগুলো।

মন্ত্রী মাথা হেঁট করে ভাবতে লাগলেন। সেনাপতি কিছুক্ষণ মৌনমুখে সিগারেট টানলেন। তারপর বাহির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সন্ধে হতে আর দেরি নেই।'

—'হু!'

বাইরে পায়ের আওয়াজ হল। তারপরেই চন্দ্র সিংহের প্রবেশ। মন্ত্রী ও সেনাপতি সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন।

চন্দ্র সিংহ আসনগ্রহণ করে বললেন, 'আপনারাও বসুন।'

মন্ত্রী বললেন, 'মহারানির কোনো খবর পাওয়া গেল না?'

—'পাওয়া গেছে।'

—'পাওয়া গেছে? তিনি কোথায়?'

—'এই প্রাসাদেই।'

মন্ত্রী ও সেনাপতি সবিস্ময়ে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। চন্দ্র সিংহ পকেট থেকে বার করলেন সিগারেট কেস।

মন্ত্রী বললেন, 'মহারানি কোথায় গিয়েছিলেন? কে তাঁকে আবার এখানে নিয়ে এল?'

—'কেউ নিয়ে আসেনি। এবারে তিনি ফিরে এসেছেন নিজের ইচ্ছায়।'

অধিকতর বিস্ময়ে অভিভূত সেনাপতি করলেন মুখ ব্যাদান।

মন্ত্রী সন্দিগ্ধ স্বরে বললেন, 'মহারাজ, ক্ষমা করবেন। মহারানি কি ফিরে আসবেন বলেই পালিয়ে গিয়েছিলেন?'

সেনাপতি বললেন, 'আর সে কি পালানো বলে পালানো? একেবারে প্রাণটি হাতে করে দড়ির সিঁড়ি বয়ে যিনি পালিয়ে গেলেন—'

শুকনো হাসি হেসে চন্দ্র সিংহ বললেন, 'আপনাদের সন্দেহ অন্যায় নয়। আমিও জানি, আবার ফিরে আসবার জন্যে মহারানি এখান থেকে পালিয়ে যাননি।'

—'তবে?'

চন্দ্র সিংহ জবাব দিলেন না। মাটির দিকে তাকিয়ে সিগারেটের ধূমপান করতে লাগলেন।

—'মহারাজ, আপনার মুখে আমি দুশ্চিন্তায় চিহ্ন দেখছি।'

—'মন্ত্রীমশাই, আপনি ভুল দেখেননি। আমার মন এখন সুস্থ নয়। আপনাদের কৌতূহল চরিতার্থ করবার শক্তি আমার নেই। তবে আপনারা যদি সব কথা জানতে চান, মহারানির সঙ্গে দেখা করতে পারেন।'

—'মহারানির সঙ্গে দেখা করতে পারি! আপনার আপত্তি নেই?'

—'না। এখন থেকে আপনারা স্বাধীন। আপনারা যখন খুশি জয়গড় ত্যাগ করতে পারেন।' চন্দ্র সিংহ উঠে দাঁড়ালেন।

—'আর মহারানি?'

—'তিনিও সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করবেন, তিনি কি আজকেই প্রতাপপুরে যাত্রা করতে চান?'

চন্দ্র সিংহ প্রস্থান করলেন।

বিস্ফারিত চক্ষে সেনাপতি বললেন, 'হেঁয়ালির পর হেঁয়ালি! আমি হাঁপিয়ে উঠছি!'

সেনাপতির পৃষ্ঠদেশে ধাক্কা দিয়ে মন্ত্রী বললেন, 'নির্বোধ, এই কি হাঁপাবার সময়? শীঘ্র মহারানির কাছে চলো, খামখেয়ালি রাজা কখন ধাঁ করে মত বদলে ফেলবেন, কে বলতে পারে?'

চমকে উঠে সেনাপতি বললেন, 'ঠিক কথা! চলুন—চলুন!'

মন্ত্রী ও সেনাপতি দোতলার ঘরে ঢুকে দেখলেন, সুমিত্রা একখানা সোফার উপরে চুপ করে বসে আছেন।

তাঁরা কেউ কোনো সম্ভাষণ করবার আগেই সুমিত্রা বললেন, 'মন্ত্রীমশাই, রাজনগরের যুবরাজ যে বিবাহিত, এ কথা আপনি জানতেন?'

সচকিত চোখে সুমিত্রার দিকে তাকিয়ে মন্ত্রী মাথা চুলকোতে লাগলেন।

আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে সুমিত্রা তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন, 'বলুন, আপনি জানতেন কি না?'

এই অভাবিত অভ্যর্থনায় ভয় পেয়ে সেনাপতি পিছোতে আরম্ভ করলেন।

আর নীরবে মাথা চুলকানো নিরাপদ নয় বুঝে মন্ত্রী ক্ষীণ স্বরে বললেন, 'আজ্ঞে মহারানি, যুবরাজের সে বিবাহটা উল্লেখযোগ্য নয়।'

—'তাহলে আপনি সব জেনেও আমাকে কিছু বলেননি?'

—'আজ্ঞে—'

মাটির উপরে জোরে পা দিয়ে আঘাত করে ক্রুদ্ধা সুমিত্রা বললেন, 'চুপ করুন! জানেন, আপনাদের এই লুকোচুরির ফলে আজ দুজন মানুষের মৃত্যু হয়েছে, আর আমিও মরতে মরতে কোনোরকমে বেঁচে ফিরে এসেছি?'

—'মৃত্যু? কাদের মৃত্যু হয়েছে?'

সেনাপতি শোনবার জন্যে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন। কিন্তু সুমিত্রা আর কোনো উত্তর দিলেন না, দারুণ বিরক্তি ভরা মুখে জানলার কাছে গিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়ালেন।

মন্ত্রীর আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার ভরসা হল না।

খুব চুপিচুপি সেনাপতি বললেন, 'পালাই চলুন।'

কিছুক্ষণ পরে সুমিত্রা ফিরে গিয়ে এমন ভাবে আসন গ্রহণ করলেন, যেন ঘরের ভিতরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যক্তির অস্তিত্ব নেই।

মন্ত্রী বললেন, 'রাজা চন্দ্র সিংহ জানতে চেয়েছেন, মহারানি আজকেই প্রতাপপুরে ফিরে যাবেন কি না?'

—'না।'

—'রাজা বললেন, আমরা এখন স্বাধীন।'

—'হতে পারে।'

—'আমার মতে, আমাদের এখনই প্রতাপপুরে যাত্রা করা উচিত।'

—'না, না, আমি যাব না!'

একেবারে হাল ছেড়ে দিয়ে সেনাপতি দরজার দিকে অগ্রসর হলেন।

—'মন্ত্রীমশাই, আমার মন ভালো নয়, আজ আর আমাকে বিরক্ত করবেন না। রাজার কাছে গিয়ে খবর দিন, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

মন্ত্রী বেরিয়ে গেলেন। সেনাপতি বললেন, 'এ কী ব্যাপার বাবা? রাজাও কিছু বলতে নারাজ, মহারানিও কিছু বলবেন না। এখন আমরা কী করব?'

মন্ত্রী বিরক্ত মুখে বললেন, 'তুমি গোগ্রাসে খাবার গিলবে, আর আমি গুনব ঘরের কড়িকাঠ!... কী কুক্ষণেই এবার প্রতাপপুরের বাইরে পা বাড়িয়েছি—সেই থেকে পৃথিবীটা যেন উলটে গেছে!'

—'একেবারে উলটে গেছে মন্ত্রীমশাই, একেবারে! যদিও আকাশটা আছে এখনও মাথার উপরেই!'

—'আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফ্যাচ ফ্যাচ কোরো না বাপু! এখনও রাজাকে খবর দেওয়া হয়নি।'

* * *

চন্দ্র সিংহ ঘরের ভিতরে ঢুকতেই সুমিত্রা মধুর হাসি হেসে বললেন, 'আসুন।'

চন্দ্র সিংহ বিস্মিত হলেন, তিনি আশা করেছিলেন অন্যরকম অভ্যর্থনার। বললেন, 'মহারানি, এই মিষ্ট হাসির পর তিক্ত স্বাদের আয়োজন আছে নাকি?'

—'ভুল হল রাজা! লোকে মিষ্টি খাওয়ায় পরে।'

—'আশ্বস্ত হলুম। আমাকে ডেকেছেন কেন?'

—'আপনি আসেননি বলে।'

চন্দ্র সিংহ তীক্ষ্ণ চোখে সুমিত্রার মুখের পানে চেয়ে তাঁর মনের ভাব বোঝবার চেষ্টা করলেন। তারপর ধীরে ধীরে যেন অন্য কারুকেই সম্বোধন করে বললেন, 'মহারানির প্রতাপপুরে যাবার জন্যে সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে!'

সুমিত্রা নীরবে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

—'মহারানির উত্তর পেলুম না।'

—'রাজা দেওয়ালের সঙ্গে কথা কইছেন। দেওয়াল কোনোদিন উত্তর দেয় না।'

চন্দ্র সিংহ আবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুমিত্রার মুখের পানে চেয়ে বললেন, 'আপনি তো আজই প্রতাপপুরে যাত্রা করবেন?'

—'না।'

—'আপনি স্বাধীন।'

—'তাই এইখানেই থাকতে চাই।'

—'আপনার যুক্তিহীনতা বিস্ময়কর।'

—'কেন?'

—'যখন বন্দি করতে চেয়েছিলুম, তখন আপনি পালিয়েছিলেন। যখন বন্দি করতে চাই না, তখন আপনি যেতে নারাজ।'

—'হ্যাঁ। আমি প্রতাপপুরের মহারানি—কারুর হুকুম মানতে শিখিনি। আপনি 'থাকো' বললেই থাকব না, 'যাও' বললেই যাব না।'

—'বেশ। তাহলে আপনার ইচ্ছামতো কাজ করবেন। আমি এখন আসি।'

—'আর একটু অপেক্ষা করুন। আপনাকে কেন ডেকেছিলুম, এখনও বলা হয়নি।'

—'বলুন।'

—'আজ যে ভয়াবহ ব্যাপারটা হয়ে গেল—'

—'মহারানি, ও দৃশ্য আর স্মরণ করবেন না। আমার সেপাইদের সর্দারের মুখে সব কথা শুনেছি।'

—'সেই নিদারুণ দৃশ্য ভাবতেও আমার গা শিউরে উঠছে, তবু উপায় নেই। যুবরাজ সুন্দর—'

—'আবার ও নাম কেন মহারানি?'

—'তাঁকে অবিবাহিত জেনেই আমি বিবাহ করতে চেয়েছিলুম।'

—'হুঁ।'

—'এখন তিনি নেই। আপনি একদিন আমাকে বলেছিলেন, আপনি আমার প্রাণ চান না, চান জয়গড়ের উন্নতি—প্রতাপপুরের সিংহাসন।'

—'আমার সে মত আর নেই।'

—'কেন?'

—'আপনার সাহস দেখে আমি মত পরিবর্তন করেছি।'

সুমিত্রা মুখ নামিয়ে মৌন হয়ে রইলেন।

চন্দ্র সিংহ ভারাক্রান্ত স্বরে বললেন, 'ছলে বলে কৌশলে অভীষ্ট সিদ্ধ করতে গিয়ে আমি যে সর্বনাশের আয়োজন করেছিলুম সে কথা ভেবে মন আমার অনুতাপে জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে। আমাকে আর লজ্জা দেবেন না মহারানি, আমার যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে।'

চন্দ্র সিংহ প্রস্থান করবার উপক্রম করতেই সুমিত্রা আবেগ-কম্পিত স্বরে বলে উঠলেন, 'যাবেন না রাজা, দয়া করুন—আমাকে ক্ষমা করুন!'

চন্দ্র সিংহ বিস্মিত স্বরে বললেন, 'মহারানি!'

—'মহারানি নই—আজ আমাকে ডাকুন কেবল সুমিত্রা বলে!'

চন্দ্র সিংহ জবাব খুঁজে পেলেন না।

সুমিত্রা আসন ছেড়ে উঠে চন্দ্র সিংহের মুখে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, 'রাজা, নিষ্ঠুর মরণের কবল থেকে আপনি আমাকে রক্ষা করেছেন, এ কথা আমি কেমন করে ভুলে যাব? আমার উপরে আজ যে আপনি ছাড়া আর কারুর অধিকার নেই—আজ থেকে আমি যে আপনারই! রাজা, আমার রাজা!' বলতে বলতে সুমিত্রার কপোল বয়ে ঝরতে লাগল চোখের জল!

—'কাঁদছ কেন সুমিত্রা?'

—'এ আমার আত্মদানের প্রথম অশ্রু।'

রচনা-বৈচিত্র্য আর সৃষ্টি-প্রাচুর্যে বাংলা সাহিত্যে একমাত্র হেমেন্দ্রকুমারই হেমেন্দ্রকুমারের তুলনা। উপন্যাস, ছোটোগল্প, নাটক, গীতি রচনা, চিত্রাঙ্কন, শিল্প-সমালোচনা, সম্পাদনা এমনকি নৃত্য পরিচালনাতেও হেমেন্দ্রকুমার রেখে গেছেন তাঁর স্বাতন্ত্র প্রতিভার স্বাক্ষর।

জয়ন্ত-মানিক, বিমল-কুমার আর সুন্দর দারোগা—অবিস্মরণীয় বিস্তৃতি পেয়েছে বাংলা রহস্য, রোমাঞ্চ আর অ্যাডভেঞ্চার-ভুবন।

বিপুল, বিচিত্র আর বর্ণময়—বহুল প্রচলিত থেকে অধুনালুপ্ত সমগ্র হেমেন্দ্রকুমার একালের পাঠকের হাতে তুলে দেবার প্রয়াসেই **হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী**-র সশ্রদ্ধ প্রকাশ।

ISBN 81-7942-071-X